সুরের আগুন

সন্ধ্যা সেন

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে ।
দে'জ পাবলিশিং ।
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭,

মুদ্রাকর :
দিলীপ দে ।
দে প্রিন্টার্স ।
১৫৭বি, মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৬

আমার স্বর্গত বাবাকে

নিবেদন

সুরের আগুন আজ থেকে প্রায় আঠার বছর আগে পত্রিকায় ধারাবাহিক শুরু হতেই সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল অভিনন্দনের জোয়ার বয়ে নিয়ে আসা চিঠিগুলিই বিষয়বস্তুর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে আমাকে সচেতন করেছিল। শুরু হয়েছিল দেবব্রত বিশ্বাসের বক্তব্য দিয়ে। সেই সময় নূতন করে অনুভব করেছিলাম ঐ মানুষটি রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগীদের হৃদয়ের কত গভীরে নিজের আসন করে নিয়েছেন।

একসময় চৈতন্যযুগ সারা ভারতকে যে বিপুল উন্মাদনায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গে অনায়াসেই তুলনা করা যায় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আজকের এই রবীন্দ্রযুগের। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিব্যদৃষ্টির বলেই বুঝেছিলেন ভাবীকালে গানটাই বড় হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রপ্রয়াণের পর থেকে এ-গানের উত্তরোত্তর প্রসার ও জনপ্রিয়তা তাঁর অনুমানকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। গত ১০।১২ বছরে এ সঙ্গীতের গতিপ্রকৃতির দিকে তাকালেই বোঝা যায় একই সঙ্গে অনেক শক্তিশালী শিল্পীর আবির্ভাব এ-সঙ্গীতের অগ্রগতিকে কত ত্বরান্বিত করেছে। এর মূলে আছে প্রথমত উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান প্রসার। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হওয়ার জন্যই সাধারণ মানুষও রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথার সৌন্দর্য ও সুরের মধ্যে ভাবের গভীরতাকে উপলব্ধি করতে শিখেছেন।

দ্বিতীয়ত চল্লিশের মন্বন্তরের পর আমাদের বহুদিনের সযত্নলালিত আদর্শ, জীবন সম্বন্ধে মূল্যবোধ প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল। সেই অস্থিরতার ঢেউ সমাজে, সাহিত্যে এবং সঙ্গীতেও এসে লাগল। তখন গুণ্টিমেয় কিছু গীতিকার ও সুরকার ছাড়া অনেকেই ভারসাম্য হারিয়ে গানের মধ্যে তাৎক্ষণিক আকর্ষণ ও উত্তেজনা সৃষ্টির দিকেই মন দিলেন। কিন্তু এসব গানের সুর ও কথা মনের মধ্যে কোনো স্থায়ী আবেদন রাখতে পারেনি বলেই মানুষের সৌন্দর্যতৃষিত চিত্ত এমন কোনো গানের মধ্যে আশ্রয় খুঁজল যার আবেদন চিরায়ত। এই ব্যাকুল অন্বেষণই তাদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনন্যসাধারণ কথা ও সুরের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত ক্ল্যাসিক্যাল গানের মত শুধু দিশেহারা মানুষের আশ্রয়ই নয়, শ্রোতাদের রুচির উন্নতমান রচনা ও সুকুমারবোধের চেতনা সঞ্চারের ক্ষেত্রেও এ গানের ভূমিকার মূল্য অপরিসীম।

তাঁর সুরের আগুনকে যাঁরা সবখানে ছড়িয়ে দিয়েছেন সেইসব শিল্পীদের অভিজ্ঞতার এজাহার এখানে সংকলিত হল। এই এজাহারই রবীন্দ্রসঙ্গীতের এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস বলে আমি মনে করি। প্রথম যুগে কবির গান সমাজের উঁচুমহলে অতিবিদগ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমিত ছিল। এ-গানের সেই

পায়ে চলা পথ থেকে আজকের এই রাজপথ রচনায় যেসব গুরু ও শিল্পীর কাছে আমরা ঋণী তাঁদের অনুভব, বেদনা, আনন্দ দিয়ে গড়া সুরের আগুন আজ আপনাদের হাতে পোঁছে দিতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

এই প্রসঙ্গেই আর একটি নিবেদন এই যে, সুরের আগুনে শিল্পীদের সাজানো হয়েছে বর্ণানুক্রমিকভাবে ; শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুরু ও শিল্পী এবং আদিযুগের গায়িকাদের মধ্যে যাঁদের পেয়েছি তাঁরাই এ পরিকল্পনার ব্যতিক্রম এবং সঙ্গত কারণেই। মাননীয় প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ হয়নি। পরের বার পাঠকদের কাছে তাঁকেও উপস্থিত করবার আশা রাখি। একসঙ্গে সবাইকে দেওয়া গেল না। কারণ তাতে বই-এর দাম ক্রেতাদের সাধ্যের সীমা অতিক্রম করবে। সেইজন্য দুটি খণ্ডে সুরের আগুন প্রকাশ করার পরিকল্পনাকে আশাকরি সহৃদয় পাঠকরা সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখবেন—বর্তমান যুগে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার কথা স্মরণ করে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই সর্বব্যাপী বিস্তারের মূলে যাঁর অবদান অস্বীকার করতে পারার মত মানুষ আজ একজনও নেই, সেই পঙ্কজ মল্লিকের হাতে সুরের আগুন পোঁছে দেওয়া হলোঁ না। এ-ক্ষোভ মোছবার নয়। পরের খণ্ডে রবীন্দ্রগবেষক ও রবীন্দ্রসঙ্গীতপ্রাণ মানুষেরও এ সম্বন্ধে বক্তব্যগুলিও থাকবে। এঁদের মধ্যে আছেন সুকোমলকান্তি ঘোষ ও শঙ্খ ঘোষ।

সুরের আগুন ধারাবাহিকভাবে 'অমৃত'-তে প্রকাশ করে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব যাঁরা আমায় অবহিত করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই আসে শ্রদ্ধেয় শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের নাম। দ্বিতীয় নাম শ্রীমণীন্দ্র রায়ের। সুরের আগুন নামটি তাঁরই দেওয়া। আমাদের সহকর্মী বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও এ-বিষয়ে আমি নানাভাবে ঋণী। পাঠক-পাঠিকা হিসেবে যাঁদের উৎসাহ আমায় বিশেষভাবে প্রেরণা দিয়েছে তাঁরা শ্রীযুক্তা শুভ্রা ঘোষ, শ্রীমতী শ্রীলেখা বসু ও পবিত্র বিশ্বাস, কমল চৌধুরী।

এ অধ্যায় অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি না শ্রদ্ধেয় তারাপ্রণব ব্রহ্মচারীর কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি।

সন্ধ্যা সেন

সূচীপত্র

অমিয়া ঠাকুর

"পাশ্চাত্য সঙ্গীত শুধুমাত্র স্বরলিপিনির্ভর হতে পারে কারণ তাঁদের সঙ্গীতধর্ম আলাদা। ভারতীয় সঙ্গীতে এ নিয়ম পুরোপুরি খাটে না। কারণ ভারতীয় সঙ্গীত ভাবগভীর এবং সৃষ্টিশীল। এখানে প্রতি মুহূর্তে শিল্পীর নিজেকে মেলে ধরার অবকাশ আছে।"

ঠাকুরবাড়ীর জায়া এবং কন্যাকুলের মধ্যে আজও শোনা যায় যে দুটি কণ্ঠের গান—সে কণ্ঠের অধিকারী হলেন শ্রীযুক্তা অমিয়া ঠাকুর ও শ্রীমতী সুপূর্ণা ঠাকুর। একজন প্রাচীনা অপরজন একালীনা। অমিয়া ঠাকুরের মা'র নাম সুরেনবালা, বাবার নাম সুরেন্দ্রনাথ। মাসীমা সত্যবালা দেবী, তাঁরই কন্যা সুখ্যাতা তারকা লীলা দেশাই।

ব্যাকরণের খাতিরে প্রাচীনা বললেও সঙ্গে সঙ্গে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই কণ্ঠের মাধুর্য, গায়কীর জৌলুস এবং প্রকাশভঙ্গির ব্যক্তিত্ব সব মিলিয়ে ওঁর শিল্পীমানসের যে রূপ ঝলসে ওঠে, কালের স্থূল স্পর্শ সেখানে বুঝি পৌঁছয় না। প্রথম কবে শুনলাম ওঁর গান? রবীন্দ্রসদনেই। খুব সম্ভব কোনো রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে—! গান শোনার আগেই ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন গীতা ঘটক। উনি হেসে বলেছিলেন, আমাদের গান আর কি শুনবে এখন? নেহাত বুড়ো মানুষ বলেই তোমরা ভক্তিশ্রদ্ধা দেখিয়ে চুপ করে শোনো—।

কথাটা কিন্তু তখন ঠিক বিনয় বলে ভাবিনি। অজান্তেই ঐ কথাটিতে যেন মন সায় দিয়েছিলো। কিন্তু চমকে উঠতে হয়েছিল ওঁর গান শুরু হতেই। সারা অডিটোরিয়াম যেন কোন মায়ামন্ত্রে নিশ্চুপ। 'স্বপন যদি ভাঙিলে রজনীপ্রভাতে' উচ্চগ্রামের শক্তিশালী কণ্ঠ, স্বরশ্রুতির শুদ্ধতা আর রামকেলী রাগাশ্রিত গানে কড়ি মধ্যমকে আদর করে ছোঁয়ার সেই প্রাণকাড়া ভঙ্গিটি? আহা! সে কি ভোলার?

তারপর কতদিন কত সংবর্ধনাসভায় ওঁর গান শুনেছি। যতবার শুনেছি আরও শুনতে ইচ্ছে করেছে। শুধু কি গান? কথাবার্তা, স্বভাব, সবই যেন ঐ গানেরই সুরে বাঁধা, যেমন মধুর তেমনই নির্মল।

সেদিন ওঁর সঙ্গে গল্প করছিলাম আমি আর সুভাষ চৌধুরী (সুপূর্ণা চৌধুরীর স্বামী)। কথায় কথায় সুভাষবাবু বললেন, দেখুন সমালোচকদেরও বিপদ কম নয়। একজন শিল্পী তিনি যত বড়ই হোন, কোনোদিন কখনও কি তাঁর গান খারাপ হতে পারে না? কিন্তু সে কথা লেখার উপায় নেই।

অমনই ওঁরা চটে অস্থির।

উনি শুনে বললেন, রাগ করে বুঝি? আহা! হয়ত সেদিন শরীরটা ভালো ছিলো না কিংবা কোনো কারণে গানের মুড ছিলো না। তা নিন্দে করবার কি দরকার বাবা! মন খারাপ হয়—ছেলেমানুষ ত সব।

ডি. এল. রায়ের ভাষায়—আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম মমতাময়ীর পানে। আধার যদি বড় না হয় মহৎ প্রেরণার আশ্রয় কোথায়? হৃদয় এত বড় বলেই বোধহয় এক অভিজাত যুগের গান সুর ভাব কল্পনার বিরাট ঐতিহ্য যেন অম্লান গৌরবে এঁর মধ্যে জ্বলজ্বল করছে। সবার প্রতি ওঁর কি হৃদয়ভরা স্নেহ। বললেন, রাজেশ্বরী দত্ত? স্বভাব, রূপ, কণ্ঠ সব দিক দিয়েই সে রাজেশ্বরী। তার যোগ্যতা কি নিন্দা প্রশংসার অপেক্ষা রাখে?

মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল ওঁর কোনটা বেশী সুন্দর? গান? না কথা? অমিয়া ঠাকুরের কাছে কোনোদিন কারো নিন্দা বা বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনি নি। কিন্তু এটা তাঁর ভান করা মহত্ত্ব—অথবা ভদ্রতার সুগারকোটিং নয়। সবার জন্য নির্ভেজাল স্নেহ থেকেই উৎসারিত তাঁর অপরের প্রতি অপরিসীম বিবেচনা ও দরদ। তাই বলছিলাম একটি মর্যাদামণ্ডিত যুগ যেন অন্তঃপুরিকা শিল্পীর হৃদয়ের অন্দরমহলে অনাহত, উজ্জ্বল গৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। তারই প্রতিবিম্বন ওঁর কথায় এবং গানেও।

আলাপ-আলোচনায় জানা গেল অন্তঃপুরিকার শুচিতার সঙ্গে মিশেছে চলতিকালের অগ্রগতির ছোঁয়া। তাই হাল আমলের মানুষেরও ওঁকে মনে হয় যেন তারই সময়কালের—এমন ইণ্টারেস্টিং পারসোনালিটি কমই দেখা যায়। এই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের মূলে আছে ওঁর মর্যাদাসমৃদ্ধ পশ্চাৎপট। বাবা সুরেন্দ্রনাথ রায় হাইকোর্টের নাম করা ব্যারিস্টার ছিলেন। পরে রেজিস্ট্রারও হয়েছেন। অত্যন্ত সঙ্গীতরসিক ও গুণগ্রাহী মানুষ। তাঁরই প্রেরণায় আট বছর বয়স থেকে অমিয়া ঠাকুরের (তখন রায়) রাগসঙ্গীত শিক্ষার শুরু। সে এক ভারী মজার ঘটনা। এক মুসলমান সারেঙ্গী ওস্তাদকে বাবা বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন আমায় শেখানোর জন্য—মুহূর্তের মধ্যেই শিল্পী যেন অতীতের দিনগুলিতে ফিরে যান—তখন আমি ছোট্ট। লক্ষ্ণৌর ওস্তাদ, বড় গুণী এ-সবের মূল্য কি বুঝি? তাই প্রথম প্রথম তাঁর দিকে খুব একটা ঘেঁষতে চাইতাম না। ওস্তাদ কিন্তু ভারী রসিক আর মিশুকে মানুষ ছিলেন। মশলাদার পানের লোভ দেখিয়ে একটু একটু করে কাছে বসাতেন আর সারেঙ্গী বাজিয়ে উর্দু গজল, ঠুংরী, টপ্পা গাওয়াতেন। এইরকম করে গাইতে গাইতে কখন যে ঐসব গান উর্দু ভাষার মাধুর্যের সঙ্গে মিশে মশলাদার পানের মতোই উপভোগ্য হয়ে উঠলো বুঝতেই পারি নি। হঠাৎ একদিন বুঝতে পারলাম যা হবার তাই হয়ে গেছে। আর এসব গান না গেয়ে উপায় নেই। কারণ আমার প্রাণের সঙ্গে এরা মিশে গেছে। আর বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

বারো বছর বয়সে তখনকার দিনের বিখ্যাত ধ্রুপদী সঙ্গীতগুরু

যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ধ্রুপদ শেখা শুরু হলো ; ইনি রাধিকাবাবুর শিষ্য। একাদিক্রমে ছয় বছর ওঁর কাছে তালিম নিয়েছি।

খুব অল্প বয়সেই একবার আমার একটি ধ্রুপদ গানের অনুষ্ঠানে সঙ্গীতাচার্য নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ পাখোয়াজ বাজিয়েছিলেন—সঙ্গীত সঙ্ঘের কনসার্ট। সেখানে রবিদাদামশায় (রবীন্দ্রনাথ) সরলাদিদিমা, সবাই যেতেন। ঐ অনুষ্ঠান আমার জীবনে সত্যিই এক স্মরণীয় আনন্দের মুহূর্ত। বড়পিসিমা (প্রতিভা দেবী—হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা) আমায় সঙ্গীত সঙ্ঘে নিয়ে যেতেন। পরে বড়পিসিমার ছেলে অশ্বিনী চৌধুরী এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন।

অশ্বিনীদা অ্যালবার্ট হল্-এ সঙ্গীত সঙ্ঘের একটি সাংস্কৃতিক উৎসব করেছিলেন। বড়পিসিমা ওখানে আমায় 'আজি দখিন দুয়ার খোলা' গানটি গাইতে বলেছিলেন। সেখানে উপস্থিত লেডী বি. এল. মিত্র বললেন, অপূর্ব। যেমন গলা তেমনিই গাওয়ার স্টাইল। গগনজ্যাঠামশায় (গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) আশীর্বাদ করে বললেন, তোমার গান খুব ভাল হয়েছে। উনিই অ্যাকশন দেখিয়ে দিলেন এই এই জায়গাগুলো এইভাবে করবে—।

তখন আমি কত ছোটো। তবু একটি কথাও ভুলি নি।

শিল্পীর উদ্ভাসিত মুখ সুন্দর দেখায়।

এরপর দিনে দিনে ওঁর শিক্ষা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে থাকে। গোপেশ্বরবাবুর কাছে খেয়াল ও অন্যান্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা—সঙ্গীতবোধ কায়েমী হয়ে উঠতে লাগল। বয়সে বালিকা কিন্তু সঙ্গীত ধারণায় পরিণতমনা কলাকার অমিয়া রায়ের গান বড় বড় ওস্তাদের মনেও বিস্ময় জাগায়।

একবার বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম বৌবাজারের এক বিরাট ধনীর বাড়ির জমকালো জলসায়। কার বাড়ি ঠিক মনে নেই। গান শুনতেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ যোগেনবাবু বললেন, ওর গানও একটু হোক। ওখানেরই একটা তানপুরা আমার গলার স্কেলে বাঁধা হলো। একজন ওস্তাদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ সুরে আবার কে গাইবে ? (কিছু পুরুষ গাইয়ে ছাড়া ঐ স্কেলে কেউই সাধারণত গান না) আমি গাইতে বসতে সবাই উৎসুক হয়ে শুনতে বসলেন। কি গান গেয়েছিলাম ? হ্যাঁ তাও মনে আছে। গেয়েছিলাম 'নন্দকী ছায়েলে ছোড় দে ঘায়েলে যে হামারি।' সিন্ধুড়া রাগে।

গান শুনে সবার সেই উচ্ছ্বাস ও আনন্দের মধ্যে যেন ভগবানের আশীর্বাদকে অনুভব করেছিলাম। তখনকার দিনে গান গেয়ে টাকা নেওয়ার রেওয়াজ ছিলো না। তবে সোনার মেডেল, পুষ্পস্তবক অনেক পেয়েছি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত বিয়ের আগে কি উপলক্ষে গেয়েছি ? বাড়িতে খেয়াল ধ্রুপদ গান শিখতে শিখতে পিসিমাদের কাছে যখন রবিদাদামশায়ের গান শুনতাম—এ গানের ওপর কেমন যেন একটা আলাদা ধরনের আকর্ষণ বোধ করতাম।··· কি বললে ? স্বাদ বদলের আনন্দ ? ঠিক তা নয়। যে গান শিখেছি তার সঙ্গে কোনো বিরোধিতা নেই, অথচ ভাবটলমল কথার মাধুর্য মিলে একটা

অনির্বচনীয় অনুভূতি মনকে আবিষ্ট করে রাখতো।—এ গান শেখার সুযোগ পেলে ছাড়তাম না।

এই সময় মনীষা দেবী আমায় জোড়াসাঁকোয় মাঝে মাঝে নিয়ে যেতেন। বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে ওঁরই আগ্রহে গাইতাম। সেই উপলক্ষে রবিদাদামশায়ের অনেক গান শেখা হতো। তখন চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত এঁরাও গাইতেন।

এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ সরলা দেবীর নির্দেশনায় নবপর্যায় 'ভারতী' পত্রিকার সাহায্যার্থে এম্পায়ার থিয়েটারে (বর্তমান রক্সি প্রেক্ষাগৃহ) 'মায়ার খেলা' মঞ্চস্থ হবার পরিকল্পনা চলছিলো। এর আগে সরলা দেবীর আবদারে রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য রচনা করেন। সখিসমিতির (জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মিলন প্রতিষ্ঠান) তহবিলের অর্থসংগ্রহের জন্য বেথুন কলেজের বিরাট চত্বরে সেদিন এই অভিনয় হয়েছিলো।

শুনুন আমি বলি এবার। উনি বিনয়বশত বলতে পারছেন না—অমিয়া দেবীর কথায় বাধা দিয়ে সুভাষ চৌধুরী বললেন, সরলা দেবী তখন 'মায়ার খেলা' অভিনয়ের জন্য সুন্দরী এবং সু-কণ্ঠী মেয়ে খুঁজছিলেন। তিনি সতী দেবী, অমিয়া রায়, বিজয়া দেবী (সত্যজিৎবাবুর স্ত্রী) এঁদের নিয়ে জোড়াসাঁকোয় উপস্থিত হলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রমদা চরিত্রের জন্য মনোনীত করলেন।—জেঠিমা এবার বলুন।

রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে কি সেই প্রথম এলেন? উনি বলা শুরু করবার আগেই আমি প্রশ্ন করি।

না। তার আগেই জোড়াসাঁকো যাতায়াতের সময়ই রবিদাদামশায়ের কাছে যাবার সুযোগ হয়েছিলো। উপলক্ষটা ছিলো বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান। তখনই তাঁর কাছে 'ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের খেয়াতরীর মাঝি' এবং 'দুঃখের বরষায়' গানদুটি শিখেছিলাম। যাতায়াতের অসুবিধার দরুন বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়ে ওঠেনি। তবে ঐ উপলক্ষেই পরম সম্পদের মত গানদুটি পেয়েছিলাম।

ইন্দিরাপিসি সঙ্গীত সঙ্ঘে আমার গান শুনেছিলেন। সরলাপিসি তাঁর কাছে খবর পেয়েই আমার বাবার সঙ্গে দেখা করে আমার অভিনয়ে যোগ দেবার অনুমতি চাইলেন। বাবা ত মহাখুশী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ সন্দেহও প্রকাশ করলেন, ও কি পারবে?

সে ভার আমার। সরলাপিসি দুদিন আমাদের নিয়ে রিহার্সাল দিলেন। সকাল দশটায় গিয়ে ফিরতাম সন্ধ্যায়। তৃতীয় দিন রবিদাদামশায়ের কাছে আমাদের নিয়ে যেয়ে সরলাপিসি বললেন, রবিমামা দ্যাখ আমি সব গান এদের শিখিয়েছি। এবার তুমি অভিনয় শেখাও। শিখিয়েছিস? সব গান মাত্র দুদিনে? বলিস কি?—রবিদাদামশায় অবাক হয়ে গেলেন। তাহলে গান শুনে আর দরকার নেই। কোন গানের অ্যাকশন দেখাতে হবে বলে দে।

তারপর উনি অভিনয় শেখাতে শুরু করলেন। আহা সে রূপ কি ভোলার? বাসন্তী রঙের জোব্বা পরা সেই গন্ধর্বের মত কান্তি দেখে মনে

হতো ঐ অঙ্গের জন্যই বুঝি বাসন্তী রঙের সৃষ্টি হয়েছিলো। ওঁর কাছে অভিনয় শেখাটা জীবনের এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। প্রত্যেকটি চরিত্রের রূপায়ণ শেখাতেন একেবারে পাকা অভিনেতার মতো। 'দে লো সখী দে' গাইবার সময় মিলনকাতরা অভিসারিকার মতো চঞ্চল ভাব-ভঙ্গি—আবার 'কে ডাকে। আমি কভু ফিরে নাহি চাই' গাওয়ার সময় যেন গরবিনী-মানিনীর প্রতিমাখানি হয়ে উঠতেন। সখিদের পার্ট শেখাবার সময় আবার সেই রকম ভাব।

এই 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য অভিনয়ের সময়ই গৌরী, সতী, জয়া, বিজয়া এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিলো। এটা যেন ঠাকুরবাড়িরই সম্পর্ক।

'মায়ার খেলা'তে সরলাপিসি পরিকল্পিত সেই মঞ্চরূপ আজও আমার চোখের সামনে ভাসে। ডাবল স্টেজ হয়েছিলো। মায়াকুমারীদের স্টেজ ছিলো একটু উঁচুতে। ওরা ত মানুষ নয়! সেই তফাতটা বোঝাবার জন্যই এই ব্যবস্থা। সাদা পোশাক আর নীল আলোয় সত্যিই যেন মায়াকুমারী তারা। রেবা রায় খুব সুন্দর নেচেছিলেন। তিমিরবরণ নেপথ্যে বেহালা বাজিয়েছিলেন সরলাপিসির অনুরোধে। 'মায়ার খেলা'র পরই আমাদের সবার বিয়ে হয়ে গেল। ইন্দিরাপিসি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, দেখলি ত? 'মায়ার খেলা' করার পরই সব ঝপাঝপ কেমন বিয়ে হয়ে গেল?

সমসাময়িক যুগের অনেকের কাছেই শুনেছি গানে ও অভিনয়ে অমিয়া দেবী প্রমদা চরিত্র-চিত্রণকে স্মরণীয় এবং ঐতিহাসিক করে তোলেন। আর প্রমদা চরিত্রের অভিনয়ের সময়ই তিনি ঠাকুরবাড়ির সকলের এমনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যে—অমিয়া দেবীকে তাঁরা সকলেই ঠাকুরবাড়ির ভাবী পুত্রবধূরূপে মনোনীত করেন। রবীন্দ্রনাথের দাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর—তাঁর পুত্র হৃদিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বধূরূপেই ঠাকুরবাড়িতে অমিয়া দেবীকে বরণ করে নিলেন। অমিয়া রায় হলেন অমিয়া ঠাকুর।

বিয়ের পর ইনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর কাছে। কিন্তু এসব দুর্লভ সৌভাগ্যকে ছাপিয়ে উঠেছিলো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে গান শেখার ও তাঁর সান্নিধ্য পাওয়ার সরস মুহূর্তগুলি।

শান্তিনিকেতন থেকে যখনই কবি জোড়াসাঁকোয় আসতেন তাঁর কাছে আমার গান শেখার নিমন্ত্রণ ছিলো বাঁধা। এই সময়েই অনেক গানের সঙ্গেই তাঁর কাছে শেখা 'কী রাগিণী', 'বড়ো বিস্ময় লাগে', 'আমি শ্রাবণ আকাশে ঐ', 'সখি আঁধারে' ও 'সুধা-সাগরতীরে' শিখতে শিখতে কিশোরী অমিয়া নব নব রূপে সঙ্গীতকে প্রাণের মধ্যে পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংবর্ধনার প্রথম দিনে অমিয়া ঠাকুর গেয়েছিলেন 'মরি লো মরি' এবং দ্বিতীয় দিনে 'ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ'। ঐ গান শুনেই সত্যেন সেন বলেছিলেন অনেকদিন বাদে,—আজ অবধি অমন 'মরি লো মরি' কারো কণ্ঠে শুনিনি। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য 'কী ধ্বনি বাজে' গানটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন অমিয়া ঠাকুরেরই কাছে একটি

হিন্দী গান শুনে। একবার গঙ্গার ধারে খড়দহের বাগানবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। সকলের সাথে আমিও গেছি রবিদাদামশায়ের সঙ্গে দেখা করতে। উনি আমার কাছে একটা হিন্দী গান শুনতে চাইলেন। আমি গাইলাম 'এ ধনি ধনি চরণ পরসত'—পূরবী রাগের আড়াঠেকা তালের একটি খেয়াল। সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে ফিরে আসবার জন্য যাত্রা করছি, এমন সময় ডাক পড়লো তাঁর ঘরে। একবার মাত্র শুনেই সেই সুরে উনি রচনা করে ফেললেন 'কী ধ্বনি বাজে'। গানটি আমায় সঙ্গে সঙ্গে শিখিয়েও দিলেন। সেই বছর মাঘোৎসব অনুষ্ঠানে গানটি আমি গেয়েছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের কাছে গান শেখার সঙ্গে সঙ্গে উপরি পাওনার মতই তাঁর সঙ্গলাভের অনেক মধুর স্মৃতি—যেন সুরে বাঁধা তানপুরার মতোই ওঁর মনকে আজও ভরিয়ে তোলে।

রবিদাদামশাই শেখাতে বসে গেয়েই যেতেন। থামতেন তখনই যখন সে সুর নিখুঁতভাবে আমার গলায় বসে যেতো। আমি তখন খুবই ছোটো। ওঁর অনেক হেঁয়ালীর মানে সেইজন্য বুঝতে পারতাম না। লেডী রাণু মুখার্জি'র সঙ্গে ওঁর খুব সরস মধুর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিলো। একদিন ওঁর ঘরে গেছি গান শেখার আমন্ত্রণেই। ওঁর পাশেই একটা মোটা গোড়ের মালা ছিলো। উনি রাণুর হাতে দিয়ে সকৌতুকে আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, তুমি ত পুরোনো সখী। আজকে ও হঠাৎ এসে পড়েছে বলে ওকেই দিলাম। তার জন্য মান কোরো না।

তারপর আমার সামনে লেডী রাণু সম্বন্ধেই রসালো ঘটনা স্মরণে মুখর হলেন। আমায় বললেন, জানো 'বিসর্জন' নাটকের সময় রাণুকে যখন অপর্ণার পার্ট দিলাম অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন ওকে শেখাতে পারব কিনা সে বিষয়ে। আমি বলেছিলাম ঠিক তৈরী করে নেব। 'বিসর্জন' অভিনয়ের সময় স্টেজে হঠাৎ আগুন, আগুন রব উঠলো। ও ত পালাবার জন্য ব্যস্ত। ছেলেমানুষ ত। আমি কিন্তু ওর হাতদুটো শক্ত করে ধরে রইলাম। কিছুতেই পালাতে দিলাম না। কারণ আমি জানি পুড়িয়ে মারবার জন্য বিধাতা আমায় সৃষ্টি করেননি।

আগেই বলেছি এসব কথার মানে তখন বুঝিনি। কিন্তু আজ অবসর-মুহূর্তে এসব কথার ব্যঞ্জনা মীড়ের রেশের মতোই যেন মনের তারে অনুরণিত হয়।

এখন গান রেকর্ড করা এত সহজ। কিন্তু অমিয়া ঠাকুরের অমন অনুপম কণ্ঠের গানেরও একটি বই আর রেকর্ড নেই। চারটি গান তিনি হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টসে রেকর্ড করেছিলেন। কিন্তু আরো ভালো হওয়া উচিত এই অজুহাতেই সে গান রেকর্ড হয়ে বেরোবার ছাড়পত্র পায়নি। আজকের দিনে এটা আজগুবী গল্প মনে হয় না ?

অমিয়া ঠাকুরের দু'টিমাত্র গানই রেকর্ড হয়েছে। কবির তিরোধানের পর হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টসে—একদিকে 'সমুখে শান্তি-পারাবার'

অন্যদিকে 'হে নূতন, দেখা দিক আর-বার'। সঙ্গে বেহালা বাজিয়েছিলেন দক্ষিণামোহন ঠাকুর, এস্রাজ বাজিয়েছিলেন দিনু ঠাকুর। শৈলজাবাবুর ট্রেনিং-এ রেকর্ড হয়েছিলো।

এই প্রসঙ্গে অমিয়া ঠাকুর বললেন, তখন রেকর্ড অথবা রেডিওতে গাওয়া হয়নি পারিবারিক আপত্তির কারণে। এই রেকর্ড যেখানে সেখানে বাজবে সবাই শুনবে এটা তাঁরা ঠিক পছন্দ করতেন না। আমার শাশুড়ী কিন্তু খুব লিবারেল ছিলেন। উনি বলতেন, তোমার পিসিমারা স্টেজে অভিনয় করেছেন—তাতে কেউ আপত্তি করেননি। আর ও বেচারা বউ হয়ে এসেছে বলে রেকর্ড রেডিওতেও গাইতে পাবে না? এটা কিন্তু খুব অন্যায়।

তারপর রবিদাদামশায়কে নিয়ে বর্ষামঙ্গল হলো 'ছায়া' সিনেমা হল্-এ। সেখানে শৈলজাদার পরিচালনায় আমি গেয়েছিলাম 'বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে' ও 'শ্রাবণ আকাশে ঐ'। কণিকা সেই প্রথম স্টেজে গাইলো 'ছায়া ঘনাইছে'। ১২।১৪ বছরের মেয়ে। কি মিষ্টি গলা। আজও সে মাধুর্য ওর কণ্ঠে ভরপুর।

রবিদাদামশায়ের ৭০ বছর পূর্তি উৎসবে পঙ্কজবাবুরও একটি বিশেষ ভূমিকা ছিলো। এই উৎসবের সঙ্গে আমি সংযুক্ত হয়েছিলাম। তখনকার দিনে অত বাইরে গাইবার চল ছিলো না। রবিদাদামশায়ের ৭০ বৎসর বয়সে হিন্দুস্থান কোম্পানী একটা রেকর্ড করলো।

রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের এবং প্রচারের ক্ষেত্রে পঙ্কজবাবুর বিশেষ ভূমিকা ও অবদান অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। অসাধারণ কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে এ গানের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে তিনি সচেতন করেছিলেন। পঙ্কজবাবুর এই অসাধারণ কণ্ঠ ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে কনভিনসড হয়েছিলেন বলেই রবিদাদামশায় তাঁকে নিজের গানে সুর দেবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

স্বরলিপি প্রসঙ্গে শিল্পীর মতামত খুবই উদার এবং প্রগতিশীল। উনি বললেন, পাশ্চাত্য সঙ্গীত শুধুমাত্র স্বরলিপি নির্ভর হতে পারে কারণ তাঁদের সঙ্গীতধর্ম আলাদা। ভারতীয় সঙ্গীত ভাবগম্ভীর এবং সৃষ্টিশীল। এখানে প্রতিমুহূর্তে শিল্পীর নিজেকে মেলে ধরার অবকাশ আছে—যে শিল্পী যত বেশী কল্পনা ও প্রতিভাসমৃদ্ধ তাঁর পরিবেশনা গানের ততগুলি দিগন্তদ্বার খুলে দেয়। স্বরলিপির বন্ধনে তাঁর এই আত্মবিকাশকে সীমিত করলে সঙ্গীতের নানামুখী বিকাশের পথ আগলে রাখা হয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম যুগে এত স্বরলিপির শাসন ছিলো না। উনি গান রচনা করেই যেসব স্নেহের পাত্রীদের শেখাতেন তাঁরাই ছিলেন তাঁর গানের জীবন্ত স্বরলিপি। কারো গলা একটু সুরে বললেই রবিদাদামশায় তাঁকে গাইবার স্বাধীনতা দিতেন।

স্বরলিপির যুগ এখন এসেছে এবং তার প্রয়োজনীয়তাও আছে। যখন যে সময়ে যেটি হবার হতেই হবে। আমরা ভুলে গেলেও ওপরওলার বিধান ভুল হবার নয়। সুরের কোনো কাঠামো যদি না বেঁধে দেওয়া যায় সুরস্রষ্টার

ভাবনার আদলটি হারিয়ে যায়। আর লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে একই স্বরলিপি অনুসরণ করে দুজন শিল্পী একই গান গাইলেও তাদের প্রকাশভঙ্গির তফাত হবেই। একটা জিনিস আয়ত্ত করলেও প্রকাশের ক্ষমতা সবার সমান নয়। এইখানেই আবার আসে প্রতিভার প্রশ্ন। মাস-ট্রেনিং-এর জন্য স্বরলিপি অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু। সবাই ত আর রাজেশ্বরী কিংবা সুচিত্রা কণিকা নয়?

এখনকার ছেলেমেয়েরা আমাদের মতো এত গুরুর স্নেহ, যত্ন, মনোযোগ পায়নি। নানা দিকে তাদের নানা সমস্যার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। তবু তারই মধ্যে এরা চেষ্টাচরিত্র করে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখছে এবং এই ধারাকে বজায় রেখেছে সেজন্য আমি তাদের বাহাদুরী দিই।

জর্জের গানের এত সমালোচনা হয়। কিন্তু আমার দারুণ ফেভারিট আর্টিস্ট। কারণ ওর একসপ্রেশন অসাধারণ। ওর গাওয়া 'আমি চঞ্চল হে' 'তুমি রবে নীরবে', এসব গানের তুলনা হয় না। সমালোচনা করলেই হলো? সমরেশ চৌধুরীও রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক সার্থক শিল্পী। কিন্তু তিনি যেন অনেকটা অবহেলিত। অনেক সময় তাঁর কথা মনে হলে বেদনা বাজে। মনে হয় সমরেশবাবু যেন তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি পাননি।

গায়কী সম্বন্ধে বেশী সচেতন হতে গেলে গান যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। যুগে যুগে শিল্পীভেদে পরিবেশনার তারতম্য ঘটে থাকে। এ নিয়ে অত বেশী মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। অনেক গান আছে যেগুলো তালে গাইলে তার ভাব ব্যাহত হয় বলে আমি মনে করি।

শ্রীযুক্তা অমিয়া ঠাকুর নিজেকে নেপথ্যে রাখলেও সঙ্গীতজগৎ তাঁর অবদান থেকে বঞ্চিত হয়নি। বেশ কিছুদিন ইনি অডিশন বোর্ডের মেম্বর ছিলেন, রেডিও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন। প্রদেশ কংগ্রেস এবং রবীন্দ্রসদনে সংবর্ধনার উত্তরে গান গেয়ে সর্বশ্রেণীর শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন।

অতীত ঐতিহ্যের সার্থক ধারানুসারী হলেও যুগছন্দের প্রতি উদাসীন নন বলেই একটি মুগ্ধকারী ভারসাম্যে অমিয়া ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব এত মধুর।

কনক বিশ্বাস

"রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর তপস্যার ধন। এ সুর হারিয়ে যেতে পারে না।"

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম যুগে যখন এ গানের ব্যাপক প্রচার হয়নি সেই যুগেও (তখন তিনি কনক দাস) এই গানই তাঁর মর্মে দোল দিয়েছিলো। সে যুগে তিনিই একমাত্র শিল্পী, যিনি আটষট্টিটি গান রেকর্ড করেছেন—প্রেম পূজা, প্রকৃতি, তথা সকল রকমের রবীন্দ্রনাথের গান (তখনও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিভাষার সৃষ্টি হয়নি)।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঊষা-লগ্নে সূর্যোদয়ের আভাস মাখানো রক্তরাগ সেদিনের কিশোরীর চিত্তে জাগালো অনুরাগ। আজ পূর্ণ-সূর্যের দীপ্তিতে ধরণী উদ্ভাসিত। তরুণ মনের সেই রঙিন আবেগে তবু প্রচণ্ড শক্তির প্রখরতা জাগে নি। পূর্বরাগের আবেশে সে মন তেমনই রাঙা। কনক বিশ্বাসের সঙ্গে স্বল্প কয়েকমুহূর্তের সাক্ষাৎকারে এই কথাটিই যেন মধুর সুরে হৃদয়ে বেজেছিলো।

তখনকার যুগে পিপল্‌স সং বলতে ছিলো মঞ্চের গান এবং ছবিও। সঙ্গীত তখনও উচ্চাঙ্গের আর্টরূপে স্বীকৃতি পায়নি। সু-কণ্ঠের অধিকারী হয়ে যাঁরা গানকে জীবিকারূপে গ্রহণ করতেন তাঁরা মঞ্চ বা চলচ্চিত্রে চলে যেতেন। এবং গানকে মর্যাদা দেবার মতো মানসিকতা তখনও সমাজের বড় একটা অংশেই তৈরী হয়নি!

অভিজাত-ধনী সমাজে ছিলো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। এবং সেটাও ছিলো সম্পূর্ণ বাইরের মহলের ব্যাপার।

গানকে ভালবেসেই গান শেখা ও চর্চার রেওয়াজ সমাজের যে ক'টি অতিবিদগ্ধ পরিবারে সীমিত ছিলো কনক দাস সেই স্বল্প কয়েকজনেরই অন্যতমা। মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্ত ছোটো মাসীমা ও মেসোমশায় সুবালা আচার্য ও প্রাণকৃষ্ণ আচার্যর উৎসাহেই বাড়িতে ছিলো কবির গানের অবাধ প্রবাহ। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই চেতনা ছুঁয়েছিল তারই ধারা।

তখন গান গাইতাম শুনে শুনে শিখে। এ গান সম্বন্ধে সিরিয়াস হলাম রবীন্দ্রনাথকে দেখার পর। ঝুনুদি (সাহানা দেবী) আমায় প্রথম জোড়া-সাঁকোয় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই প্রথম তাঁকে দেখি। গানও শোনালাম, ভয়ে ভয়ে। অনেক তাগাদার পর লাজুক শিল্পী এই ক'টি কথাই বললেন।

শুনে কি বললেন?

অতশত জানি না কুঞ্চিত ভ্রূ। কিন্তু মুখে হাসি। পাশের দিকে মুখ

ফিরিয়ে নিলেন আমার প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে। মনটা অনেক বছর আগে পিছিয়ে গেল বলেই কি মুখে ফুটে উঠলো অমন সলাজ হাসির মধুরাভাস? তারপর থেকেই জোড়াসাঁকোর সকল উৎসবে ডাক পড়তো। জোড়াসাঁকোতেই প্রথম বর্ষামঙ্গল উৎসবে গেয়েছিলাম 'অশ্রুভরা বেদনা।'

একবার বেলজিয়ামের মহারানী এসেছিলেন। তাঁরই সম্মানার্থে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা 'নটীর পূজা' অভিনয় করেছিলেন। সেখানে প্রথমদিন আমি, অন্যদিন তখনকার বিজয়া দাস (শ্রীমতী সত্যজিৎ রায়) গেয়েছিলাম 'বন্ধু রহো রহো সাথে'।

ঝুনুদি এলং বুলাদা (প্রফুল্ল মহালানবীশ) এঁদের সঙ্গে প্রায়ই জোড়াসাঁকো যেতাম। গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গেও যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন বুলাদাই। বুলাদার সঙ্গে মেজদির (সতীদেবীর মা) ননদের বিবাহ হয়েছিলো। এবং সেই সূত্রেই আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

যতদূর মনে পড়ছে বুলাদার উদ্যোগেই গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রতিনিধি ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য আমায় রেকর্ড করতে নিয়ে যান। তখন বেলঘরিয়ায় রেকর্ড হতো। মাইক্রোফোন ছিলো না। ফানেলে কাজ হতো। আমার প্রথম রেকর্ড 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার'। তারপরে একেবারে আটটা করে রেকর্ড হতো।

সবই রবীন্দ্রসঙ্গীত?

প্রায় সবই। অন্য গানও গাইতাম। রেকর্ডও করেছি দু-একটা। তবে সেগুলি সংখ্যায় খুবই কম।

যথা?

ঝুনুদিই দিলীপদার (দিলীপকুমার রায়) সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌতে থাকতে তাঁর কাছে কিছু গান শিখেছিলাম। সুরসাগর হিমাংশু দত্তেরও অনেক গান গাইতাম। চারখানা গান রেকর্ডও করেছিলাম। 'তব স্মরণখানি', 'জানি না সে অজানারে'—বাকী দুটো গান মনে পড়ছে না। এইটুকু শুধু মনে আছে এই গানগুলির সঙ্গে সুজিত নাথ কি সুন্দর গীটার বাজিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়েই গান গাওয়া শুরু হয়েছিলো। সারাজীবন ধরে গেয়েছি তাঁরই গান। মাঝে অন্য যা গান গেয়েছি সে শুধু স্বাদবৈচিত্র্যের তাগিদেই।

ক্লাসিক্যাল গানের তালিম পেয়েছিলাম গিরিজাবাবু, সত্যকিংকরবাবু ও যামিনীবাবুর কাছে।

আপনি এত রবীন্দ্রসঙ্গীত কোথা থেকে শিখলেন?

প্রথমত ব্রাহ্ম সমাজের অনুষ্ঠান শুনে এবং সেখানে গেয়ে। তারপর রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসবার পর থেকে জোড়াসাঁকোর উৎসবগুলোয় গাইতে গাইতে অনেক গান শেখা হতো। উৎসবের আগে অনেকদিন ধরে রিহার্সাল চলত দিনুদার পরিচালনায়। শিক্ষা ও রেওয়াজের প্রশস্ত অবকাশ ছিলো

সেইখানেই। দিনুদা যেমন উদার প্রকৃতির মানুষ ওঁর শিক্ষাদান এবং সঙ্গীত চিন্তাও ছিলো তেমনই উদার। উনি গানের সুরটা তুলিয়ে দিতেন এবং সেই স্ট্রাকচারটা বজায় রেখে নিজের ভাবের ইঙ্গিতে গাইবার স্বাধীনতা দিতেন। যে গাইবে তার গাইবার বৈশিষ্ট্যও যেন গানে খুঁজে পাওয়া যায়। এইটেই ছিলো তাঁর মত।

'জীবনে পরম লগন' শিখেছিলাম তাঁরই কাছে। শৈলজাদার ট্রেনিং-এ রেকর্ড করেছিলাম 'ডেকোনা আমারে', 'জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার।' এ গান অ্যাপ্রুভড হবার জন্য কবির কাছে স্যাম্পেল কপি গিয়েছিলো। উনি শুনে বুলাদাকে বলেছিলেন, বলে দিস পাসড উইথ অনার্স।

আস্তে আস্তে অনেক রেকর্ডই হলো। জর্জের সঙ্গে ডুয়েট গানও কয়েকটি রেকর্ড হয়েছিলো। ক'টা? ঠিক মনে নেই। যতদূর মনে পড়ছে 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী', 'ঐ ঝঞ্ঝার ঝংকারে', 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা' এবং 'সংকোচের বিহ্বলতা'। শান্তিনিকেতনে একবার গিয়ে একমাস ছিলাম। আমার নিজের কিন্তু গান গাইবার চেয়ে শুনতেই বেশী ভালো লাগতো। গুরুদেবের আগ্রহেই আমায় অনেক গান গাইতে হয়েছিলো এবং এই সময় আমার গানের ঝুলি ভারী হয়ে উঠেছিলো তাঁরই দাক্ষিণ্যে। দিনুদার কাছে রোজ গান শিখতাম। কবি শান্তিনিকেতনের ওস্তাদদেরও বলে রেখেছিলেন আমি যতদিন থাকব গান শেখাতে। এছাড়াও তাঁর মনে গান গুনগুনিয়ে উঠলেই আমার ডাক পড়তো। এই সময়েই উনি শিখিয়েছিলেন 'সখি আঁধারে একেলা ঘরে'। আর একদিনের কথা মনে পড়ে। বৃষ্টি নেমেছে। হঠাৎ একজন ছাতা মাথায় দিয়ে নিয়ে এলো কবির একটি চিরকুট—'কল্যাণীয়াসু শীগগির চলে এস। একটা নতুন গান লিখেছি। দেখো বৃষ্টিতে ভিজে যেন গলা খারাপ কোরো না।' সেইদিনই শিখিয়েছিলেন 'ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে'।

উনি যে এতবড় মানুষ, কাছে গেলে কিন্তু সে কথা একেবারেই বোঝা যেতো না। ওঁর মতো অত বড় না হলে বোধহয় অমন সহজ হওয়া যায় না। একবার অটোগ্রাফ নিতে গেছি ভয়ে ভয়ে। উনি বললেন, রেখে যাও। পরের দিন যেতেই হাতে দিলেন খাতাটি। দেখলাম ওঁর ছবির মতো লেখায় ছোট কবিতা—

'কী সুর তুমি জাগালে উষা
কনকবীণা তারে।
নবজীবন লহরি ওঠে
সুপ্ত পারাবারে।'

আর কি? বলবার মতো আর কোনো ঘটনা অভিজ্ঞতা কিছুই আমার নেই।

কনকদি সেই কথাটা? বলুন না? গীতা সেনের কণ্ঠে মিনতি ঝরে।

'কোনটা?'

সেই কৃষ্ণকলি গান লিখেছিলেন আপনাকে······

না, না, ওসব বাজে কথা, উনি শশব্যস্ত দু'হাত তুলে থামবার ইঙ্গিত করেন।

কি ব্যাপার শুনিনা—

জানো সন্ধ্যা, কনকদির চোখ দুটো খুব সুন্দর ছিলো তো? সেই দেখেই রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই ব'লি গানটি—

না, না, মোটেই নয়। গীতা ওসব বাজে কথা বোলো না, গীতাদিকে কনকদি প্রায় মারতে যান আর কি।

শুনেছি এই সংকোচ ও লজ্জার জন্যই কনক বিশ্বাসকে দিয়ে সহজে গাওয়ানো বা রেকর্ড করানো যেতো না। জোড়াসাঁকোর উৎসবে গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কথাকে ভগবানের আদেশ বলে মনে করতেন তাই। এখনকার গানের প্রসঙ্গে বললেন—যাঁরা গাইছেন তাঁদের তাল, মান লয় আগের চেয়ে অনেক উন্নত সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাবের সেই ছোঁওয়া কই? তার কারণ হয়ত স্বরলিপি-নির্ভরতা। ভারতীয় অন্য সকল গানের ধারার মতো রবীন্দ্র-সঙ্গীতও গুরুমুখী বিদ্যা। গুরুর কাছ থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের আবেগ মিশিয়ে গাইলে তার যে রূপ ফোটে, স্বরলিপি দেখে সুর তুলে তালের সঙ্গে সেট করে নিয়ে নির্ভুলভাবে গাইলে সে রূপ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রথমটিতে থাকে একটা ভাবকে নিজের অনুভবলোকে সত্য করে তোলার আকুলতা, অন্যটিতে সতর্ক মনের সচেতন পাহারাদারী—এদিক ওদিক ভয়ে ভয়ে দেখে পা টিপে চলা। যেন ভুল না হয়। অন্তর্মুখী চেতন ও বহির্মুখী যতন—এ দুয়ের মধ্যে একটা তফাত থাকবেই।

তাছাড়া আমরা গান গাইতাম গাইবার আনন্দেই। এর মধ্যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না। এখনকার শিক্ষার্থীরা দু-চারখানা গান শিখতে না শিখতেই কি করে ফাংশনে গাইবেন অথবা রেকর্ড করবেন সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত।

আমরা যখন রেকর্ড করতাম তখন মিউজিক বোর্ড, অথবা সঙ্গীতগুরুদের অনুমোদন এ সবের কোনো বালাই ছিলো না। তার ফলে অনেক বেসুরো গানও রেকর্ড হয়ে বেরোতো। মনে আছে আমার 'ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ' গানটা রেকর্ডে শুনে গুরুদেবের ক্ষুণ্ণ তিরস্কার—এ গান শুনে অনুতাপ কর। কার কাছে এভাবে শিখলে কে জানে? এসব গানের সুর আমি ভুলি না।

রেকর্ডের দু-চারখানা গান উনি অনুমোদন করেছিলেন। বাদ বাকী গান তখনকার নিয়মেই বেরিয়েছে। 'বহুযুগের ওপার হতে' গানটি ওঁর অ্যাপ্রুভড। আমাদের সময়ের গান তালে বড় একটা গাওয়া হতো না। অধিকাংশ রেকর্ডের গানই তালবিহীনভাবে গাওয়া হয়েছে। পরে অবশ্য কিছু গানের রেকর্ড তালেই বেজেছে। সবরকম গান গেয়েছি। কিন্তু পূজা, প্রকৃতি ও বর্ষার গানে মনটা যেভাবে সাড়া দিয়ে উঠেছে এমন আর কোনো গানে নয়। 'সহসা ডালপালা তোর' শেখাবার সময় কবি বারবার বলেছিলেন, মনে রেখো সহসা

কথাটা তিনবার হবে।

এইসব খুঁটিনাটি কথা মনে রেখে গানের আইডিয়াটাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা সব সময় থাকতো। টাকার জন্য গান গাওয়াটায় বাড়ির সকলের খুব আপত্তি ছিলো। গান গাইতাম গানেরই জন্য। রেকর্ড করা শুরু করবার পর এক বছর আমি কোনো দক্ষিণা অথবা রয়্যালটি নিইনি। এখন শুনছি শ্রাদ্ধে গান গেয়েও অনেকে দক্ষিণা নিয়ে থাকেন। আমরা এ বস্তু কল্পনাতেও আনতে পারতাম না।

আর যে কোনো গানকে তার যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠার নিষ্ঠা শুধু আমার নয়, সে যুগের সকল গায়ক-গায়িকারই ধ্যান-জ্ঞান জপমন্ত্র ছিলো বললেও অত্যুক্তি হয় না। ঝুনুদির কথাই ধর না? ওঁর কণ্ঠের রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উক্তি মনে আছে ত? ঐ একই অনুরাগ নিয়ে উনি গাইতেন অতুলপ্রসাদ, ডি. এল. রায় ও দিলীপদার গান। যখন যাঁর গানই গাইতেন তাঁর ভাবকল্পনায় মনকে রাঙিয়ে নিতেন। সেইজন্য ভিন্ন সুরকারের গান আপনাপন বৈশিষ্ট্যেই তাঁর কণ্ঠে ধরা দিয়েছে। কোনো ম্যানারিজম অথবা প্রকাশভঙ্গির ইগোইজম তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত রূপায়ণের পথ আগলে দাঁড়ায়নি। সুরকারের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে না গাইলে গানে প্রাণ সঞ্চার হয় না। তখনকার প্রফেশ্যনাল গাইয়েরাও এই শ্রদ্ধার অধিকারী ছিলেন বলে তাঁরা কালজয়ী হয়ে আছেন। সায়গল অথবা কাননের গানে হয়তো পঙ্কজবাবুর ও রাইবাবুর অবদান অনেক। কিন্তু তাঁদের প্রতিভা ও ভাব গভীরতা ছিলো জন্মগত সম্পদ। এ বস্তু কেউ কাউকে দিতে পারে না।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে পঙ্কজবাবুর নিজের বিধিদত্ত কণ্ঠ ও আরাধনা ত ছিলোই। সঙ্গে সঙ্গে এ দুটি শিল্পীর ভূমিকাও কম নয়। সায়গলের দরাজ কণ্ঠ, কাননের একসপ্রেশন, তাঁদের অনন্য করে রেখেছে। মানুষের চরিত্রের গাম্ভীর্য ও মর্যাদাবোধ তার গানেও প্রতিফলিত হয়। এটা আমি উপলব্ধি করেছিলাম কাননের গান শুনে। ওর জীবনীতেও দেখেছি—আমি কিছু জানিনা, আমায় শিখতে হবে—এই বোধটা ওর মধ্যে সদাজাগ্রত ছিলো বলেই ওঁর অন্তর এমন গ্রহণশীল হয়ে উঠেছিলো। রানীদি, বুলাদারা কি সাধে ওঁকে এত ভালোবাসতেন?

আমায় ঠিক করে গাইতে হবে, শিখতে হবে এই তাগিদের জন্যই ও যা কিছু গেয়েছে সবই ওঁর নিজের গান হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের গান থাকবে নিশ্চয়ই। প্রকৃতির নিয়মেই মাঝে মাঝে ভাঁটার টান আসবে। কিন্তু তারপরেই আসবে প্রবল জোয়ার। এ-সঙ্গীত তাঁর তপস্যার ধন। এ সুর হারিয়ে যেতে পারে না।

মালতী ঘোষাল

"প্রতিটি সুর বা রাগের একটা নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি বা ধর্ম আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে এই ধর্মকে চিনেছিলেন এবং তাঁর গানে তাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমার কাছে এই জন্যই তিনি বড় রূপকার।"

রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেনেসাঁর এই স্বর্ণলগ্নে এ-গানের জোতিষ্কতুল্য শিল্পীরাও নতজানু হন যে ক'জন পূর্বসূরীর কাছে, শ্রদ্ধেয়া মালতী ঘোষাল তাঁদেরই একজন। আর বিস্ময়সিন্ধু উথলে ওঠে যে-কথাটি স্মরণ করলে সেটি হলো এই যে, মাত্র দু'খানি রেকর্ডের চারখানি গানই তাঁকে এমন ঐতিহাসিক খ্যাতির অধিকারী করেছে। আজকের দিনের তরুণতম রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরও রেকর্ডের সংখ্যা বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই মালতী দেবীর চেয়ে অনেক বেশী। প্রতিভার ক্ষেত্রে অঘটনটাই বোধহয় স্বাভাবিক ঘটনা। না হলে মাত্র চারখানি গান ('কে বসিলে', 'হৃদয়-বাসনা পূর্ণ হলো', 'যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার', 'এ পরবাসে')। চণ্ডালিকার প্রকৃতির মনে আনন্দর সেই 'একটি গণ্ডূষ জল' চাওয়ার বিস্ময়দোলের স্মৃতির মত রসিক চিত্তে এমন অনপনেয় হয়ে রইল কেমন করে? প্রতিদিনের এত রকমের রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর; এত প্রতিভা-সমৃদ্ধ, অলংকার-ঝলমল, মধুঝরা কণ্ঠের গান, ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো হৃদয়তটে আছড়ে পড়ার বিরাম নেই। তবু কেউ ত ভোলেননি উদাত্ত কণ্ঠের সেই আবেগমুখর 'কে বসিলে আজি?' সে-গানের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা চেনাঘাটের সীমারেখাগুলিকে অতিক্রম করে মানস-সরোবরের পথে যাত্রা করেছে বলেই কি?

ছাত্রীজীবনে ওঁর সঙ্গে একদিনের জন্যই দেখা এবং পরিচয় হয়েছিলো এক সহপাঠিনীর আত্মীয়া হিসাবে। তখন জানতাম না ইনি স্বনামধন্য শিল্পী, অথবা গান গাইতে পারেন। তবু ওঁকে অন্য সবার চেয়ে আলাদা বলে মনে হয়েছিলো। কেমন একটা আনমনা স্বপ্নময়তা ওঁর স্বভাবে, কথাবার্তায় মিশে-ছিলো বলে। পরিণত-বয়স্কা, কিন্তু শিশুর মতো লাজুক-লাজুক ভাব। ওঁর কথাবার্তার ভঙ্গি, লজ্জানম্র হাসি এম এস শুভলক্ষ্মীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলো। এত কথা মনে হয়েছিলো, তবু জানতাম না উনিও একজন উঁচু-মানের শিল্পী। কারণ ওঁদের পরিবারের সবাই-ই গুণী হলেও বড় প্রকাশকুণ্ঠ। নিজেদের ঢাক নিজেরা পেটানোর অভ্যাস একেবারেই নেই।

বিবেকানন্দ রোডে ব্যাকট্রোলজিক্যাল ক্লিনিকের সেই ফ্ল্যাটটা থেকে নামতে

নামতে বন্ধুকে বললাম—ওঁকে খুব ড্রিমি মনে হলো। ও বলল, আরে বাবা, কাকিমা শুধু আকাশের দিকে তাকিয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারেন।

এ-ঘটনার প্রায় চার-পাঁচ বছর পরে। একদিন রেডিওতে বাজছে 'কে বসিলে আজি—' স্বরলাবণ্য ও শ্রুতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধ্বনি দিয়ে এক-একটি নিটোল মুক্তো রচিত হয়েই তরঙ্গিত তানের মালার মনোহর গতিদোলায় ধাক্কা দিতে দিতে উঠলো ওপরে। স্বরদ্যোতনা আকাশকে স্পর্শ করলো বিধিদত্ত অধিকারে। গান শেষ হবার পর আমরা যে ক'জন শুনছিলাম—যেন স্তব্ধ হয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ বাদে মৌনতা ভাঙলাম আমিই—কি আশ্চর্য কণ্ঠ! কিন্তু মালতী ঘোষাল কে? এর আগে ত ওঁর গান শুনিনি, আর এ-ধরনের রবীন্দ্রসঙ্গীতও শুনিনি।

হাসি-ছবিদের সঙ্গে এত ভাব অথচ মালতী ঘোষালকে চেনো না? উনি ত ওদেরই কাকিমা—বললেন আমাদের এক কমন ফ্রেন্ড। চিনব কেমন করে? নিজেদের কথা কি ওরা বলে?

ঐ পর্যন্তই। তারপর সেই সোনার মুহূর্তটি অনেক ঘটনার ভিড়ে বুঝি হারিয়েই গেলো। কিন্তু ভুলে থাকা যে ভোলা নয়—সেই কথাটিই নতুন করে উপলব্ধি করলাম যেদিন ওঁদের এল পি ডিস্ক প্রকাশিত হবার উপলক্ষে গ্রামোফোন কোম্পানীর সন্তোষ সেনগুপ্ত, টি. পি. রায়চৌধুরী ও পি. কে. ব্যানার্জি প্রমুখ কর্তাব্যক্তিরা এক প্রীতি-সম্মেলন করেছিলেন ডাঃ নীহাররঞ্জন মুন্সীর বাড়িতে। সে-আসরে উনি ছাড়াও এসেছিলেন সতী দেবী, কনক বিশ্বাস, রেণুকা সেনগুপ্ত। সেদিন ভালো করে দেখলাল আত্মভোলা, লাজুক মানুষটিকে। চুপচাপ বসে। মুখে সেই লজ্জানম্র হাসি, যে-হাসি দেখেছি উদয়শঙ্কর ও এম. এস. শুভলক্ষ্মীর মুখে। অনেকদিন বাদে অনেক জানাশোনা মানুষের সঙ্গে সবার দেখা। সবাই কথা বলতে ব্যস্ত। অতীতের দিনগুলি স্মরণে কলোচ্ছল। উনি নীরবে এক কোণে বসে সবার কথা শুনছেন ঠিক বাধ্য ছাত্রীর মতো।

তারপর ওঁকে দেখেছি রবীন্দ্রসদনে এবং আরো অনেক প্রতিষ্ঠান-এর সংবর্ধনা সভায়, গানও শুনেছি। ঠিক গান শোনার মুহূর্তটিতেই 'হঠাৎ দেখা পথের মাঝে' চরণটি মনে এসেছিলো বারবার।

ওঁর কাছে যাব-যাব করেও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সময় না এলে কিছুই হবার নয়।

শুনলাম ওঁর সঙ্গে অনেক সাংবাদিকেরই ইন্টারভ্যু করার চেষ্টা বিফল হয়েছে। কারণ, প্রথমত শিশুর মত লজ্জা, দ্বিতীয়ত পারিবারিক নম্রতা—কি এমন আমার আছে যাতে কাগজের এতখানি জায়গা আমার জন্য নষ্ট হতে পারে? দেয়ার আর মোর থিংস ইন্ হেভেন অ্যান্ড আরথ টু রাইট অ্যাবাউট। এইটেই হচ্ছে ওঁর মত।

আগেই বলেছি মাত্র দুটি রেকর্ড করেই ইনি গৌরবের আসনে সমাসীনা।

কিন্তু বিস্ময়ের শেষ এখানেই নয়। স্বধর্মে ইনি ক্লাসিক্যাল গাইয়ে, নিজের মনে যখন-তখন গেয়ে থাকেন শুদ্ধ রাগসঙ্গীত। সরী মিয়ার টপ্পা, খেয়াল শিখেছিলেন গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গুণীদের কাছে। সঙ্গীত সংঘে গান শেখার সময় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা-তালিকার মধ্যে ছিলো বলেই মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হতো। স্কুল অথবা কলেজের ফাংশনে নাম করেছিলেন খেয়াল টপ্পা গেয়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীত যৎসামান্যই গেয়েছেন। এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অকৃপণ বাহবা পেয়েছেন যেসব গান শুনিয়ে, তার একটিও রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়। তবু তাঁর খ্যাতি রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুরুস্থানীয়া শিল্পীরূপেই। ফ্যাকটস আর স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। কেন ? সে আলোচনায় পরে আসছি।

গান ওঁর জীবনে এসেছে, না এসে পারেনি বলে। ভগবানদত্ত কণ্ঠ নিয়েই জন্মেছিলেন—তার সঙ্গে মিলল পরিবেশের আশ্রয়। বাবা কুন্তলীন পারফিউমের স্রষ্টা। শুধু প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন না, ছিলেন যথার্থ সঙ্গীতানুরাগী। বাড়িতে অজস্র রেকর্ডের সঙ্গে ছিলো প্যাথোফোনে ধরে রাখা রবীন্দ্রনাথ, মানদাসুন্দরী, অমলা দাস এবং ভারতের প্রায় সকল ওস্তাদের গান-বাজনা।

আমার মনে হয় গান শেখাটা যতখানি প্রয়োজন ঠিক ততখানি তার চেয়েও বড় প্রয়োজন ভাল গান শোনার। বড় গুণীদের গান শুনতে শুনতে সত্যি-কারের সঙ্গীতধারণা গড়ে ওঠে, অন্তরশ্রুতি খুলে যায় সুর-তাল-লয় সম্বন্ধে—মনের মধ্যে একটা সংস্কার গড়ে ওঠে। এই সংস্কারই ধ্রুবতারার মতো পথ দেখায়।

কেমন করে ?

ধরো, কোনো একটা রাগ শিখলে। জানলে তার আরোহী, অবরোহী, বাদী, সমবাদী এবং দুর্বল স্বরও। কিন্তু জেনে শুদ্ধভাবে গাওয়া একরকম। আবার বড় শিল্পীর কণ্ঠে শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়—ঐ একই পর্দায় শ্রুতি ও স্বরের সমন্বয়ে, কোনো সুরে একটু থমকে দাঁড়ানোর মনোহর ভঙ্গিতে কিংবা দুর্বল স্বরের সাজেস্টিভ ছোঁয়ায় কি দুর্দান্ত রস সৃষ্টি হতে পারে। প্রতিভার এই সব আশ্চর্য সৃষ্টির অভিজ্ঞতা আহরণ না করলে রসবোধ জন্মায় না।

বাবার এই সব গানের কালেকশন থেকে আমি মানদাদেবী, অমলা দাস, আবদুল করিম খান, গহরজানের কত গান যে তুলেছিলাম। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে গানই আমার সঙ্গী, সাথী ও আনন্দের উৎস হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু ও-কি ? হাতে খাতা পেন্সিল কেন। না, না, এগুলো লিখো না। লেখবার মতো কথা এসব নয়। প্লিজ—

আচ্ছা লিখব না। তবে লেখবার সময় যদি মনে পড়ে যায় অপরাধ নেবেন না ত ? নির্মল হাসির ঝরনা বয়ে গেলো।

এই রকম মিষ্টি মিষ্টি কথা দিয়েই তুমি বুঝি শিল্পীদের জয় করে নাও ?

আমি আর জয় করতে পারলাম কই ? হৃদয়-জয়ের ব্যাপারটা ত শিল্পীদেরই একচেটিয়া—

আবার সেই হাসির নূপুর। এই প্রথম আমি তাড়াহুড়ো করে কাজ সারবার চেষ্টা না করে অবান্তর নানা কথা ও আলোচনা এনে ওঁর হাসি ও কথার মুহূর্তগুলিকে প্রলম্বিত করবার চেষ্টা করছিলাম। ওঁর গানের মত কথা আর হাসিও যেন অন্তরের অতল ভাবের সৌরভে সুরভিত। আর এই সব টুকরো টুকরো কথাগুলি শুনতে শুনতেই বার বার মনে মনে গুন গুন করছিলো কবির গানেরই একটি কলি-'পুষ্প বনে পুষ্প নাহি আছে অন্তরে।'

মানদাসুন্দরীর কত গান যে তুলেছিলাম—

একটা গান গেয়ে শোনান না—

ওরে বাবা এই ভাবে কি গান হয় ?

একটু গুন গুন করে প্লিজ—

গাইবার আগের মুহূর্তের কুণ্ঠা গাইবার সময় কোথায় ভেসে গেলো। 'এখনও কি ব্রহ্মময়ী মনের মত'—প্রতিটি তান মীড় সুরের নিবিড়তা মিলে কয়েকটি মুহূর্ত যেন মায়াময় হয়ে উঠলো। এখনো উনি এমন ফর্মে আছেন —এ খবর অজানাই থেকে যেতো, যদি না এই সাক্ষাৎকার উপলক্ষে ওঁর সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটতো।

আপনি বাইরে গান না কেন ? একান্তে নিজেকে লুকিয়ে রেখে এভাবে আমাদের বঞ্চিত করবার কোনো মানে হয় ?

উত্তরে সেই শিশুর মত লাজুক হাসি, নীরবতার সঙ্গতে।

আপনার কিছু রেকর্ড অন্তত করা উচিত। এমন কণ্ঠের মাত্র চারখানি গান শুনে তৃষ্ণা মেটে না।

রেকর্ড করবার অনিচ্ছে আমার নেই। রোজ সকালে পায়চারি করতে করতে আমি যখন গান গাই, আমার গলাটা যে কোথায় উঠে যায়, নিজেই অবাক হই। তবে কতদিন এটা থাকবে বলতে পারি না।

পায়চারি করতে করতে আপনি কোন গানগুলো বেশীর ভাগ গান ?

তার কি কোনো ঠিক আছে ? সরী মিয়ার টপ্পা ঠুংরী 'জগতে তুমি রাজা' ...কিন্তু তুমি আবার এসব লিখবে না ত ? সভয়ে প্রসঙ্গের যবনিকা টানতে চাইলেন—লক্ষ্মী মেয়ে এসব লিখো না। সবাই হাসবেন।

লিখতে বসে এ-ঘটনাটা যদি হাস্যকর বলে মনে হয় লিখব না। তবে এখুনি কিছু কথা দেওয়া যাচ্ছে না।

ভারী দুষ্টু তো। অথচ তোমায় দেখে খুব নরম মিষ্টি, ভালমানুষ মনে হয়।

অ্যাপিয়ারেন্স ইজ নট রিয়েলিটি।—আবার সেই হাসির ঝর্ণা।

সন্ধ্যা, এইরকম গল্পস্বল্প করতেই খুব ভালো লাগছে। ওসব ইন্টারভ্যু-টিন্টারভ্যু চেপে যাও। তার চেয়ে এস বেশ প্রাণ খুলে গল্প করি।

আমি ত সেইটেই চাই। ইন্টারভ্যুর কথাটা আপনিই ভুলতে পারছেন না !

কি করে ভুলব? তোমার হাতে যে খাতা-পেন্সিল?

খাতা-পেন্সিল ব্যাগে পুরে রাখছি। শুধু আপনি সহজ হন।

ছোটবেলায় যে-কোনো গান শুনলেই তুলে নিতে পারতাম। যত কঠিন গানই হোক একেবারে নিখুঁত হয়ে উঠতো বলে চারদিকের চেনামহলে বেশ নাম-ডাক হয়ে গেলো। বাবা সঙ্গীতরসিক বললে কিছুই বলা হয় না, সঙ্গীতপ্রাণ মানুষ ছিলেন। উনি সুরেনবাবুর (বন্দ্যোপাধ্যায়) কাছে আমার গান শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমার তখন বারো বছর বয়স।

সুরেনবাবু যেমন গুণী তেমনই যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন শিক্ষকতার কাজে। উনি গলা তৈরী হবার জন্য নিজস্ব পদ্ধতিতে কি সুন্দর সুন্দর তান, সার্গম, পাল্টা তৈরী করে শেখাতেন। শুধু তাই নয়, নিজে বসে রেওয়াজ করতেন, রীতিমত অভিনিবেশের সঙ্গে তদারক করতেন কোন স্বরটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে না এবং কেন এটা হচ্ছে। এমন গুরু পাওয়াও ভাগ্যের কথা। কিন্তু এক বছর শিখতে না শিখতেই দার্জিলিং চলে গেলাম। ওখানের কনভেন্টে ভর্তি হলাম। তারপর পড়াশোনা ওখানেই চলতে লাগলো।

সতেরো বছর বয়সে কলকাতা এলাম। তখন আবার শিক্ষা শুরু হলো গোপেশ্বরবাবুর কাছে। 'সঙ্গীত সংঘ' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তখনকার খুব নামকরা প্রতিষ্ঠান ছিলো। তখনকার দিনের দিক্‌পাল গুণীরা এখানে শেখাতেন। গোপেশ্বরবাবু, হাফেজ আলি খাঁ, কেরামতুল্লা খাঁ—কে ছিলেন না? শিখতে আসতেন অভিজাত ঘরের মেয়েরা। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, প্রতিভা দেবী (আশুতোষ চৌধুরীর স্ত্রী)। ঠাকুরবাড়ির কালচারটা ওদের মধ্যে পাওয়া যেতো।

আমি গান গাইতে পারি এই খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিলো এই প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে। প্রত্যেক বছর দুটো করে উৎসব হতো—একটা রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে, অপরটি সরস্বতী পুজোর দিন।

মনে পড়ে আমার সর্বপ্রথম পাবলিক পারফরমেন্স স্কুলের প্রাইজ উপলক্ষে একটা ফাংশনে। প্রথমে গেয়েছিলাম—'এ সখি আওরে', সিন্ধু রাগে, তারপর সরী মিয়ার টপ্পা।...এত অ্যাপ্রিসিয়েশন পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। কেউ ছাড়তেই চান না। একটার পর একটা গাইতে গাইতে কত গান যে গেয়েছি খেয়াল নেই। শুধু মনে আছে গাইতে বসে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম আর এত আনন্দ জীবনে কোনোদিন পাইনি। মনে হয়েছিলো আকাশ যেন আমার কানে কানে কথা বলছে আর সারা হৃদয় যেন গানে গানে ভরে যাচ্ছে।

এ পর্যন্ত আপনার শিক্ষা ও গানের যে ছবি পাওয়া গেলো, তার মধ্যে রাগসঙ্গীত, খেয়াল, সরী মিয়ার টপ্পা—এই সবেরই প্রাধান্য দেখছি। এখনও অবধি রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোনো হদিশই পাচ্ছি না। অথচ সঙ্গীতমহলে আপনার পরিচয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরূপে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত ঐখানেই শিখেছিলাম। কিভাবে জানো? ভারী ইন্টারেস্টিং। ওখানে যন্ত্রসঙ্গীত, কণ্ঠসঙ্গীত সবই শেখানো হতো বড় বড়

ওস্তাদ দিয়ে। আমি সেতারও শিখতাম। আর বাজনার জন্য তারিফও পেয়েছি অনেক। ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁর কাছে সেতার শিখতাম। একদিন ক্লাসে বসে রেওয়াজ করছি আপনমনে। গান-বাজনার সময়ে আমার পরিবেশ সময় কিছুর সম্বন্ধেই হুঁশ থাকতো না। হ্যাঁ, কি বলছিলাম? সেতার বাজাচ্ছি, হঠাৎ চমকে দেখি পিছনে দাঁড়িয়ে হাফেজ আলি খাঁ সাহেব। বললেন—বহুত সুরেলা হাত তোমার। আমার কাছে শিখবে? আসলি ঘরানা চিজ তোমায় দিয়ে যাব।

আমি ভীতু মানুষ। ওসব কথা শুনে কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। শুনেছিলাম ওস্তাদদের ঘরানা চিজ পেলে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে রাখতে হয়। একটু এদিক-ওদিক হলেই গুরুর অভিশাপ লাগে। তাই খাঁ সাহেবের কথা শুনে যন্ত্র নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালাম। শুধু মাথা নীচু করেছিলাম। ওঁর কথার কোনো উত্তর দিতে পারিনি।

কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রসঙ্গ?

এবার আসছে। ওখানেই সেতার, এস্রাজ, নাচ, ক্ল্যাসিক্যাল গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত সবেরই ক্লাস হলো। এঘরে গোপেশ্বরবাবু অরিজিনাল হিন্দী গানটা শেখাচ্ছেন 'বে পারিয়া'—ওঘরে শান্তিনিকেতনের শ্যামসুন্দর মিশ্র শেখাচ্ছেন সেই হিন্দী গানের সুরের রবীন্দ্রসঙ্গীত 'কে বসিলে আজি', এঘরে গোপেশ্বরবাবু শেখাচ্ছেন 'মহারাজা কেওয়াড়িয়া', ওঘরে শ্যামসুন্দরবাবু শেখাচ্ছেন 'খেলার সাথী'। এতো থ্রিলিং লাগতো। একই সুর—ভাষার তফাতে কেমন নতুন রঙে রাঙা হয়ে ওঠে?

রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাল লেগেছিলো কি কথার মাধুর্যের কারণে?

না। আমার কাছে চিরদিন কথার চেয়ে সুরই বড়—সে বাংলা গানেরই হোক আর হিন্দীরই হোক। যেমন 'শাঁওরিয়া রে' শুধু ঐ একটি কথাকে আশ্রয় করেই সুরের কত আলপনা, আকাশছোঁয়া আবেদন সৃষ্টি হতে পারে। সুরই পারে ভিনদেশী মানুষের কাছেও কথার অন্তরের লুকানো আনন্দ-বেদনার আবেগকে পেঁৗছে দিতে। 'কে বসিলে আজি' গানটির কথাই ধর না? শুধু যদি কথা ক'টি আবৃত্তি করে যাও, মনে কোনো দাগ কাটে কি? কিন্তু হৃদয়াসনের টুকরো একটু অবরোহী তান। 'ভুবনেশ্বর'তে ক'টি মীড়ের আত্মনিবেদনের বিনম্রতার পর আবার কে—এর আকুল সুরে ঐ উদাত্ত জিজ্ঞাসা? সুরের বিদ্যুৎস্পর্শ ছাড়া এসব এমন করে জীবন্ত হয়ে উঠতো কি? সুরই আমার অন্তরকে টানে।

এই প্রসঙ্গেই একটা ঘটনার কথা বলছি। প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিলো কলকাতাতেই বর্ষামঙ্গলের প্রথম উৎসবে। দেখলাম মেয়েরা সবাই লালপাড় শাড়ী পরে গাইতে বসেছেন। মাথায় কাপড়। তখনকার দিনে আমাদের ব্রাহ্মবাড়ির অবিবাহিতা মেয়েদেরও মাথায় কাপড় দেওয়ার রেওয়াজ ছিলো। ওঁদের বসা, পরিবেশন, চালচলনের লালিত্য খুবই ভালো লেগেছিলা। কিন্তু গানগুলো ঠিক মনে লাগেনি।

আমি আগেই বলেছি, খুব লাজুক ছিলাম। কবির কাছ থেকে অনেকখানি তফাতে একপাশে জড়সড় হয়ে বসেছিলাম। মাঝে মাঝে সবার দৃষ্টি বাঁচিয়ে ওঁকে দেখছিলাম। আর 'জগতে তুমি রাজা' ওঁর গানের কথা দিয়েই ওঁকে তুলনা করতে ইচ্ছে করছিল। পরেও অনেকবার ওঁকে দেখেছি এবং ওঁর সংস্পর্শেও এসেছি। এত আনন্দময়, রঙ্গপ্রিয়, রসিক, প্রিয়ংবদ মানুষ, কিন্তু এক মুহূর্তও যদি কথা না বলে নীরবে বসে থাকতেন, মনে হতো যেন ধ্যানে বসেছেন। যাই হোক, আমার কাকা ওঁর কাছে নিয়ে গেলেন। উনি গানও শুনলেন। এখনও ভাবলে সারা শরীর কেঁপে ওঠে, উনি গান শুনে স্নেহ-মাখা কৌতুকে দুটি ভুরু তুলে কি মধুর ভঙ্গিতে বলেছিলেন, কি নাম বললে? মালতী? কুঁড়িতেই এত গন্ধ? ফুটলেত একে আর রাখা যাবে না। তারপর বলেছিলেন, ভবিষ্যতে ওঁদের উৎসবে গাইতে। আমি চুপ করেছিলাম। ওঁর প্রথম ক'টি কথা মনকে এমন করে দুলিয়ে দিয়েছিল যে, পরের কথাগুলোতে আমি মন দিতে পারিনি।

কি গান শুনিয়েছিলেন?

একটা হিন্দী গান। নামটা ঠিক মনে নেই। লিখো না বাবা। লক্ষ্মীটি। লেখবার সময় মনে না পড়লে লিখব না—।

হাসলেন। এবারের হাসি অন্যমনস্ক। হয়ত স্মৃতিচারণের আবেগেই। কবির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ঘটেছে অনেক পরে। মীরা চৌধুরীর বিয়ের পর ওদের বাড়ির ছাদে জ্যোৎস্না রাতে এক আসর হয়েছিলো। আমি সবার দৃষ্টির আড়ালেই বসে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার দিকে চোখ পড়তেই কবি আদর করে কাছে ডাকলেন। বললেন, গান শোনাও। সেদিন গেয়েছিলাম বিভোর হয়ে। সরী মিয়ার টপ্পা, ঠুংরী, রাগসঙ্গীত যা মনে এসেছিলো।

রবীন্দ্রসঙ্গীত?

না। তখনও ক্ল্যাসিক্যাল রবীন্দ্রসঙ্গীতের সন্ধান পাইনি।

উনি ক্ষুণ্ণ হননি?

ওঁর মন কি আমাদের মত এতটুকু? বিরাট সমুদ্রের মত হৃদয়। তার কোনো তল নেই, সীমা নেই। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ইয়ার্ডস্টিক দিয়ে ওঁর মনকে মাপতে যাওয়ার মত ভুল আর কিছু নেই। আমার সীমা-টানা ক্ষুদ্র গণ্ডীতে ও মন কি সীমাবদ্ধ হবার? উনি গানই শুনতে চেয়েছিলেন—গান শোনার ছলে কোনো আত্মবিজ্ঞপ্তির ঢাক পেটাতে চান নি। ওঁর মধ্যে কোনো প্রিটেনশন ছিলো না। মুক্তপুরুষ ত?

যাই হোক, সেদিনের গান গাওয়ার অনুভূতির স্মৃতি বোধহয় জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি ভুলতে পারব না। কি পেয়েছি সে হিসেবকে ছাপিয়ে এইটুকুই মনে আছে—যা পেয়েছি তার ভেতর থেকে হৃদয়ের যা কিছু সুন্দর উপলব্ধি, মধুর অনুভূতি যেন বেরিয়ে আসছিলো। চোখের সামনে একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার ভেতর থেকে যেন ঝর্ণা বেরিয়ে এসে

আমারই মাথায় মুখে স্নিগ্ধ জলের ছিটে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এক একটা তানের পর যেই গানের মুখে ফিরছি আর উনিও 'আহা' করে উঠছেন। যতবার তানের মধ্যে বিস্তার অথবা অলংকরণ আসছে ততবারই কানে আসছে ওঁর উচ্ছ্বসিত 'আহা' ধ্বনি—আর মনে হচ্ছে আমার প্রণাম যেন ভগবানের চরণে পৌঁছচ্ছে।

সেদিনের গানের পর গুরুদেব বললেন—আমাদের ফাংশনে এবার থেকে তোমায় গাইতে হবে। আমি নীরব।

তারপর কতবার কত উৎসবে স্বয়ং প্রশান্ত মহলানবীশ এসেছেন গাইবার আমন্ত্রণ নিয়ে। কিন্তু আমার মা খুব কন্‌সারভেটিভ ছিলেন। কিছুতেই মত দিলেন না, আমার মেয়ে কোথাও গাইতে যাবে না। আমিও মেনে নিতাম। কারণ আমি শুধু ভীতুই ছিলাম না, মার খুব বাধ্য মেয়ে ছিলাম। কতবার শ্রদ্ধেয় অনাদি দস্তিদার এসেছেন আমায় রেকর্ড করাবার জন্য। কিন্তু মা তাঁকেও ফিরিয়ে দিয়েছেন বার বার। ঐ একই কারণে ইন্টারমিডিয়েটের পর আমার আর পড়াই হলো না।

এর জন্য আপনার মনে কোনো কষ্ট ছিলো না? শিল্পীর উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বলি।

ছিলো না আবার? সবাই বলতো রেকর্ড করলে তোমার গান কতলোক শুনতে পাবে। কনক দাস তখন রেজিং। মাঝে মাঝে মনটা বড্ড উতলা হয়ে উঠতো আমার কিছু হলো না ভেবে। তবু মার মনে কষ্ট দিয়ে কোনো কিছু পাবার কল্পনাও করতে পারতাম না।

শুনেছি আপনাদের পরিবারে কেউ একজন সাধুসন্ত ব্যক্তি ছিলেন!

আমার শ্বশুরমশাই কাশীচন্দ্র ঘোষাল মস্তবড় সাধক দাতা ও সঙ্গীতবেত্তা ছিলেন। এ-হাতে দান করলে ও-হাতে জানতে পারে না—তিনি এই ধরনেরই দাতা ছিলেন। আমার ঠাকুরদা হরমোহন বসুও সঙ্গীতের সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সত্যিকারের সঙ্গীতজীবন এবং বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়মিত গাওয়া শুরু হয়েছিল আমার বিবাহোত্তর জীবনে। আমার বিবাহ হয়েছে ১৯৩৫ সালে। গান শুনেই আমার স্বামী আমায় পছন্দ করেছিলেন। আমাদের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় গানের আসর বসতো ওঁরই উৎসাহে। যত গাইয়ে বাজিয়ে সেখানে আসতেন।

একটু থেমে আবার হেসে বললেন, আমার দুটি রেকর্ডের প্রথমটি 'কে বসিল আজি' ও 'হৃদয় বাসনা পূর্ণ' হয়েছিলো চল্লিশ বছর বয়সে। দ্বিতীয় রেকর্ড 'এ পরবাসে' ও 'যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার' করেছি পঞ্চাশ বছরে। তার আগে খুব সম্ভব ১৯৪৩ সালে শুভ গুহঠাকুরতাই আমায় রেডিওতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই গান শুনেই রথীদা বলেছিলেন, বারোখানা গান রেকর্ড করতে। বারোখানার জায়গায় দুখানা গান করেছিলাম। কবির সেন্টিনারিতে গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে চারবার চিঠি এসেছিলো রেকর্ড করবার জন্য। কিন্তু কি জানি কেন আমার ইচ্ছে হয়নি। সে চিঠির উত্তরও দেয়া হলো না।

ইচ্ছে হয়নি কেন ?

আমার স্বামীকে হারানোর পর ভেতর থেকে প্রেরণার আলো যেন স্তিমিত হয়ে এলো। তখন একমাত্র চিন্তা মেয়েকে মানুষ করতে হবে। এইটেই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো…।

একটু থেমে অন্যমনস্কভাবে বললেন, অথচ এই রেকর্ড করতে না পারার জন্য, এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণেও তখনকার প্রেসটিজ ফাংশনে গাইতে না পারার দরুন মনের মধ্যে কি গভীর বেদনাবোধ ছিলো বলে বোঝাতে পারব না। মনে আছে একবার কি একটা উৎসবে জাতীয় সঙ্গীত গাইছি কোরাসে। গানের শেষে পিঠের ওপর কার হাতের যেন টোকা পড়লো। পিছনে ফিরে দেখি দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বললেন, তোমায় কতবার আমার ফাংশনে গাইবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি, কিন্তু এলে না। ওঁর কথার জবাব দিতে পারিনি। কিন্তু বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠেছিলো।

রবীন্দ্র সেন্টিনারিতে বুলাদা (প্রফুল্ল মহলানবীশ) আমাকে লণ্ডনে পাঠাতে চেয়েছিলেন আর্লিয়েস্ট অপরচুনিটিতে। আমি যাইনি। তখন রাজেশ্বরীকে পাঠানো হলো।—

এই প্রসঙ্গেই বলি, একটা খবর হয়তো আপনার জানা নেই। আপনারই প্রথম রেকর্ড শুনে রাজেশ্বরী দেবীর সঙ্গীত ধারণায় বিপ্লব ঘটে গিয়েছিলো। তার আগে টপ্পা কি বস্তু উনি জানতেন না এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতে টপ্পা এমন একটা রূপলোক সৃষ্টি করেছে এ-সত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে আপনার ঐ একটি রেকর্ড শুনেই। তারপরই উনি এই ধরনের ক্ল্যাসিক্যাল রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখবার তাগিদ অনুভব করলেন।

তাই নাকি ?—

কিন্তু আমার কাছে এটা এখনও রহস্যই থেকে যাচ্ছে—আপনার কাছে গান মানেই ক্ল্যাসিক্যাল গান, দুখানা মাত্র রেকর্ড। তবু আপনার খ্যাতি রবীন্দ্রসঙ্গীতেই। আর ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর থেকে বাইরে গান গাওয়া ত ছেড়েই দিয়েছিলেন ? তাহলে।

একথার উত্তর এলো শ্রীমতী অমিতা চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে, যিনি আগামী ১৬ নভেম্বর মানিকতলা মেন রোডে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়-সভায় গাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন। উনি বললেন, তখন ব্রাহ্মসমাজে ১১ই মাঘ মালতীদিকে অনেক গান গাইতে হতো। ব্রাহ্মসমাজ মস্তবড় একটা প্ল্যাটফর্ম ছিলো। এখানে শহরের জ্ঞানী-গুণী, সাহিত্যিক বিদগ্ধ রসিক সবাই নিয়মিত আসতেন। ঐ মহলে স্বীকৃতি পাওয়াটা ছিল একটা মস্তবড় খ্যাতির পটভূমিকা তৈরী হওয়ারই সামিল। তখন এত জলসা অথবা গানের আসরের মরশুম ছিলো না। এবং ঐ উৎসবে মালতীদির গান একটা মস্তবড় অ্যাট্রাকশন ছিলো। সেইজন্যই রেকর্ড অথবা রেডিওতে খুব বেশি না গাইলেও ক্ল্যাসিক্যাল রবীন্দ্রসঙ্গীতে ওঁর অসাধারণ দখলের খবর

ছড়িয়ে পড়তে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হতেও দেরী হয় নি—

সঙ্গীত সংঘও একটা বড় প্ল্যাটফর্ম ছিলো। মালতী দেবী বললেন, এখানে গুরুরা ছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠস্থানীয় গুরু সে কথা ত আগেই বলেছি। এখানে শিখতে আসতেন শহরের সেরা পরিবারের মেয়েরা এ-ও বলেছি। আমার সতীর্থদের মধ্যে ছিলেন অমিয়া ঠাকুর, লীলা গুহ, রত্না বেজবড়ুয়া, অরুণা বেজবড়ুয়া। সঙ্গীত সংঘের সব ফাংশনে অমিয়া গাইতো ধ্রুপদ অঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীত, আমি খেয়াল অঙ্গের। অমিয়ার চেহারাটি ছিলো যেমন সুন্দর তেমনই আশ্চর্য কণ্ঠ। যখন ও তানপুরো হাতে নিয়ে গাইতে বসতো আর ঘন কালো দীর্ঘ চুলের গোছা সামনে এসে পড়তো ঠিক মনে মা সরস্বতী বসে আছেন। ওঁর মুখের ভাবখানি বড় পবিত্র ছিলো। যখন গাইতো ঐ ভাবেরই উদ্ভাস ওঁর মধ্যে কেমন একটা অপার্থিবতা এনে দিতো। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখতাম।

একটু আগেই আপনি বললেন, কথার চেয়ে সুরই আপনার কাছে বড়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রশ্ন করছি রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরের কি ধরনের আবেদন আপনার মনকে দোলায় ?

ধর্ম। মানুষের মত প্রতিটি রাগের এবং সুরেরও একটা নিজস্ব প্রকৃতি এবং প্রকাশভঙ্গি আছে, একেই আমি তার ধর্ম বলি। রাগের অন্তরে রূপটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এই কারণেই তাঁকে আমি বড় রূপকার বলে মনে করি। কথা যেখানে থেমে যায় সুরেব ভূমিকা সেইখান থেকে শুরু। কিন্তু কথার সৌন্দর্য তাঁর কাছে গানের একটা প্রধান অঙ্গস্বরূপ ছিলো—সর্বপ্রধান কিনা জানি না—তবে বললেও খুব অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু কথাকে প্রাধান্য দিয়েও সুর অথবা রাগভাবের বৈশিষ্ট্যকে তিনি পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন। ধ্রুপদ অঙ্গের গানে তিনি ধ্রুপদী শান্তরসকে যেমন অবিচলিত রেখেছেন—তেমনই সুরের সূক্ষ্ম কারুকৃতি, টুকরো মীড়ের কোমল মাধুর্য, খেয়াল অঙ্গের গানকে অলঙ্কৃত করছে। ঠিক এই কারণেই তাঁকে আমি বড় মিউজিশিয়ান মনে করি।

শিল্পী যখন গান করেন তাঁর মন যদি সুরের মর্মগহনে প্রবেশ করে তাহলে সুরের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে যান। এই একাত্মতা এবং একাগ্রতা না এলে কোনো শিল্পীর গানই শ্রোতাদের হৃদয়কে ছুঁতে পারে না। 'বিমল আনন্দে জাগোরে' শেখাবার সময় শ্যামসুন্দর মিশ্র বলেছিলেন, এ গান যদি ঠিকমত গাও একঘর লোক কাঁদবে।

কথাটি আমার হৃদয়কে খুব বিচলিত করেছিলো। আর ঐ কথাটিই আমার অন্তর গহনে বীজমন্ত্রের মতই যেন কাজ করিয়ে নেয়।

গাইতে বসলে গায়ক বা গায়িকার মন যেভাবে বিহার করে ঠিক সেই ভাবটিই তার গানে মুখর হয়ে ওঠে। আমার মনে ভাব সুরের পথ বেরিয়ে এসে তোমার মনের দরজায় ধাক্কা দিলো। তখন তোমার অনুভূতি অন্তরের

অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে আমার আবেগের সঙ্গে হাত মেলালো। এমন না হলে গান গাওয়ার কোনো মানে হয়? সুবিনয়বাবুর কণ্ঠে একবার 'জগতে তুমি রাজা' আমার মনে ঠিক এইরকমই ধাক্কা দিয়েছিলো। ওঁর গানে এইরকমই একটা আপনহারা ভাব আছে। আবার হেমন্তবাবুর গান দেখ? তার সৌন্দর্য আলাদা। গান শুনেই মনে হয় গাইবার জন্য কোনো প্রস্তুতি নেই—কোনো কেরামতি দেখাবার চেষ্টা নেই। সরল ভঙ্গিতে যখন যে গানটি গান মনে হয় যেন ফুল ফুটিয়ে গেলেন।

আর এক আর্টিস্ট জর্জ বিশ্বাস। কতবছর আগে ওঁর গান শুনেছি—এই সেদিনও শুনলাম। কই কণ্ঠের সম্পদ ত এতটুকুও নষ্ট হয় নি? যেমন দাপট তেমনই কোমলতা।

জর্জদা লোক কিন্তু মোটেই সুবিধের নয়। বড্ড ঝগড়াটে—

আবার সেই হাসি, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে বড় বেশীরকমের সুবিধের। তাই ঝগড়াটা ভালই জমে।

এবার হাসির পালা আমার। তবে আমার হাসির সুরে ত আর ও-মীড় বাজবে না তাই যতদূর সম্ভব নিঃশব্দেই হাসি।

আপনি শান্তিনিকেতন যান নি?

একবার গিয়েছিলাম, কিন্তু ধু-ধু মাঠ। চারদিক খাঁ-খাঁ করছে। কেমন যেন মন টিকলো না। ওখানে এক রসজ্ঞ ব্যক্তি বলেছিলেন, তুমি এখানে থাক, আমার রোজ একটা করে গান শোনাবে। নিজের গানের প্রশংসা শুনে আনন্দ হয়েছিলো। কিন্তু শান্তিনিকেতনে থাকবার প্রস্তাবে আমার মন একটুও সায় দেয় নি।

গান আপনার প্রাণ—তবু ১৯৫২-র পর রেডিও রেকর্ডের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করলেন কেন?

কারণ প্রথমত আগেই বলেছি এ বিষয়ে প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন আমার স্বামী। তিনি যখন চলে গেলেন—নিজের মধ্যে আর তেমন জোর পাচ্ছিলাম না। আর একটা কারণ অর্থ উপার্জনের কোনো তাগিদ ছিলো না। তিনি যা রেখে গেছেন, যথেষ্ট। তাই মনে হলো তাঁর কর্তব্য তিনি এমন সুন্দর-ভাবে সম্পন্ন করেছেন। বাকিটা মানে সুনুকে যথার্থ শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব আমার। তাই ওকে স্কুলে দিয়ে আসা, নিয়ে আসা, পড়ানো থেকে সব দায়িত্ব আমাকেই নিতে হলো।

সুনু ত সবদিক দিয়েই ব্রিলিয়ান্ট। ওকে সৎ পাত্রস্থও করেছেন। আপনার কণ্ঠও এখন পূর্ণ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এখন গাইতে বাধা কোথায়? কিছু রেকর্ডও আপনার করা দরকার। মাত্র চারখানি গানে ভাবীকালের মানুষ আপনার গানের আন্দাজ পাবেন কি করে?

রেকর্ড করতে আমার আপত্তি নেই বলেছি ত! আমার লং-প্লেয়িংটার গানগুলো শুনলে এত খারাপ লাগে? একটা ডিস্কে তিন-চারজন, আর্টিস্টের বারোখানা গান ধরাবার জন্য এমন একটা স্পীডে গানগুলো ট্রান্সফার করা

হয়েছে যে গানের কোনো চেহারাই আসে নি। টপ্পার তানের রস ওতে পাওয়া যায় ?

সন্ধ্যা, তুমি ভালো ভালো গান বেছে দেবে টপ্পা বা খেয়াল অঙ্গের ? আমি যদি না জানি শিখে নিয়ে রেকর্ড করব ?

নিজেকে বিজ্ঞ ভাবার প্রত্যেক মানুষেরই একটা সহজাত প্রবৃত্তি আছে। এই জন্মগত শক্তির দৌলতেই প্রায় ভেবে বসেছিলাম আর কি—যে এতবড় শিল্পীকে ডিকটেট করবার মত যোগ্যতা আমি রাখি ? কিন্তু ভাগ্য ভালো—ওস্তাদী চালে হ্যাঁ হ্যাঁ সে ব্যবস্থা করা যাবে—বলবার আগেই মনে পড়ে গেলো গুণীর ধর্মই হলো সকলের কাছে নিজেকে নত করা। তাই সাজেশন চাওয়াটা ওঁর পক্ষে যতখানি উদারতার পরিচয়, সাজেশন দিতে যাওয়াটা আমার পক্ষে ততখানিই মূর্খতা। এই নিবন্ধের মাধ্যমেই গ্রামোফোন কোম্পানিকে অনুরোধ জানাচ্ছি ওঁর গান রেকর্ড করতে। দেরী হলে আফসোসের কারণ ঘটতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আর দেখা হয় নি ?

হয়েছিলো। প্রশান্ত মহলানবীশের 'বাড়ীতে। কেশরীবাঈ সেদিন এসেছিলেন কবিকে গান শোনাতে। আমি ওঁকে প্রণাম করতেই রহস্যভরে জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি ? চিনতে পারছি না কেন ? ইন্দিরা দেবী বললেন, সে কি ? চিনতে পারছ না ? ও মালতী, যার গান শুনে তুমি মুগ্ধ হয়েছিলে ?

সেই কৌতুকে ভুরু তুলে বললেন, কি করে চিনব ? এ যে প্রস্ফুটিতা মালতী ? কি সুন্দর কথা না !

খুব সুন্দর।

সেইদিনই আর এক সুন্দর অভিজ্ঞতা হয়েছিলো। কেশরীবাঈ কবিকে গান শোনালেন। গানের শেষে ওঁর পায়ে মাথা রেখে গাঢ়-স্বরে বললেন, আজ আমি আপনাকে গান শোনাবো বলে সারাদিন ধরে নিজেকে তৈরী করে এসেছি।

ওঁর বলার মধ্যে একটা কাতরতা ছিলো যে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিলো। শিল্পী নিজেকে দেবতার কাছে নিবেদন করবার তাগিদেই নিজের শক্তির সীমাকে অতিক্রম করতে পারে—আর কেবল সেই মুহূর্তেই গান হয়ে ওঠে নির্মাল্য।

সতী দেবী

> এমন কোনো জাতের গান নেই যা রবীন্দ্রসঙ্গীতে নেই। এক হিসেবে রবীন্দ্রসঙ্গীতলোককে ভারতীয় সঙ্গীতের সূচীপত্রও বলা যায়। আর প্রতিটি গানের কথার সঙ্গে সুরের স্টাইলের কি নিবিড় সখ্য। এ জিনিস আর কোথাও মেলে না।

রবীন্দ্রনাথের গান যখন তাঁর অন্তরঙ্গ পারিবারিক মহলের মধ্যে সীমিত ছিলো, সাধারণ মানুষ হঠাৎ একটা আধটা রেকর্ডে সম্পূর্ণ অন্যধরনের কথা ও সুরে অভিজ্ঞতার একটা বিচিত্র-স্বাদ অনুভব করতে এবং এ গানকে রবি ঠাকুরের গান বলে জানতো—সেই যুগেরই এক স্বনামধন্যা শিল্পী হলেন সতী দেবী। পারিবারিক আভিজাত্য এবং বৈদগ্ধ্য থেকেই উৎসারিত তাঁর শিল্প ও সঙ্গীত প্রতিভা। তাঁর কণ্ঠসম্পদ ও শিক্ষা সে যুগে দেশের বরেণ্য সমাজের বিপুল সমাদর পেয়েছিলো। তাঁদের সকলের অকৃপণ প্রীতির দাক্ষিণ্য শিল্পীর স্মরণপটে অনির্বাণ দীপাধারের অজস্র শিখায় জ্বলছে। কিন্তু অন্তরের নিভৃত-লোকে অতিসঙ্গোপনে যে কথাটি ঘনপাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা হাস্নুহানার গন্ধের মতই তাঁর মনকে সুরভিত করে রেখেছে সেটি হলো এই যে তিনি কবিগুরুর যথার্থ স্নেহের পাত্রীদের অন্যতমা আর কবির কাছে স্বীকৃতির পরম মূল্য তিনি আদায় করে নিয়েছিলেন আপন যোগ্যতার অধিকারে—বিধিদত্ত প্রতিভার শক্তিতে।

মহাকালের রথ থেমে থাকে না, অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলে। সেই নির্মম মহাকাল অনিবার্যভাবেই কেড়ে নেয় মানুষের সব সম্পদ। কণ্ঠ, শ্রুতি, শক্তি, সৃষ্টিপ্রেরণা। সব নিয়ে নেয়। কিন্তু তার অমোঘ শক্তি হার মানে একটি জায়গায়, স্পর্শকাতর মানুষের স্মৃতিলোকের অজেয় শক্তির কাছে। এখানে স্থূল হাত বাড়াতে বুঝি তার মত নিষ্ঠুরেরও সঙ্কোচ হয়।

এই একান্ত আপনার অন্দরমহলটি অভিমানী বেদনায় মানুষ রুদ্ধই রাখে। পাছে বে-দরদী মানুষের অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। হঠাৎ কখন কোন আবেগ-চঞ্চল মুহূর্তে কার কাছে যে আচম্বিতে মনের এই গোপন কপাট খুলে যায় কেউ কি জানে?

এমনই এক দুর্লভ মুহূর্তে সতী দেবীকে জানবার সুযোগ হয়েছিলো মাত্র ক'দিন আগে। বেশ কয়েক বছর আগে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যেই গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে প্রকাশিত একটি এল. পি. ডিস্কে শুনেছিলাম ওঁর গাওয়া

'জয়যাত্রায় যাও গো', 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই'—তারপর বহুবার দেখা হয়েছে। ওঁর স্নেহসিক্ত মনটির স্পর্শে অভিভূত হয়েছি। কিছুদিন আগে যখন এক ঘরোয়া আড্ডায় রুমা গুহঠাকুরতা আর ও-বাড়ীরই কয়েকজন মিলে গানের, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রসঙ্গে মেতে উঠেছিলাম সেদিনের অভিজ্ঞতা অন্যরকম।

শিল্পী হঠাৎ বলে উঠলেন, এতজন রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় কিন্তু কারো স্টাইলই গুরুদেবের স্টাইল বলে কানে লাগে না—

কেউ ঠিক গান না? একজনও না?

একমাত্র জর্জ ঠিক গায়। ওঁর গলা একসপ্রেশন, অনুভবের গভীরতা, সব মিলিয়ে যে স্টাইলটি ফুটে ওঠে সেইটেই রবীন্দ্রভাবনার স্বরূপ। মেয়েদের মধ্যে মোহর, সুচিত্রা, নীলিমা—ইদানীংকালের শিল্পীদের মধ্যে খুকু (ঋতু গুহঠাকুরতা), সুমিত্রা সেন, অর্ঘ্য সেন, এদের গানও আমার খুব ভালো লাগে। হেমন্তর কয়েকটি গান এত ভালো লেগেছে ভোলা যায় না। বলতে বলতে কি তীব্রভাবে শিল্পী বেঁচে উঠলেন অতীতের দিনগুলিতে।

শৈশব থেকে (চার বছর বয়স যখন) শুরু করে যৌবনের অনেকগুলি দিন কেটেছে পাটনায়। বাবা চারুচন্দ্র দাস শুধু সঙ্গীতরসিকই ছিলেন না, গাইতেন অসাধারণ। তাঁরই শিক্ষা ও আগ্রহে মেয়ের মনে গানের গুঞ্জন জেগেছিলো, ভালো করে চেতনা জাগবার আগেই। গানের পরিবারে জন্ম বলেই অঙ্কুর থেকে বনস্পতি হতে সময় লাগেনি। মেসোমশাই চিত্তরঞ্জন দাস প্রায় প্রতি সপ্তাহে আরাতে যেতেন কেস করতে। আর তিনি পৌঁছতে না পৌঁছতেই ডাক পড়তো আদুরে দুলালীর। মাসীমা অমলা দাস তখনকার দিনের নাম-করা গায়িকাই শুধু ছিলেন না, রবীন্দ্রসঙ্গীত-রসিকের স্মরণপটে চিরকালের রেখায় তাঁর ছবি আঁকা থাকবে। সুরমুখরা বুড়ি ছিলো তাঁদের নয়নমণি। আড়াতে গেলেই মাসীমার কাছে গান শেখা, মাসীমা ও মেসোমশাইকে গান শোনানো—এই দিয়েই ছোট্ট মেয়েটির গানের স্বপ্ন গড়ে উঠেছিলো। এছাড়া রোজ বিকেলে মেয়ের একক আসরের শ্রোতা ও শিক্ষক ছিলেন তার সঙ্গীত-বিভোর বাবা।

একবার আমার চোখে ইনফেকশন হয়ে চোখদুটি প্রায় হারাবার অবস্থা হয়েছিলো। সেই সময় একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম—

এসব স্বপ্ন-টপ্নর কথা থাক মা, গানের কথা বল। রুমা গুহঠাকুরতা বাধা দিয়ে বলেন, বাবা তোমার গান শুনে তোমায় বিয়ে করতে চাইলেন—সন্ধ্যাদি এইসব কথাতেই ইন্টারেস্টেড।

ও হ্যাঁ—আমি একদিন আপন মনে শ্যামাসঙ্গীত গাইছিলাম, আমি বুঝতে পারিনি মাসীমা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। আমার গান শুনে উনি কেঁদে ফেলেছিলেন। এরপর মাসীমাই উদ্যোগী হয়ে প্রমথবাবুর কাছে আমার গান শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর নানা জায়গায় গাইতে গাইতে মোটা-মুটি একটা নামও হলো। ঝুনুদি (সাহানা দেবী) বাবার আপন মামাতো

বোন। তাঁর কাছেও শিখতাম।

১৯২৬ সাল—সরলা দেবী 'মায়ার খেলা' অভিনয়ের জন্য আমাকে শান্তা আর অমিয়া ঠাকুরকে প্রমদার গীতিনাট্যের ভূমিকার জন্য নির্বাচন করলেন। কয়েকদিন রিহার্সালের পর উনি আমাদের দুজনকে জোড়াসাঁকোয় নিয়ে গেলেন কবিকে আমাদের গান শোনাবেন বলে।

সেদিনটার কথা আজও ভুলতে পারিনি। বোধহয় জীবনের শেষদিন অবধি, যতক্ষণ চেতনা থাকবে ভুলবো না। এমন আনন্দময় মুহূর্ত সারাজীবনে একাধিকবার আসে না ত। আমরা দুজন কম্প্রবক্ষে, উৎসুক নেত্রে অপেক্ষা করে বসে আছি কখন তিনি আসবেন। প্রায় আধঘণ্টা বাদে সাজসজ্জা শেষ করে নামলেন। একটু থেমে বললেন, খুব শৌখিন মানুষ ত। সাজটি সবসময় পরিপাটি হওয়া চাই। চোখে খেলে গেলো সেই দুষ্টুহাসির ঝলক যে হাসির সঙ্গে সুরেলা কণ্ঠের কৌতুক-রঙিন খুনসুটি মিশে অমন ভুবন-বিজয়ী কবিকেও বিপন্ন করে তুলত।…কবি এলেন—শিল্পী তন্ময়চিত্তে বলে চলেন, আর সঙ্গে এলেন নন্দনকাননের পারিজাতের গন্ধ। আবার একটু বিরতি, যেন গন্ধের স্মৃতিদীপন আবেশে উন্মনা।

ওমা, থামলে কেন? বলনা, ওঁদের দেরী হয়ে যাচ্ছে না? রুমার তাড়নায় উনি আবার ফিরে এলেন ১৯২৯ থেকে ৭৫-এ—এখনও যেন দেখতে পাচ্ছি জানো, কবি চোখ বুজে শুনছিলেন। আমি গান গাইবার সময় কোনোদিকে তাকাইনি। রানু (অমিয়া ঠাকুর) যেই শুরু করলো একবার চট করে ওঁর মুখে চোখ বুলিয়ে নিয়ে দেখলাম—বেশ খুশী খুশী ভাব।

গান শেষ হওয়ার পর ওঁর সেই অননুকরণীয় মোলায়েম মিহি গলায় বললেন, হ্যাঁরে সরলি, তুই এত সুন্দর সুন্দর গলা কোথা থেকে থেকে যোগাড় করলি রে?—নাঃ, এত প্লেন সুর এদের গলায় বেমানান, সুরের মধ্যে আর একটু খোঁজ-খাঁজ জুড়তে হবে। তারপর আমাদের গাওয়াতে গাওয়াতে গানগুলির কোথায় কোথায় আরো সূক্ষ্ম, মীড়, শ্রুতি কিংবা ছোট্ট একটু তানের মত গিটকিরি দিলে ভালো হয় দেখিয়ে দিলেন।

এই হলো তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়পর্ব। তারপর থেকে যতদিন বেঁচে ছিলেন তাঁর স্নেহ থেকে কোনোদিন বঞ্চিত হইনি। গুরুদেবের স্নেহ আমার জীবনের ঈশ্বরের বরদান।

এই মায়ার খেলার রিহার্সালের সময়ই রুমার বাবার সঙ্গে পরিচয়। ওঁর বিরাট গাড়ি করে আমাদের প্রতিদিন রিহার্সালে নিয়ে যেতেন আবার বাড়ি পৌঁছে দিতেন। আমার গান শুনে উনি মুগ্ধ। তারপরই আমাদের বিয়ে হলো। বিয়ের পর ওঁরই আগ্রহে অমূল্য মুখার্জির কাছে গান শেখা শুরু।

…আমার প্রথম রেকর্ড গ্রামোফোন কোম্পানির লেবেলে 'হে ক্ষণিকের অতিথি।' এটা কিন্তু রেকর্ড করবার কথা ছিলো ছোটোপিসীর (কনক বিশ্বাসের)। কিন্তু উনি বড্ড ভীতু আর লাজুক ছিলেন। একলা গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড করতে যাবেন না। আমাকেও সঙ্গে যেতে হলো।

সেখানে গিয়েও কিছুতেই আগে গাইতে রাজী হলেন না। সেই এক জেদ, বুড়ী আগে গাক। ও না গাইলে আমি গাইব না। ভয় কাতুরে শিশুর মত আমায় ঠেলা দিলেন। আমার গান শুনেই ওখানকার সাহেব রেকর্ডিস্ট বললেন, মে আই টেক ইওর রেকর্ড? প্রথমটায় রেকর্ড করতে আমার মত দুর্দান্ত সাহসী মেয়েরও একটু দ্বিধা জেগেছিলো। চোঙার ভেতর মুখ ঢুকিয়ে গাইতে হবে। সাহেব দুহাতে মাথা ধরে থাকবেন। উঁচু পর্দায় গলা তোলবার সময় হ্যাঁচকা টানে মাথাটা বাইরের দিকে সরিয়ে নিয়ে পিচ কন্‌ট্রোল করবেন। আবার নীচু পর্দায় গাইবার সময় মাথাটা ধরে চোঙার দিকে এগিয়ে দেবেন। আমি দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু এইসব দেখেশুনে ছোটোপিসী প্রায় ফেন্ট হবার যোগাড়। অতএব আমাকেই রেকর্ড করতে হলো। প্রথম টেকেই সাহেব হাঁকলেন, পারফেক্‌ট্‌লি অলরাইট।

এইসব দেখতে দেখতে ছোটোপিসী খানিকটা ধাতস্থ হলো। তারপর ওর রেকর্ড হলো 'কবে তুমি আসবে বলে।' ঐ প্রথম রেকর্ডই একবারে সুপারহিট্‌।

এরপর হিমাংশু দত্তর সুরে প্রথম গানের রেকর্ড 'সাগর পারের বন্ধু আমার' এবং পরপর তাঁরই ট্রেনিং-এ খান পনেরো গান আর প্রত্যেকটি গানই হিট্‌। 'আঁখিতে ভরিয়া জল' গানটি সবার মুখে মুখে ফিরেছিলো। অমূল্যবাবুর সুরে মীরা ও কবীরের ভজনও করলাম।

বিজয়া (সত্যজিৎবাবুর স্ত্রী), আমি, ছোটোপিসী প্রায়ই নানা ঘরোয়া আসরে একসঙ্গে গাইতাম। আমাদের বাড়ীতেই একটা শিল্পীমণ্ডলী গড়ে উঠেছিলো বলেই গানটা জীবনে এতবড় হয়ে উঠতে পেরেছে আর গানকে ঘিরেই দল মেলেছিলো আমাদের যৌবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের কিরণবিলাসী কুঁড়িগুলি।

আমার জ্যাঠামশাই অতুলপ্রসাদ সেনের কাছেও সুযোগ পেলেই গান শিখতাম। ওঁর অনেক গান রেকর্ড করে খুব নাম করেছিলাম। প্রথম রেকর্ডের গান বোধহয় 'তুমি যখন গাওয়াও গান'। লাস্ট রেকর্ড ওঁর সুরে করি, রুমা যখন ১০ মাসের। এই সময় ব্রজবাসীর কাছে কীর্তনও করেছিলাম।

আর জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথ এলেই তাঁর কাছে গান শেখা ত বাঁধাই ছিলো। আর যে কথাটি গহন-সঞ্চারি প্রাণরসের মত মনকে একটা মধুর অনুভূতিতে ভরে তুলতে সেটি হলো এই যে তাঁর কাছে শিখতে আমার যতখানি আনন্দ ছিলো তাঁর দিক থেকেও ছিলো ঠিক ততখানিই আগ্রহ। 'খেলা নয়', 'আমি হৃদয়ের কথা বালতে ব্যাকুল' এমনই সব গানভরা কত সকাল-বিকাল সেতারের তরফের তারগুলির মত মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গানের অনুভূতিগুলি সুরে বেঁধে দিতো।

ওঃ, শোন, শোনো আর একটা ভারি মজার ঘটনা। জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ীরই একটি পার্টিতে সায়গলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো। প্রথম আলাপেই

বলেছিলেন, 'দিদি আপনার মত অত ভালো গাইতে না পারলেও আমিও রবীন্দ্রনাথের গান গাই।' ওঁর গান আমার এত ভালো লাগে কি বলব! তারপর আমারই অনুরোধে গেয়ে শোনালেন 'কবে তুমি আসবে বলে'—। যেমন কণ্ঠ তেমনই প্রাণকাড়া গাইবার স্টাইল। স্টাইল ইজ দি ম্যান। সায়গলের গান শুনে এই কথাটা বারবার মনে হতো। যেমন অনাড়ম্বর, সাধাসিধে মানুষটি, তেমনই ন্যাচারল অ্যাকটিং। গানেও ছিলো সেই নির্মল মনের হৃদয় ছোঁওয়া আবেশ। বসন্তের অজস্র রঙিন ফুলের মত, হৃদয়ের ভেতর থেকে আবেগ শতধারে উৎসারিত হয়ে যেন ওঁর গানকে রাঙিয়ে তুলত। সায়গলের পর আমার কিশোরের গলা ভালো লাগে। যেমন সুর তেমনই প্রাণবন্ত। ওর গলায় সত্যিকারের গায়কী কাছে। সেদিন বলছিলো, রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা এল-পি ডিস্‌ক্‌ করবে। সত্যিই যদি করে বেশ হয়।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে কোন একটা ছবিতে যেন কানন দেবীর একটা গানের প্লে ব্যাক করেছিলাম। গানটি হলো 'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে।' ওঁর ফেরিনজাইটিস হয়েছিলো বলে তখন গাওয়া অসুবিধে। রাইবাবু আমায় আমন্ত্রণ জানালেন, আপনি গাইলে আমি ভরসা পাই। তখন কানন দেবীর ও তাঁর গানের অত নামডাক, গ্ল্যামার, ওঁর প্লে ব্যাক করব শুনে নেচে উঠলাম। গ্রামোফোন কোম্পানিতে গিয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করলাম প্লিজ, একটা গান অন্য কোম্পানিতে (কানন দেবী তখন মেগাফোনের আর্টিস্ট) করতে অনুমতি দিন, এ চান্স মিস্‌ করলে আমার একটা আফশোষ থেকে যাবে। ওঁরা অনুমতি দিয়েছিলেন।

রেকর্ড গানের আসর ছাড়া কতকগুলি অনুষ্ঠান স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রত্যেক বছর কংগ্রেসের কনফারেন্সে আমি উদ্বোধন সঙ্গীত গাইতাম। গয়া কংগ্রেসে মেসোমশাই (সি. আর দাস) প্রেসিডেন্ট ছিলেন, সেখানে গেয়েছি। গেয়েছি আরও কত জায়গায়।

একবার কি মজা হয়েছিলো জানো? সুভাষদা মাসীমাকে 'মা' বলতেন। উনি বললেন—'সতী, এবছর আমার সেসানে ওপনিং সং গাইবে তুমি। আমি রাজী হয়ে গেলাম। ১৯৩৯ সাল সেটা। ওদিক থেকে সরোজনী নাইডু বললেন—সতী বি রেডী। এবার কংগ্রেসের কনফারেন্সে আবুল কালাম আজাদ আসছেন। তুমি গাইছ ওপনিং সং।'

কিন্তু আমার তখন সুভাষদাকে কথা দেওয়া হয়ে গেছে। সেবার কংগ্রেস ফাংশনে গাওয়া আর হলো না।

আর একবার এলাহাবাদ মিউজিক কনফারেন্সে জ্যাঠামশায়ের (অতুলপ্রসাদ) সঙ্গে গিয়েছিলাম। সেখানে ভাতখণ্ডের কণ্ঠে বন্দেমাতরম শুনে একেবারে স্পেলবাউণ্ড হয়ে গিয়েছিলাম।

উদয়শঙ্করের সংস্পর্শে আসাটা জীবনের আর এক স্মরণীয় অধ্যায়। নিউ এম্পায়ারে একবার উদয়শঙ্করের শো হচ্ছে। আমার স্বামী একটা বক্স রিজার্ভ করে আমাকে, মাকে আর ছোটো পিসীকে নিয়ে গেলেন। লাইটিং, মিউজিক,

উদয়শঙ্করের দেবমূর্তির গতি লাস্য সব মিলিয়ে নিউ এম্পায়ার স্টেজটাকে মনে হচ্ছিলো যেন ইন্দ্রলোক।

এই শোয়ের কিছুদিন বাদে উদয়শঙ্করের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটাও একটা রীতিমত চমকপ্রদ ব্যাপার। তখন রয়েড স্ট্রিটে থাকতেন সুরমাদি (মধু বসুর বোন)। রোজ বিকেলে ওখানে যেতাম। সুরমাদির সঙ্গে আমার খুব ভাব। হাসি গল্পে গানে প্রতিটি সন্ধ্যা জমজমাট হয়ে উঠতো। একদিন সুরমাদি ফোন করে বললেন, বুড়ি আজ একটা কাজে ব্যস্ত আছি। গল্পস্বল্প হবে না। তুই আসবি না আজ। আমার কেমন সন্দেহ হলো। কি এমন কাজে সুরমাদি ব্যস্ত যে আমায় যেতে বারণ করছে? আমি শুনলাম না। যথাসময়ে গিয়ে হাজির হলাম। গিয়ে দেখি সুরমাদি খুব সুন্দর করে সেজেছে। বাড়ি-ঘরের সাজও মনোরম। দেখে মনে হলো বাড়ীতে কোন উৎসব। আমি বললাম, সুরমাদি তোমায় কি সুন্দর দেখাচ্ছে কি বলব! তা আমায় আসতে বারণ করেছিলে কেন? সুরমাদি ত চটে অস্থির, তোকে না আসতে বারণ করলাম। আমি সুরমাদিকে জড়িয়ে ধরে বললাম, তোমাকে না দেখে থাকতে পারলাম না। তাই চলে এলাম।—কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়লেন উদয়শঙ্কর, সিমকী, অমলা নন্দী (তখনও শঙ্কর হননি)—হরেনদা আরও কে কে মনে নেই।

সুরমাদির গান শোনবার জন্য তাঁদের আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে। এতক্ষণে বুঝলাম কেন সুরমাদি আমায় আসতে বারণ করেছিলো।

যাই হোক, সুরমাদির গান হলো। তারপর প্রতিভাদি (লেডী প্রতিভা মিত্র) বললেন, এবার সতীর গান হোক। উনি আমায় খুব ভালবাসতেন। আমি গাইলাম। একটা গান গাওয়ার পর আর ছাড়ান নেই। একেবারে ধারাসারে রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ, ভজন, কীর্তন—কিছু বাদ গেলো না।

গানের পর উদয়শঙ্কর আমায় একেবারে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর বললেন—সতী দেবী, আপনার যখন খুশী আমার শো দেখতে আসবেন। আপনার পার্মানেন্ট নেমন্তন্ন রইলো।

কিছুদিন বাদে ডায়মণ্ডহারবারে উদয়শঙ্কর একটি মুনলাইট পার্টির আয়োজন করলেন। উনি নিজে আমায় নিমন্ত্রণ জানালেন, সতী দেবী, আপনার গান নইলে পার্টি জমবে না। আমি, আমার স্বামী সবাই সদলবলে গেলাম। উদয়শঙ্করের অনুরোধেই গাইলাম, 'চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে' আর 'জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে'—অনুজ কবি সুরকার অতুলপ্রসাদ ও গুরুদেবের জ্যোৎস্না রাতের গানের বিভিন্ন সেন্টিমেন্ট, একজনের জোয়ার বওয়া উচ্ছ্বাস, অপরের নিবিড় বিষণ্ণতা উদয়শঙ্কর যে কিভাবে অ্যাপ্রিশিয়েট করেছিলেন বলতে পারব না। শিল্পীচিত্ত বলেই গানের গভীর আবেদন ওঁর মনকে এমন করে স্পর্শ করেছিলো।...

আমিই প্রথম সুরবিতান স্কুল খুললাম ইন্দ্র রায় রোডে, রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাবার উদ্দেশ্যে। এর আগে এ ধরনের স্কুল ছিলো না। আরম্ভ হতে না

হতেই খুব সাড়া পাওয়া গেলো। মীনা কাপুরও এখানে শিখতে আসতেন। একই সঙ্গে শঙ্কর কীর্তনালয়, প্রেসিডেন্সী স্কুল, কমলা গার্লস স্কুলে শেখাতাম। কি প্রচণ্ড পরিশ্রম। রিকশা থেকে যখন নামতাম, রাত ১০টা হয়ে যেতো।

হঠাৎ একদিন লাহোর থেকে…দিল্লির ট্রাঙ্ক কল পেলাম। ওখানে আমার রেডিও প্রোগ্রাম। যেতে হবে। লাহোর রেডিও স্টেশন থেকে প্রচারিত আমার রবীন্দ্রসঙ্গীত 'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে' শুনে দিল্লি থেকে ফোন করলেন উদয়শঙ্কর (উনি তখন দিল্লিতে ছিলেন)—সতী দেবী আপনি ইমিডিয়েটলি আলমোড়ায় চলে আসুন। আমার বিয়ে। আপনার গান না হলে চলবে না, আমি আসবার টাকা পাঠাচ্ছি।

টাকা পাঠাতে হবে না। আমি নিশ্চয় যাব। সেই যে গেলাম আর ছাড়া পেলাম না। উদয়শঙ্কর বললেন, আপনাকে আমি ছাড়ব না।—এখানে গান শেখানোর ভার নিতে হবে। গান শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের হোস্টেলের চার্জও আমায় দিলেন। রুমাও ওখানে নাচগান শেখা শুরু করলো। শো-অরগানাইজ করতে শেখে ও ওখানেই। উদয়শঙ্করের শো দেখে।

যে বছর উদয়শঙ্করের ছেলে আনন্দ হলো, রুমা আনন্দম নাম দিয়ে একটা নাচ তৈরী করে দেখালো। উনি খুব খুশী হয়েছিলেন।

বোম্বে ট্যুরের সময় একবার স্নেকচার্মারের আইটেম বাদ দিয়ে রুমারই একটা কম্পোজিশন 'স্টপ অ্যাণ্ড গো' দেখিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি জার্নালে রুমার নাচের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরিয়েছিলো। ঐ ট্রুপের একটা গানও রুমা লিড্ করতো।

আলমোড়ার নীচে আনন্দময়ী মা থাকতেন। ওঁর গলা ভারী সুন্দর ছিলো। ওঁর সঙ্গে যেসব শিষ্যরা থাকতেন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন কারণ উনি কারো সামনে গান গাইতেন না। কিন্তু আমার সামনে গাইতেন বলে আনন্দময়ী মাকে প্রায়ই ভজন শোনাতে হতো 'পারে দরশন', 'ঠুমক চলত' —আরো কত গান।

বোম্বেতেই নাছোড়বান্দা পৃথ্বীরাজ কাপুরের অনুরোধে পৃথ্বীরাজ থিয়েটারে যোগ দিতে হলো শকুন্তলার প্লে-ব্যাকের জন্য। তারপর ঐ রোলে অভিনয় করতেও হয়েছে। প্রত্যেকটা নাটক সাকসেস। ওখানেই হিন্দী, উর্দু, পুস্তু, পাঞ্জাবী—প্রত্যেকটি ভাষার নাটকে অভিনয় করেছি। বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এই দিনগুলির মূল্য অনেক। আর একটি দৃশ্য আজও ভুলতে পারি না। প্রত্যেকটি শো-এর পর পৃথ্বীরাজ কাপুর নিজে চাঁদার বাক্স হাতে নিয়ে প্রত্যেকটি দর্শকের কাছে গিয়ে আই-এন-এ ফ্যাণ্ডের জন্য টাকা তুলতেন।

এত ঘটনাবহুল জীবন সতী দেবীর। কিন্তু তাঁর জীবনরাগিণীতে বাদী সুরের মত ঘুরেফিরে কেবলই রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গান এসে পড়ছিলো। কবে কোন শিশুকালে মাসীমা অমলা দেবীর কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে শিক্ষা শুরু

হয়েছিলো। তারপর কত সুর, কতরকম গানের ঢেউ শিল্পীর চিত্ততটে আছড়ে পড়েছে। প্রতিটি ঢেউয়ের ডাকে মন সাড়া দিয়েছে কিন্তু চেতনার প্রান্তে রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুক্ষণ অনুরণিত হয়েছে বলেই হয়ত আশ্চর্য একটা সংযম, সংহৃতি ও স্নেহে শিল্পী আজও এমন মধুর হয়ে আছেন।

বোম্বেতে কর্মব্যস্ত জীবনের ফাঁকে ফাঁকে জোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতনের দিনগুলির স্মৃতি সকল ক্লান্তি যেন জুড়িয়ে দিতো। রেকর্ড করবার আগে জোড়াসাঁকোতে গুরুদেবের কাছে গান তোলা আর লাভলক প্লেসে দীনুদার কাছে শেখা সে এক উদ্দীপনার যুগ গেছে।

একদিন গুরুদেব ছবি আঁকছিলেন। আমি গিয়ে পড়লাম। একটি ছবি উনি রিজেক্ট করে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়েছিলেন। সেই ছবিটা আমার এত পছন্দ হয়ে গেলো! এটা ত আপনি ফেলে দিয়েছেন? আমি নিচ্ছি। উনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, না না, ওটা বাজে ছবি। আমি তোকে ভালো ছবি দিচ্ছি। এই নে।

কিন্তু ওঁর পছন্দর ছবি আমার মনে লাগলো না। আমি জেদ ধরলাম ঐ ফেলে দেওয়া ছবিখানিই আমার চাই। আপনার দেওয়া ছবির মানে বোঝবার সাধ্য আমার নেই। এ ছবিটায় গাছ, ফুল-পাতা আছে। আমার কাছে এর মানে অনেক বেশী স্পষ্ট।

অনেক ঝগড়াঝাঁটি করে কবির কাছ থেকে ওঁর অপছন্দের ছবিখানিই আদায় করে নিলাম। কিন্তু উনি সই নিতে নারাজ। এই বিচ্ছিরি ছবিতে আমি সই করতে পারব না।

তাহলে আপনার ছবি ফিরিয়ে নিন। সই না দিলে ছবির কি দাম? আর দেওয়ারই বা কি মানে হয়?

অগত্যা ওঁকে স্বাক্ষর দিতে হলো। চল দেখাই সেই ছবিখানি। ওঁর শোবার ঘরে চোখের সামনে দুটি ছবি টাঙানো। একটি রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষরিত, অপরটি যামিনী রায়ের। মানুষ দুটির কেউ নেই। তাঁদের ছবি দুটির মধ্যেই মুখর অতীতের উত্তপ্ত উচ্ছ্বাসকে আজও অনুভব করতে পারেন বলেই বুঝি এমন মধুরতায় শিল্পীর মন ভরে আছে।

শান্তিনিকেতনের দিনগুলির কথাও উনি আবেগভরে স্মরণ করলেন। সৌম্যদা আমাকে ও ছোটপিসীকে রোজ কবির কাছে নিয়ে যেতেন। উনি গান রচনা করার সঙ্গে সঙ্গেই দীনুদা স্বরলিপি করে নিতেন। একটা গান সকালে হয়ত ভৈরবীতে সুর দিলেন। আবার বিকেলে গাইবার সময় গাইলেন খাম্বাজে। দীনুদা সকালের সুর শোনাতেন। বলতেন, দীনু তুই ভুল সুর করছিস। অমনি লাগতো। দীনুদা সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপি দেখিয়ে দিতেন। আর কবি ছেলেমানুষের মত অপ্রস্তুত মুখ করে বসে থাকতেন।

ওঁর সঙ্গে কত খুনসুটি করেছি। একবার 'আনমনা আনমনা' গানটিতে সামান্য একটু অলঙ্কার বেশী দিয়েছিলাম বলে উনি রেকর্ড নাকচ করে দিলেন। অমনই আমি শুরু করলাম তর্ক—আপনি অমুক অমুককে ত বেশ

ঢালাও অনুমতি দিতে পারেন—নিজের মত করে গাইতে? আর সামান্য একটু বেশী মীড় দেবার জন্য আমার গান বাতিল? এরকম পার্শিয়ালিটি করা অন্যায়। উনি বলতেন, তোমরা কাছের মানুষ হয়েও যদি আমার কথা না বোঝো তাহলে ভরসা করব কার ওপর?

একথার পর আর কিছু বলতে পারলাম না। এ ক্ষেত্রে ওঁরই জয় হলো।

আপনি উচ্চাঙ্গসঙ্গীত থেকে শুরু করে বাংলা রাগসঙ্গীতের সব ক'টি ধারাতেই রীতিমত সুশিক্ষিতা। সবরকম গানকে ভালও বাসেন। তবু সব ছাপিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত বড় হয়ে উঠলো কেমন করে?

এ গানের ভার্সেটিলিটির জন্য। এমন কোনো জাতের গান নেই যা রবীন্দ্রসঙ্গীতে নেই। এক হিসেবে রবীন্দ্রসঙ্গীতলোককে ভারতীয় সঙ্গীতের সূচীপত্রও বলা যায়। আর প্রতিটি গানের কথার সঙ্গে সুরের স্টাইলের কি নিবিড় সখ্য, এ জিনিস আর কোথাও মেলে না।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্টাইল বা গায়কীর সম্বন্ধে আপনার কি মত? এর কোনো নির্দিষ্ট রূপ আছে কি?

ও শুনলেই বোঝা যায়। কল্পনার একটা আশ্চর্য মায়া, প্রশান্তি, বিষণ্ণতা —এই সবের মিলনে কেমন একটা অন্য ভাব। জর্জের গলায় 'তুমি রবে নীরবে' শুনেছ? ঐ হলো রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী। আমার সঙ্গে যতবার দেখা হয় আমি জর্জকে ঐ গানটা শোনাতে বলি।

…বোম্বেতে 'তাসের দেশ' ও 'শাপমোচন' শান্তিনিকেতনের দল নিয়ে গিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মঞ্চস্থ করেছিলেন। বোম্বেতে গিয়েই উনি আমার খোঁজ করেছিলেন। আমিও সেই উৎসবে গেয়েছি ওঁরই ইচ্ছেয়। উনি প্রথমে আবৃত্তি করলেন 'যেথায় থাকে সবার অধম' তারপর আমি সেইটেই গাইলাম।

রুমা বোম্বেতে পর পর তিন বছর রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব করেছিলো। সেখানে আমায় গাইতে হয়েছিলো বেশ কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত। ১৯৫৭ সালে ঐ মঞ্চেই গাওয়া আমার শেষ রবীন্দ্রসঙ্গীত হলো 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে' আর 'তোমার নাম জানি নে সুর জানি।'

সন্ধ্যা, তুমি এইমাত্র জিজ্ঞেস করেছিলে না, রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী কি? এই শেষের গানটির কথাতেই রয়েছে তোমার প্রশ্নের জবাব—'তোমার নাম জানি নে সুর জানি।'

সাহানা দেবী

ভাবকে গানের মধ্যে দিয়ে এমন গভীরভাবে উপলব্ধি করার অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো রচয়িতার গানে আমার হয়নি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম যুগের শিল্পী-প্রধানদের অন্যতমা সাহানা দেবী শুধুমাত্র খ্যাতিনামা গায়িকাই ছিলেন না। তিনি কবির অতি অন্তরঙ্গ মহলের মানুষ এবং গানের রূপায়ণের ক্ষেত্রে তাঁকে রবীন্দ্রনাথেব মানস-কন্যা বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর গানের সম্বন্ধে কবির অকুণ্ঠ সাধুবাদের দীপ্ত স্বাক্ষর আছে একটি ঐতিহাসিক চিঠিতে—

'তুমি যখন আমার গান করো শুনে মনে হয় আমার রচনা সার্থক হয়েছে—সে গানে যতখানি আমি আছি ততখানি ঋনুও আছে—এই মিলনের দ্বারা যে পূর্ণতা ঘটে সেটার জন্য রচয়িতার সাগ্রহ প্রতীক্ষা আছে।'

আর সাহানা দেবীর নিজেরই ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর প্রথম ও প্রাণের কথা হলো—

শৈশব হতে তব গীতসুধাপানে
শুনেছি গানের মর্মের কথা কানে,
শিখেছি তাহার গভীর প্রাণের ভাষা,
চিনেছি সুরের চেতনার মাঝে
কি তার নিভৃত আশা—

গানের প্রসঙ্গে সাহানা দেবীর কাছে তাঁর প্রথম প্রেরণার উৎসটির খবর জানবার আগ্রহ প্রকাশ করতেই বললেন, আমি ছেলেবেলায় মামার বাড়িতে মানুষ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আমার মামা। মাসীমা অমলা দাস ছিলেন সুগায়িকা। তাঁর গানের রেকর্ডও তখন ছিলো। কণ্ঠে সুর আমার সহজাত। তার জন্য কোনো প্রয়াসও করতে হয়নি। মাসীমার গান শুনে শৈশবে গানের প্রেরণা বোধহয় স্বাভাবিকভাবেই আমার মধ্যে জেগে থাকবে।

কৈশোরে আমার গানের শিক্ষক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বনামধন্য গায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা। রবীন্দ্রনাথই তাঁর কাছে গান শেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সুরেনবাবুর কাছে শিখেছিলাম হিন্দী রাগসঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথের গান।

রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন আমাদের বাড়িতে। শৈশবে সেখানেই তাঁকে প্রথম দেখি। প্রথম দর্শনেই আমার শিশুমন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো। সুন্দর চেহারা, কালো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে টেপা চশমা, চশমার প্রান্তসংলগ্ন

কালো ফিতে সাদা পাঞ্জাবীর ওপর ঝোলানো, মাথার চুল চোখ মুখ নাক সব মিলে একটা অপরূপ সুষমা। মাসীমাই একদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। সেদিন সেই বালিকা বয়সে মাসীমার শেখানো একটি গান রবীন্দ্রনাথকে আমি শুনিয়েছিলাম। গানটি কার রচনা আমি জানি না। গোড়ার লাইন দুটি ছিলো—

'ঘুরেফিরে এমনি করে ছড়িয়ে দেবে ফাগের রাশি
লালে লাল হবেরে ভাই, রাঙা হবে মোহন বাঁশি।'

সেদিন থেকে রবীন্দ্রনাথ যখনই মামার বাড়ীতে আসতেন, আমার খোঁজ করতেন। এই ঘনিষ্ঠতার ফলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আমারও যাতায়াত শুরু হলো। আমার ১৫ বছর বয়সে ঠাকুরবাড়ীতে মাঘোৎসবের দিন (১১ই মাঘ) রবীন্দ্রনাথের 'কেন প্রেম দিলে না প্রাণে' ও 'লুকিয়ে আস আঁধার রাতে' গান দুটি গেয়েছিলাম।

একবার মনে আছে খুব বড় গায়ক রাধিকা গোস্বামীকে দেখেছিলাম জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে, রবীন্দ্রনাথের সামনে বসে গান গাইতে। সে অবশ্য বহুদিনের কথা। আমার বয়স তখন অল্পই। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বোধহয় সবে যাওয়া আসা শুরু করেছি। রাধিকাবাবুকে দেখে মনে হলো তাঁর বয়স হয়েছে। তাঁর মুখে সেদিন 'রামকেলী' রাগে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'স্বপন যদি ভাঙ্গিলে' গানটি শোনবার সৌভাগ্য লাভ করি। দেখলাম কবি আমার গানের বিষয় কিছু বলে আমার সম্বন্ধে ওঁর বেশ একটা ঔৎসুক্য জাগিয়ে দিলেন। এখন কানে বাজে 'স্বপন'-এর 'ন'-এর উপর ওঁর সেই দানাবাঁধা গিটকিরির কাজ। আর মনে পড়ে 'ভাঙ্গিলে'-এর 'ভা'-এর উপর মীড়ের ঠিক আগেই ঝোঁকটি ফেলার কায়দার কথা। এই গানটি কারো মুখে শুনলেই রাধিকাবাবুর কণ্ঠে শোনা গানটির সেইসব স্মৃতি ভেসে ওঠে। কি সব উদাত্ত পৌরষদৃপ্ত কণ্ঠস্বরই ছিলো তখন। এখনও হয়ত আছে ওস্তাদ মহলে, কিংবা অন্যত্রও, জানি না। কিন্তু আমরা আজকাল সাধারণত যেসব শিল্পীর গান শুনতে পাই, তাদের গলা শুনে আমাদের মন ভরে না। আমি বলছি বিশেষ ছেলেদের কথা। তাদের কারো কারো কণ্ঠেই ওজস, পৌরুষ—এসব পুরুষোচিত শক্তি-সম্পদের যে আবেদন তার কোনো পরিচয়ই পাই না। তাদের কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয় শক্তিহীন, দুর্বল, শুধু মিষ্টত্বেরই পূজারী। অথচ গাইয়ে তারা সত্যই ভালো। সে বিষয়ে বলার কিছুই নেই। এখনকার এইসব চাপা চাপা অস্বাভাবিক কণ্ঠ শুনে আমাদের—যারা আজীবন স্বাভাবিক খোলা গলায় গান গেয়ে এসেছি, প্রাণ এক এক সময় হাঁপিয়ে ওঠে। মাইক আমাদের একদিক দিয়ে যেমন উপকার করেছে, তেমন একদিক দিয়ে কত যে ক্ষতি করেছে তাই ভাবি। মাইকের যুগে স্বাভাবিক গলায় কেউ আর বড় গায় না, তার মূল্যও কেউ ধরে বলে মনে হয় না। মাইকে আবার সকলের গলা সমান আসে না। কারও কারও খুবই ভালো আসে অন্যদের তুলনায়। এইজন্য প্রায়ই বলতে দেখা যায় অমুকের খুব ভালো মাইকের গলা কিম্বা অমুকের গলা ভালো

নয়। কারোরই আসল গলা শোনা আমাদের ভাগ্যে হয় না।

আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছেই শিখেছেন—না অন্য গুরুর কাছে?

সুরেনবাবুর কথা ত আগেই বলেছি। দীনুদার (দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) কাছ থেকেও অনেক গান শিখেছি। স্বয়ং কবিও শিখিয়েছেন অনেক গান। দু-একটি ঘটনার কথা বলি—

১৯১৭ থেকে ১৯২২—এই পাঁচ বছর আমি কাশীতে ছিলাম। সেই সময় একবার রবীন্দ্রনাথ কাশীতে এসেছিলেন। সে সময় তাঁর কাছ থেকে শিখেছিলাম 'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে', 'গানের ভিতর দিয়ে যখন', 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়', 'সুর ভুলে যে ঘুরে বেড়াই', 'কেনরে এই দুয়ারটুকু', 'আকাশ জুড়ে শুনিনু', 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান', 'কবে তুমি আসবে বলে,' 'যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়' এই গানগুলি। কেবল শেখাই নয়—গানগুলি তাঁকে শুনিয়ে উত্তীর্ণ হতেও হয়েছিলো। আরো অনেক ক্ষেত্রে অনেক গান শেখবার সৌভাগ্য হয়েছিলো কবির কাছ থেকে।

দীনুদাও শিখিয়েছেন অনেক গান। একটি মজার ঘটনা ঘটেছিলো একবার। জোড়াসাঁকো থেকে টেলিফোনে দীনুদার ডাক পড়লো গান শেখবার জন্য। আমি রয়েছি ভবানীপুরে মামার বাড়ীতে। কিন্তু জোড়াসাঁকো যাবার কোনো যানবাহন মিললো না সেদিন। কাজেই টেলিফোনেই গান শেখা আরম্ভ হলো। এখনকার ছেলেমেয়েরা হয়ত বিশ্বাস করবে না, সেদিন দীনুদার কাছ থেকে আমি টেলিফোনে চোদ্দটি গান শিখেছিলাম।

একটু থেমে আত্মগতভাবেই যেন বলে চললেন,—সে সব উদ্দীপনার অনুভূতি আজকের দিনের মানুষদের কাছে অবাস্তব বলেই মনে হবে। আজ রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা কত বেড়ে গেছে। ঘরে ঘরে এখন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া হয়ে থাকে। সর্বত্রই তার চাহিদা, তার আদর। আমাদের দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এতটা প্রচলন ছিলো না। সুধীসমাজে বিশেষ কোনো গোষ্ঠীতে কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলো তার সমাদর। তখনও জনসমাজ তাকে এইভাবে নিতে পারেনি। বোধকরি রবীন্দ্রনাথ নিজেও ঠিক এমনটি দেখে যেতে পারেননি। আজ দেশব্যাপী তাঁর সঙ্গীতের প্রচলন দেখে একদিকে যেমন আনন্দ বোধ করে অন্যদিকে আবার নিবিড় বেদনা বোধ করি, যখন দেখি রবীন্দ্রনাথ আমাদের যে গান দিয়ে গিয়েছিলেন, সে গান আর নেই, যা শুনি তাতে খুশী হতে পারি না। এ সত্য গোপন করব না। সবচেয়ে দুঃখ পাই স্বরলিপির নিগড়ে বাঁধা তার এই বন্দীদশা দেখে। চারিদিকে আটঘাট বেঁধে তাকে এমন করে রাখা হয়েছে যে গায়ক তার নিজের অনুভূতিকে ফোটাবার কোনো স্বাধীনতা পায় না। গানে গায়কের এ স্বাধীনতা অস্বীকার করা যায় না। নিজেকে না দিতে পারলে, নিজেকে না ফোটাতে পারলে গানও ফোটে না। গান ত শুধু স্বরলিপির মুখস্থ বুলি বা তার অনুকরণ মাত্র নয়। গানে গায়কের নিজেরও কিছু দেবার আছে।

আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া হিন্দী গানও গাইতেন ত ?

গাইতাম বৈ কি ? আমার হিন্দী গানের রেকর্ডও সেকালে বার করেছিলো, গ্রামোফোন কোম্পানী। রবীন্দ্রনাথও সময়ে সময়ে আমার কাছ থেকে হিন্দী গান শুনতে চাইতেন। একদিন তাঁকে 'মহারাজা কেওয়াড়িয়া খোলো' আর 'প্রেম ডগরিয়া মেনন করো' গান দুটি শুনিয়েছিলাম। শুনে খুব খুশী হয়ে কবি তখনই ঐ দুটি হিন্দী গানের সুরে দুটি বাংলা গান লিখে ফেললেন। 'মহারাজ কেওয়াড়িয়া'র সুরে লিখলেন 'খেলার সাথী' গানটি; আর 'প্রেম ডগরিয়া' রূপান্তরিত হলো 'যাওয়া আসারই একি খেলা'য়। ১৯২৩ সালে বসন্ত উৎসবে কবি এ গান দুটি আমায় দিয়ে গাইয়েছিলেন।

বসন্ত-বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসবের মতোই অনেকটা সঙ্গীতবহুল ঋতু বর্ণনা। কাব্যাংশ কবি আবৃত্তি করতেন আর সঙ্গীতাংশে একক ও কোরাসে বিভিন্ন শিল্পীদের দিয়ে গানগুলি গাওয়ানো হতো। কবির 'বিসর্জন' নাটকে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া আমার জীবনে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। 'বিসর্জন' সেবারে তিনদিন অভিনীত হয়েছিল এম্পায়ার থিয়েটারে ১৯২৩-এর ২৫, ২৭ ও ২৮ আগস্টে। জয়সিংহের ভূমিকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আর রঘুপতির ভূমিকায় দীনেন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মূল 'বিসর্জন' নাটকে ছিলো মাত্র পাঁচটি গান। কিন্তু আমাকে দিয়ে গাওয়াবার জন্য তিনি আরো পাঁচটি গান যোগ করেছিলেন সেবারের 'বিসর্জন' নাটকে। গানগুলি এই : 'তিমির দুয়ার খোলো', 'আমি একলা চলেছি ও ভবে', 'আঁধার রাতে একলা পাগল', 'আমার যাবার বেলা পিছু ডাকে' আর 'দিন ফুরালো হে সংসারী।' অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলি আমার মাসীমা অমলা দাস একটি নহবত পার্টিতে সানাই-এ ভীমপলশ্রী রাগের বাজনা শুনে এসে সেই সুরবৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথকে শোনান। কবি সেই সুরের ওপর কথা বসিয়ে গানটি রচনা করেন। আমি মাসীমার কাছ থেকেই গানটি শিখি।

কবির সম্পর্কে কিছু স্মরণীয় ঘটনা, তা সুখেরই হোক বা দুঃখেরই হোক —বলুন না ?

আমার পরম সৌভাগ্য—ঐকান্তিক স্নেহের অপরিসীম দাক্ষিণ্যে কবি আমাকে ধন্য করেছেন। সুখের দিনের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন ; দুঃখের দিনের কথাই বলি। ১৯২৬ সালে আমি ক্ষয়রোগে অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখনকার দিনে এ ব্যাধি যেমন ভয়াবহ তেমনই মারাত্মক। একান্ত আপনার জনেরাও এই সংক্রামক ব্যাধির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতেন। এই দারুণ সংকটের দিনে আমায় আশ্রয় দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনে তাঁর বাসগৃহ কোনার্কের পাশের বাড়িতে আমায় স্থান দিয়েছিলেন। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়ে নিজে চিকিৎসা করতেন। প্রত্যহ কপালে হাত দিয়ে দেহের তাপ নির্ণয় করনেন। আমাকে প্রফুল্ল রাখবার জন্য কত কথাই না বলতেন। জীবনে হতাশ না হবার জন্য তিনি ভগবৎকৃপার কথা শোনাতেন। বলতেন—আমরা যখন হাল ছেড়ে দিই তিনিই তখন হাল তুলে নেন। সে দুঃখের দিনে আমি

দেবতার আবির্ভাব দেখেছি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক অমূল্য সম্পদের মধ্যে একটি হলো তাঁর ভগবানের বিষয় রচিত গানগুলি। গভীরতার অতলস্পর্শী এই গানগুলির মধ্যে আমার দুঃখের দিনে সেই দেবতাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথকে যেন বারবার নতুন করে খুঁজে পাই। যখনই শুনি যতবারই গাওয়া যায় ততবারই প্রতিটি গানই নূতন করে প্রেরণা দেয়। গাইতে গাইতে এমন হয় যে গান তখন আর গান মনে হয় না, হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ অনুভূতি। আজও যখন গাই—

'যেদিন গেছে তোমা বিনা
তারে আর ফিরে চাহি না
যাক সে ধূলাতে,
এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে
যেন জাগি অহরহ।'

দেখি গাইতে গাইতে তলিয়ে গেছি। প্রাণের ভেতর থেকে শুধু ঐ প্রার্থনাই ধ্বনিত হচ্ছে। এমন একটা আকুলতা জেগে ওটে যে তন্ময় হয়ে ঘুরেফিরে কেবলই গাইতে থাকি—

'কত কলুষ কত ফাঁকি
এখনও যে আছে বাকি
মনের গোপনে
আমায় তার লাগি আর ফিরায়ো না
তারে আগুন দিয়ে দহ।'

ভগবানের উপর বিশ্বাসের পাল তুলে দিয়ে জীবনতরীতে বসে কবি গানের পর গান গেয়ে গেছেন—আর সেই গানের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন তারই আলো, তারই আনন্দ।

এখনকার রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীদের সম্বন্ধে সাহানা দেবীর মতামত জানতে চাইলে বলেন, আমি এখনকার নামকরা রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীদের গান প্রত্যক্ষ-ভাবে বড় একটা শুনিনি। যা কিছু শুনেছি রেডিওতে বা গ্রামোফোন রেকর্ডে। সামনাসামনি না শুনে কারো সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা ঠিক হবে কি? তবে রেডিওতে বা গ্রামোফোন রেকর্ডে শুনে মনে হয়েছে প্রায় সকলেরই সুরেলা কণ্ঠ, গাইবার দক্ষতাও অনেকের আছে। হয়ত শ্রুতিমধুর হয়, কিন্তু আদৌ প্রাণস্পর্শী হয় না। সুরের সৌকর্য আছে কিন্তু ভাবের বিকাশ না ঘটলে রবীন্দ্রসঙ্গীত রসোত্তীর্ণ হয় না—এই আমার বিশ্বাস। ভাবের অভাব ঘটলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিগ্রহই রূপ পরিগ্রহ করে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না তাতে। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে আমার অভিমত ব্যক্ত করেছি।

যদি অপরাধ না নেন একটি প্রশ্ন করব—আপনাদের যুগে বিশেষ এক সংস্কৃতিমান সমাজেই রবীন্দ্রসঙ্গীত সীমাবদ্ধ ছিলো। এ গান জনসাধারণের গান হয়ে উঠতে পারেনি কেন?

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর এলো—যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে একটি বিশেষ

সমাজে রবীন্দ্রসঙ্গীত সীমাবদ্ধ ছিলো সেরূপ শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাববশতঃই রবীন্দ্রসঙ্গীত সেকালের জনসাধারণের গান হয়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া আরও একটি কারণ ছিলো দেশের এক শ্রেণীর সমালোচক সেকালে জনসাধারণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের পক্ষে একটা প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন। দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ ভাবটা যেমন অন্তর্হিত হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীতও তেমনই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদ এবং দিলীপ রায়ের গানও আপনার কণ্ঠে যেন স্ব-ধর্মে প্রতিষ্ঠিত অথচ রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের ধারার সঙ্গে এঁদের স্বতন্ত্রতা অনস্বীকার্য। এঁদের কোনো বৈশিষ্ট্য আপনার মনকে স্পর্শ করে ?

ভাবের ঐশ্বর্য—কথার মাধুর্য ও সুরের সৌন্দর্য—এই তিনের মিলন ঘটেছে যেখানে সেই সব বাংলা গানই আমার ভালো লাগে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য কীর্তন বাউল ও রামপ্রসাদী গানও আমার প্রিয়। দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদ ও দিলীপকুমারের গানের ধারা রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে স্বতন্ত্র হলেও ঐ গুণগুলির জন্য তাঁদের গান আমার মনকে স্পর্শ করে।

আর রবীন্দ্রসঙ্গীত ?

রবীন্দ্রসঙ্গীত সঙ্গীত জগতের একটা নতুন দিকের দ্বার খুলে দিয়েছে। সঙ্গীত জগতে রবীন্দ্রসঙ্গীত একটা যুগ। এই সঙ্গীত অন্য পর্যায়ে পড়ে। এর জাত আলাদা, অভিব্যক্তি অন্যভাবের উপাদান, ভিন্ন গঠন গায়কী সবই তার বৈশিষ্ট্য বহন করে। রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের নিয়ে যায় এমন এক জায়গায়, এমন এক জিনিসের আস্বাদ দেয় যে মনে হয় কি এক অনুভূতির মধ্যে বাস করি যেন।—ভরে যায় সব। এসব ব্যক্ত করার নয় বোঝানও যায় না শুধু অনুভব করার, যে পারে সেই পারে। রবীন্দ্রসঙ্গীতেই বোধহয় প্রথম প্রতিভাত হয় কথা সুর ও ভাব কিভাবে এক হয়ে যায়। আর ব্যক্ত করে এই এক হয়ে ওঠাকে। তাঁর গানের বৈশিষ্ট্যই এইখানে। এই হলো রবীন্দ্রসঙ্গীত ও তার পরিচয়ের বিশেষ দিক। এই এক হয়ে ওঠার মধ্য দিয়েই ধ্বনিত হয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভিতরকার আসল সুর আর তার মাঝে ধরা পড়ে সুরের অতীত যা তাই, যার স্পর্শে মুক্তি পায় রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর সৃষ্টি। সেই জন্যেই রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বিচ্ছিন্ন করে না দেখে এক হয়ে সে কি হয়ে উঠেছে সেইটি ঠিকমতন দেখতে পারলে তাকে অন্তরে গ্রহণ করা যায় সহজেই। আমার মনে হয় আমাদের মনে যতক্ষণ প্রশ্ন যাওয়া আসা করে ততক্ষণ কোনো কিছুরই আসল মর্ম গ্রহণ বা উপলব্ধি করা যায় না।

শুধু ভক্তিভাবের গানেই আপনি সমর্পিতা না অন্য গানও গেয়েছেন ?

এককালে অন্য গানও যথেষ্ট গেয়েছি। এখন সাধারণত ভক্তিভাবের গানই বেশী গেয়ে থাকি।

এখন কি জীবন ও গান এক হয়ে গেছে ?

এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছি না। তবে এই মাত্র বলতে পারি—এখনকার জীবন অধ্যাত্ম সাধনার জীবন আর গান আমার সে সাধনার অন্যতম

সহায়। যখন সাধন সঙ্গীত গাই তখন গানের সঙ্গে একাত্ম হয়েই গেয়ে থাকি। রবীন্দ্রনাথের পূজার গানগুলি আমার এই অনুভূতির দিশারী হয়ে ওঠে। এসব গান আগে কতই গেয়েছি আজও গাই। আজ আরও গভীরভাবে তার মর্ম উপলব্ধি করি, আরও গভীরতার স্পর্শ পাই। আমাদের ভিতরের চেতনার পরিবর্তনের সঙ্গে এসবের আবেদনও আমাদের কাছে কতই না বদলে যায়। তাই এখন যখন গাই—

হৃদয় যাহার শতখানে ছিলো
শত স্বার্থের সামনে
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে
বাঁধিলে ভক্তি বাঁধনে।

বুঝতে পারি কেন চোখের জল বাধা মানে না। লুটিয়ে পড়ে হৃদয় কার চরণতলে। বুঝতে পারি কোন অবস্থায় পৌঁছলে এই কথা এমন করে বলতে পারা যায়—

তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে
তাহা মাথায় তুলিয়া লব।

মানুষের সাধারণ জীবনের যতদিক আছে আর তার যতরকম অবস্থার অভিজ্ঞতা হতে পারে সে সমস্ত সম্বন্ধেই গান আছে রবীন্দ্রনাথের। বাদ পড়েনি তার একটিও। প্রত্যেকটিকে দেখা যায় যথা সময় এবং যথাস্থানে। তাই আমাদের মন সচল অবস্থায় আশ্রয় পায় তাঁর গানে। জীবনকে গানের মধ্য দিয়ে এমন করে উপলব্ধি করার অভিজ্ঞতা আর কোনো রচয়িতার গানে আমাদের হয়নি। আমাদের যুগে আমাদের জীবনে এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা। গান সম্বন্ধে তিনি আমাদের ধারণা বদলে দিয়েছেন। তাঁর গানে বার বার শুনি সেই ডাক যে ডাকে অন্তরের অজানা ঘরের রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায়, প্রকাশ দেখি অপ্রকাশের···এমনতর আরও কত কত যে আছে। তাঁরই গানের চরণ তুলে দিয়ে বলতে ইচ্ছে হয়—

শেষ নাহি যে শেষ কথা
কে বলবে?

অনাদিকুমার দস্তিদার

> সা রে গা মা ঠিক রেখে গাইলেই তো সবসময় গান হয়না, সেটা স্বর গাওয়া হয়। কিন্তু স্বর গাওয়া ও গান গাওয়া এক জিনিস নয়। বরং দরদ নিয়ে ঢঙটি বজায় রেখে গাইলে সা রে গা মা একটু ইতরবিশেষ হলেও হয়ত কিছু যায় আসে না।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুরু শুধু নয়,—এ সঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধক। জিজ্ঞাসু ও ধ্যাননিষ্ঠ অনাদিকুমার দস্তিদারের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারের অধ্যায়ে। তিনিই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং এ-পেশার প্রেরণা ছিলো তাঁর নেশা। রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া একমুহূর্তও নিজের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারতেন না বলেই জীবিকার ক্ষেত্রেও ঐ একটি আশ্রয়ের কথাই তাঁর মনে হয়েছিলো, এর সাফল্য অনিশ্চিত জেনেও। রবীন্দ্রনাথ ও দীনেন্দ্রনাথের পরে তিনিই শান্তিনিকেতনের বাইরে প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব ছিলো তাঁরই ওপর।

১৯১২ অব্দে অনাদিকুমার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন 'বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে'র শিক্ষার্থী হয়ে। ছোটোভাই অবনীকুমার দস্তিদারও সঙ্গে ছিলেন। এনট্রান্স পাস করবার পর (১৯২০ সালে) ১৯২৫ সাল অবধি পুরোপুরি পাঁচ বছর গান শিখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও দীনেন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথই তাঁর রাগসঙ্গীতশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী, নকুলেশ্বর গোস্বামী এবং কলকাতার রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে। পিঠাপুরমের মহারাজার সভাশিল্পী পণ্ডিত সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রীকে তিনিই আনিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর কাছে বীণা শিখেছিলেন যে দুজন শিষ্য-শিষ্যা তাঁদের মধ্যে একজন হলেন অনাদিকুমার দস্তিদার অপরজন ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবকৃষ্ণ চৌধুরীর স্ত্রী মালতী চৌধুরী।

১৯২৫ সালে কলকাতা এসেছিলেন অনাদিকুমার।

শান্তিনিকেতনে থাকার সময় সেখানের নানা নাটকে অভিনয় করেছেন। 'রাজা', 'শারদোৎসব', 'বাল্মিকীপ্রতিভা' (প্রথম দস্যু দীনেন্দ্রনাথ—বাল্মিকী)। এছাড়া কলকাতায় 'নটীর পূজা'-য় তিনি বৌদ্ধভিক্ষুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। উইনটারজিনকে দেখানোর জন্য বিশেষভাবে অভিনীত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে তিনি স্ত্রীচরিত্রেও অবতীর্ণ হয়েছেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ এবং দীনেন্দ্রনাথ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গুরুদের মধ্যে ছিলেন ক্ষিতিমোহন

সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, নেপালচন্দ্র রায়, কালীমোহন ঘোষ, জগদানন্দ রায়। সি. এফ. এনড্রুজ, ও পিয়ারসন সাহেব। ইনি শুধু তাঁদের অনুগত শিষ্যই ছিলেন না। ছিলেন বিশেষ স্নেহের পাত্র।

এ সম্বন্ধে তাঁর ডায়েরিতে স্ব-লিখিত বিবরণে আছে, আমি ১৯১২ সালে শান্তিনিকেতনে ছাত্র হিসাবে যাই এবং ১৯২০ সালে সেখান হইতে ম্যাট্রিক পাস করি। তারপর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে আরও পাঁচ বৎসর সেখানে থাকিয়া গুরুদেবের ও দীনেন্দ্রনাথের নিকট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা করি। তখনকার দিনে এবং এখনও ডিগ্রীর একটা মোহ ছিল। তাই ১৯২৫ সনের জুলাই মাসে কলিকাতা আসিয়া সিটি কলেজে আই. এস. সি-ক্লাসে ভর্তি হই এবং ১৯২৭ সনে আই. এস. সি পাস করি। তখন ওই কলেজে একটা ব্যাপারে ভীষণ গোলযোগ হয় এবং কলেজ বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। তখন বাধ্য হইয়া ট্রান্সফার লইয়া বিদ্যাসাগর কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হই। ১৯২৯ সনে বি. এ. পাস করি।

কলিকাতা আসার সময় হইতে আমি বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষাদান করিতে থাকি এবং 'সঙ্গীত সম্মিলনী' নামক তৎকালীন বিখ্যাত সঙ্গীত বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতশিক্ষক নিযুক্ত হই। সেখানে সহকর্মী-রূপে পাই শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমিহিরকিরণ ভট্টাচার্য, শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল ও ভারতবিখ্যাত স্বনামধন্য ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ প্রভৃতিকে।

কলকাতায় আসার পর তাঁকে ক্রমে ক্রমে রেডিও রেকর্ড ও সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হতে হলো অন্তরঙ্গ বন্ধুদের আব্দারে। গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে ত তিনি গোড়া থেকেই যুক্ত ছিলেন। নজরুল শুধু তাঁর অনুরাগী বন্ধুই ছিলেন না, ছিলেন প্রিয় শিষ্যও। তাঁর কাছ থেকে কাজী সাহেব অনেক নূতন গান শিখেছেন। জসীমউদ্দিন, আব্বাসউদ্দিন, ধীরেন দাস—সবাই তাঁর সঙ্গে মিলে একটা বিদগ্ধ সঙ্গীত পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন। এখনকার জনপ্রিয় ব্লক প্রোগ্রামের উদ্গাতাও ছিলেন অনাদিকুমার। রাইচাঁদ বড়াল তাঁকে নিউ থিয়েটার্সে নিয়ে যান—সেই সময়ই কানন দেবী, কে এল. সায়গল প্রমুখ প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীরা তাঁর কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। মুক্তি ছবির পর প্রায় সকল চিত্রেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের ট্রেনারের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় তাঁরই ওপর। এ ছাড়া বোম্বে টকীজের সঙ্গে যুক্ত হয়েও তিনি বেশ কিছুদিন কাজ করেছিলেন। তিনি 'নৌকাডুবি' চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনাও করেছেন।

তারপর মঞ্চজগতে তাঁকে নিয়ে এলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। শিশিরবাবুর অনুরোধেই তাঁর অভিনীত 'চিরকুমার সভা' ও 'শেষরক্ষা'র সঙ্গীত পরিচালনায় দায়িত্ব অনাদিবাবুকে নিতে হয়েছিল। পরে স্টার থিয়েটারের সঙ্গেও কাজ করেছেন এবং সেই সময় 'তাপসী' নাটকের সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন।

সিনেমা-থিয়েটার, রেকর্ড-রেডিও ছাড়া উদয়শঙ্করের দলেও তিনি ছিলেন। তাঁর অর্কেস্ট্রায় অনাদিবাবু বীণা বাজাতেন। উদয়শঙ্করের সঙ্গে

ইউরোপ যাওয়াও একরকম স্থির। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই পিতৃবিয়োগ হওয়ায় এ পরিকল্পনা বাতিল করতে ত হলোই, উপরন্তু শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতশিক্ষাদানের জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ রাখাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ তাঁর ওপর এসে পড়ল বিরাট পরিবারের দায়িত্ব। গুরুদেবের ইচ্ছা পূর্ণ করা হলো না—জীবনের শেষদিন অবধি এ ক্ষোভ তাঁর যায়নি।

১৯৪৮ সালে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে জোড়াসাঁকোতে সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অনাদিকুমারকেই সে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ করবার কথা হয়েছিল।

তিনি যখন রোগশয্যায় তখনও তাঁর সারা মনপ্রাণ অধিকার করে রেখেছিল রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। তাঁর যুগের আশ্রমে গান শেখানো, ক্লাশ নেওয়া ছাড়াও অনাদিকুমার ও তাঁর অন্যান্য সতীর্থদের গুরুদেব জননীর স্নেহেই যত্ন ও পরিচর্যা করতেন। এই রোগশয্যাতেই তিনি অন্তরঙ্গ মহলে প্রায়ই বলতেন, আরে রবীন্দ্রনাথ যে একজন জগদ্বিখ্যাত লোক তা টের পেলাম বড় হয়ে, কলকাতা আসার পর। শান্তিনিকেতনে ছোটোবেলায় গুরুদেবকে মনে হয়েছে বাবা কাকার মতো।

১৯৫৫ সালে নিউ এম্পায়ারে গীতবিতানের একটি অনুষ্ঠানের সময় মঞ্চের ওপরই তিনি সেরিব্রেল থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হয়ে পুরো পাঁচমাস সংজ্ঞাহীন ছিলেন। পরে সুস্থ হলে তাঁর কাছেই শোনা গেছে বাইরের সেই অচৈতন্যভাব তাঁর অন্তরে আর একটি চেতনালোক খুলে দিয়েছিলো, তখন তাঁর মনে হতো হাসপাতালের সকলকে নিয়ে তিনি যেন শান্তিনিকেতনে চলে গেছেন। ১৯৬৬ সালে দ্বিতীয়বার সেরিব্রেল থ্রম্বসিসের কবলে পড়বার পরও তাঁর মনপ্রাণ জুড়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও দীনেন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগর স্ট্রিটের বাড়িতে শয্যাশায়ী এবং চৈতন্যহীন অবস্থাতেই স্ত্রী শেফালী দেবীকে বারবার বলতেন, তাড়তাড়ি করো। দীন্‌দা রিহার্সাল শুরু করে দিয়েছেন, গুরুদেব এসে পড়েছেন। এটা তো ঠাকুর বাড়ী। আবার ফিরতে হবে শান্তিনিকেতনে।

যতদিন তাঁর জ্ঞান ছিলো ২৫শে বৈশাখ ঠাকুরবাড়ীতে না যেতে পারার দুঃখও ছিলো প্রবল। ঐদিন সকালে নিজের হাতে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে মালা পরিয়ে দিতেন। সুস্থস্বাস্থ্যে কোথাও বেরোবার আগে রবীন্দ্রনাথের ছবিকে প্রণাম করে বেরোতেন।

রবীন্দ্রনাথের পরই তার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র ছিলেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দীন্‌দাই ছিলেন আমাদের সব। বন্ধু, শিক্ষক, গুরুজন—কি নয় ?

রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষকতা ছাড়াও তিনি বহু গানের স্বরলিপি করেছেন। ১৯৪৮ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর উদ্যোগে স্বরলিপি সমিতি গঠিত হলো,—অনাদিকুমারই ছিলেন তার সম্পাদক। ১৯৬৫ সালে অবসর গ্রহণের আগে অবধি এই পদে সগৌরবে অধিষ্ঠিতই শুধু ছিলেন না, জীবনের সবটুকু নিষ্ঠা, শক্তি, ধ্যান, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য দিয়ে একাজ

সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলেন। আজকের দিনের রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তার মূলে আছে তাঁরই অনলস পরিশ্রম ও গভীর অভিনিবেশ। এই সুদর্শন, অজাতশত্রু এবং শিষ্যবৎসল মানুষটি রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারকে কতখানি এগিয়ে দিয়েছেন সে খবর অনেকেরই জানা নেই। অচৈতন্য অবস্থায় তিনি যে ক'দিন বেঁচেছিলেন তাঁর অস্ফুট উচ্চারণের বিষয় ছিলো রবীন্দ্রনাথের গানের কলি।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গোষ্ঠীর সকলের সঙ্গে তাঁর কতখানি সহৃদয় সম্পর্ক ছিলো তারই স্বাক্ষর রয়ে গেছে এঁদের সকলের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রে। নানা-জনকে লেখা চিঠিপত্র থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। এইসব টুকরো সংলাপ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি পাওয়া যায়,—তার পাণ্ডিত্য, রবীন্দ্রানুরাগ ও রবীন্দ্র আরাধনার প্রতি এঁদের বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও অনুরাগের।

একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে লিখছেন : বিশ্বভারতী থেকে আমাদের এক একজন ছাত্রকে এক একটি বিশেষ ভার নিতে হবে—নইলে কোনো শিক্ষাই সম্পূর্ণ হবে না। যার যে বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ ও শক্তি আছে তাকে সেই বিষয় বেছে নিতে হবে। সঙ্গীতে তোমার নিষ্ঠা আছে বলেই তোমায় বিশেষজ্ঞতা লাভ করতে উৎসাহ দিচ্ছি। ভবিষ্যতে পাশ্চাত্য-সঙ্গীতেও তোমাকে প্রবেশলাভ করতে হবে—তার পরে তুমি আমাদের বিশ্বভারতীতে একদা সঙ্গীতাচার্য্য হবে এই আমার মনে আছে। স্বরলিপি যদি তোমার আয়ত্ত হয় তাহলে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ থেকে লৌকিক সঙ্গীত তুমি সংগ্রহ করে আনতে পারবে—সেই একটি মস্ত বড় কাজ আমাদের সামনে রয়েছে, এই কাজের ভার তুমি নেবে বলে সঙ্কল্প কর। কণ্ঠসঙ্গীতে তুমি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পণ্ডিতজী এবং গোঁসাইজী—উভয়ের কাজ থেকেই অভ্যাস কোরো—কেননা উভয়ের মধ্যে সঙ্গীতরীতির হয়ত কিছু পার্থক্য আছে, সে পার্থক্য তোমার জানা চাই।

সঙ্গীতশিক্ষা সমাপ্ত করে অনাদিকুমার কলকাতায় ফেরার সময় রবীন্দ্রনাথের দেওয়া অভিজ্ঞানপত্র :

"শ্রীমান অনাদিকুমার দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে ছাত্রভাবে থাকিয়া গান শিক্ষা করিয়াছেন। আমার রচিত বহুসংখ্যক বাংলা গান ইঁহার জানা আছে! এই গানগুলি যাঁহারা শিখিতে ইচ্ছা করেন ইঁহার সহায়তায় সফলতা লাভ করিতে পারিবেন। ইঁহার চরিত্রের নির্মলতা সম্বন্ধে সংশয় মাত্র নেই। ২৯শে আষাঢ় ১৩৩২।"

পুলিনবিহারী সেনের চিঠি থেকে : আপনি যখন ভবিষ্যতের চিন্তা না করে রবীন্দ্রসঙ্গীতই একমাত্র সাধনা বলে নিয়েছিলেন আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে, তখন তাতে সাহসের প্রয়োজন ছিল। আজ যে তা স্বীকৃত হচ্ছে তাতে আমরা যারা সেকাল থেকে আপনার কথা জানি তাদের বড়ই আনন্দের দিন।

অনাদিকুমারের পত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে : আমি কোন দলের মধ্যে নেই।

সব দলের মধ্যেই আমার যাওয়া আসা এবং অনেকেই আমাকে একটু স্নেহের চোখে দেখেন। এ যদি বলা হয়, তবে আমার নিজের দল নয়, শান্তিনিকেতনের দল।

দীনেন্দ্রনাথের স্মৃতিতর্পণে তিনি বলছেন: রবীন্দ্রনাথকে একদিন বলিতে শুনিয়াছি যে, 'আমার গান গাইবার জন্যই দিনুর জন্ম হয়েছিল।' রবীন্দ্রনাথ গানে সুর যোজনা করিয়া দীনুবাবুকে শিখাইয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। কারণ কবি প্রায়ই সুর ভুলিয়া যাইতেন। দীনুবাবু স্বরলিপি করিয়া এবং ছেলেমেয়েদের শিখাইয়া গানগুলি প্রচার করিতেন। স্বরলিপি করার তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়াছি। তিনি কোনোরকম যন্ত্রের সাহায্য না নিয়া অথবা গুন গুন পর্যন্ত না করিয়া, চিঠি লেখার মত স্বরলিপি লিখিয়া যাইতেন, এবং আমাদের করা স্বরলিপি ঐভাবে সংশোধন করিতেন। এই স্বরলিপিই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানকে জীবিত রাখিবে। এই স্বরলিপির দ্বারা রবীন্দ্রনাথের গানকে জীবিত রাখিবে। এই স্বরলিপির দ্বারা রবীন্দ্রনাথের গানের প্রচার বহুদূর হইয়াছে। দীনেন্দ্রনাথ নিজেও একজন সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। কিন্তু নিজেকে কখনও জাহির করিতে ভালবাসিতেন না।

স্বরলিপি অনুসরণে গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের সম্বন্ধে অনাদিবাবুর মতামত: তবে আগের তুলনায় আজকাল রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার খুবই বেড়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভায় সৃষ্ট সুর এবং ঢঙের বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হচ্ছে বলে মনে হয় না। সা রে গা মা ঠিক রেখে গাইলেই তো সব সময় গান হয় না, সেটা স্বর গাওয়া হয়। কিন্তু স্বর গাওয়া ও গান গাওয়া এক জিনিস নয়। বরং দরদ নিয়ে ঢঙটি বজায় রেখে গাইলে সা রে গা মা একটু ইতরবিশেষে হলেও হয়তো কিছু আসে যায় না। তবে যতদূর সম্ভব পরম্পরালব্ধ গায়কী স্মরণে রেখে স্বরলিপিকে অনুসরণ করা উচিত। কেবলমাত্র স্বরলিপির সাহায্যে গান শেখা যায় না। আর গাওয়াও সঙ্গত হয় না। বস্তুত প্রকৃত শিক্ষার্থীদের উচিত উপযুক্ত গুরু বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সন্ধান করে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা করা। আজকাল দেখা যায় স্বরলিপির বইয়ের ওপর নির্ভর করে অনেকেই গানের মাস্টার হয়ে ওঠেন। যাঁদের এই সব গানের সঙ্গে অন্তত কিছুটা পরিচয় নেই, তাঁদের পক্ষে স্বরলিপি থেকে গান তোলা বা গান শেখানো সম্ভব নয়। কারণ, গানের গায়কী স্বরলিপিতে গাওয়া যাবে কেমন করে? ওটা গলা থেকে শুনে গলায় তুলে নিলেই ঠিক হয়। গায়কীরও একটা শিক্ষা আছে।

অনাদিকুমার সম্পর্কে প্রভাত মুখোপাধ্যায়: রবীন্দ্রনাথের গান স্বরলিপির মধ্যে ধরে রাখবার জন্য বিশ্বভারতী থেকে যে স্বরবিতান পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল, অনাদিকুমার ছিলেন তার আদি কর্ণধার। রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারকল্পে সাধারণ রঙ্গালয়ে তিনি গান শিক্ষা দিয়েছেন—এ সব বিষয়ে তাঁর মন সংস্কার-মুক্ত ছিল। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারিত হোক।

সৈয়দ মুজতবা আলী অনাদিকুমার প্রসঙ্গে : স্বয়ং গুরুদেব দীনেন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী তাঁকে শুধু যে অশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন তাই নয়, ছাত্রদের মধ্যে তিনি যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাণ্ডারী, কার্যত সেটা বার বার স্বীকার করেছেন তাই নয়—আমার মনে হয়, শিষ্যকে গুরু যে স্বীকৃতি যে সম্মান দিতে পারেন অনাদিকুমার পেয়েছিলেন সেটি পরিপূর্ণ মাত্রায়। তাঁর পূর্বে বা পরে কোনো শিষ্য গুরুপদপ্রান্ত থেকে এতখানি সম্মান আহরণ করতে পারেননি।

প্রমথনাথ বিশী 'রবীন্দ্র-ঘরানা-য়' অনাদি দস্তিদার নিবন্ধে : রবীন্দ্রসঙ্গীত আজ সিনেমা, বেতার এবং বহুতর স্কুলের কল্যাণে বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছে —এটি বহু অভাব-অভিযোগক্লিষ্ট বাঙালি সমাজের পক্ষে একটি স্বগীয় আশীর্বাদ। এই কল্যাণব্রতের গোড়ার দিকে অনাদির নাম। কাজেই বাঙালী সংস্কৃতির এই দিকটার আদিযুগে অনাদির দান ও প্রচেষ্টা চিরস্মরণীয় থাকবে।

সঙ্গীত-সাধক অনাদিকুমার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতম গুরু শৈলজারঞ্জন মজুমদারের উক্তি : সরাসরি রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল সুগন্ধ জিনিসটি কোথায় পাব সেই কথা ভেবে নানা জায়গায় কান পেতে থাকতাম। কিন্তু কোথাও যেন সেই অকৃত্রিম আসল জিনিসটি শুনতে পেতাম না। হঠাৎ একদিন অনাদিবাবুর গলায় সেই অধরা জিনিসটি শুনে চমকে উঠি, মনে হয়েছিল তিনি যেন রহস্যের চাবিকাঠি পেয়েছিলেন।···যে যুগে রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল লোক-পরিচয়ের বাইরে, সে যুগে নিষ্ঠাভরে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাদানকেই জীবনের গভীরতম ও শ্রেষ্ঠ কর্তব্যরূপে গ্রহণ করে অনাদিবাবু প্রায় দু যুগের শত শত ছাত্রছাত্রীকে তৈরী করেছেন।

তাঁর শ্রদ্ধেয় অনাদিদা সম্বন্ধে শান্তিদেব ঘোষ : তিনি সকলকেই বিনা দ্বিধায় দিয়ে গেছেন, কখনো তার প্রতিদান চাননি। সবাই ছিল তাঁর কাছে সমান।···তিনি কোনো দলগত গোষ্ঠীতে থাকা পছন্দ করতেন না। এই কারণে সকলেরই ছিলেন তিনি প্রিয়।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

"অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ"—
রবীন্দ্রনাথের গানের সম্বন্ধে এইটেই হলো আমার প্রথম, প্রধান ও শেষ কথা।

মাত্র দিন কয়েক আগে বর্ষশেষের সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কণ্ঠ শোনা গেল রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে। হারমোনিয়মের সুরে দেশ রাগের আভাস। যখন তিনি গান ধরলেন, 'এ ভারতে রাখ নিত্য প্রভু' তখন ঐ রাগের মর্মরূপটি ফুটে উঠল তাঁর উদ্বেল আবেগে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রাণময় হয়ে উঠল রবীন্দ্রভাবের অনন্য স্বরূপ।

'অনির্বাণ ধর্ম আলো
সবার ঊর্ধ্বে জ্বালো জ্বালো
সংকটে দুর্দিনে
রাখো তারে অরণ্যে তোমারই পথে।'

পরে গাইলেন 'জগতে আনন্দ যজ্ঞে' এবং আরও কয়েকটি গান। গানের আলোয় যেন শিল্পীর অন্তর উদ্ভাসিত। অনুভব করলাম তাঁর ধ্রুপদী চিন্তার উদার উদাত্ত পটভূমি, ধ্যানের প্রশান্তি আর গভীর সমাহিতি। 'রাখো তারে অরণ্যে তোমারই পথে', ধ্রুপদী আকাশে গৈরিক বর্ণের চকিত আভাসে শিল্পীর বিবাগী মনটি যেন ক্ষণকালের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই আবার জগতের আনন্দযজ্ঞের নিমন্ত্রণ রাখতে যাত্রা করল। গান শুনতে শুনতে বারবারই চোখের সামনে ভেসে উঠছিল সেই ছবি। গেরুয়া রংয়ের ঝুলি কাঁধে খর গ্রীষ্মের পীচগলা পথে আপনমনে চলেছেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। পথে হঠাৎ দেখা হলো কোন সাহিত্যিক, কবি অথবা শিল্পীবন্ধুর সঙ্গে। অমনি গান আর কাব্যের আলোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন। মাথার ওপর সূর্যের প্রতাপ, তপ্ত হাওয়া কোন কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নেই। আলোচনা থামল। আবার পথে বেরোলেন পথ-পাগল উদাসী। কোন বন্ধু ধরে নিয়ে গেলেন আড্ডায়। গানে, গল্পে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু আত্মহারা। তাঁর নৌকা যে কখন কোন ঘাটে ভিড়বে সে খবর তাঁর নিজেরই জানা নেই। এই সব টুকরো টুকরো আসরে আড্ডায় নির্বাধ অন্তরের যে চিন্তা কল্পনা স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় উছলে পড়ে তারই মধ্যে বুঝি রয়েছে তাঁর আনন্দ-যজ্ঞ। সেই যজ্ঞেই তাঁর নিমন্ত্রণ। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও। এই নিমন্ত্রণকেই তিনি নব নব রূপে আস্বাদ করেছেন। আজও করছেন। গুরুদেবের গানের কথাতেই যেন বলে যাচ্ছেন,

'তোমার সভায় দিয়েছ ভাব
বাজাই আমি বাঁশী
গানে গানে গেয়ে বেড়াই
প্রাণের কান্নাহাসি—'

ধ্রুপদ, ঠুংরী, খেয়াল, টপ্পা, দেশাত্মবোধক গান, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী, রবীন্দ্রসঙ্গীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদ, পাশ্চাত্যসঙ্গীত—তথা পৃথিবীর সকলরকম সঙ্গীতই আছে তাঁর সঙ্গীতমানসে। কিন্তু পাণ্ডিত্যের কাঠিন্য বা উগ্রতা তাঁর প্রকাশভঙ্গিতে কোনো বিশেষ রূপ সৃষ্টি করেনি। উপরন্তু পাণ্ডিত্যের সরস প্রকাশে তাঁর শিল্পকৃতি এমন একটি মর্মদ্রাবী রূপ গ্রহণ করেছে যাকে অনায়াসে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সঙ্গীতশৈলী নামে চিহ্নিত করা যায়। এর কারণ তাঁর মধ্যে পণ্ডিত জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র যতখানি প্রবল, ঠিক ততখানিই প্রবল প্রাণময় শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। পাণ্ডিত্য তাঁর কল্পনার জগৎকে যতখানি সংহত ও গভীর করেছে, কল্পনাও ঠিক ততখানিই রঙিন সুষমায় সেই পাণ্ডিত্যকে করে তুলেছে হৃদয়-ছোঁওয়া। সেখানে কেউ কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। উভয়ে মিলিত হয়েছে একই আবেগে। এই মিলনের ফলশ্রুতি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তাঁর অফুরান ভাববৈভবে সুদূরপ্রসারী।

…শিল্পী মন নিয়ে শুধু জন্মাননি। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর জীবনবিধাতা তাঁর অনুভূতিশীল মনটিকে সযত্নপালিত চারার মতই অনকূল পরিবেশে বিকশিত করার আয়োজনে যেন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রয়াত পিতা যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র পাবনা, রাজসাহী ও বগুড়া জুড়ে বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু রুপোর চামচ মুখে দিয়ে জন্মালেও জমিদারী দাম্ভিকতা তাঁর মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। বাড়িতে ছিলো পুরোপুরি সঙ্গীত-কলা, সাহিত্য, দেশাত্মবোধ ও ধর্মচর্চার আবহাওয়া। এবং এর মূলে ছিলো বাবারই সংস্কৃতি ও কলাশিল্পে একনিষ্ঠ অনুরাগ ও অন্তহীন উদ্দীপনা।

বাবার কাছে পাওয়া যে শিল্প ও সঙ্গীতবোধের স্ফুলিঙ্গ অন্তরে জ্বললো, তাকেই শিক্ষা ও রেওয়াজে দীপ্তশিখায় পরিণত করে তুলেছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম আসে কাকা হরিচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের নাম, তিনি সরোদিয়া আমীর খাঁ ও ধ্রুপদী দানীবাবুর শিষ্য ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর প্রথম শিক্ষাগুরু তিনিই এবং তিনি কিশোর বয়সেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রুচি, সংস্কৃতি গড়ে দিয়েছিলেন। আর আধ্যাত্মিক চেতনা ছিলো তাঁদের পারিবারিক সম্পদের মতই। সেই কারণেই ধ্রুপদ, ভজন, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, দেশাত্ম-বোধক, রবীন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীত কণ্ঠে গুনগুনিয়ে উঠতো ঠিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই স্বাভাবিক ছন্দে।

বিরাট পরিবারের ভাইবোন সকলেই কিছু-না-কিছু গাইতে বা বাজাতে পারতেন বলে একটা ফ্যামিলী অর্কেস্ট্রা গড়ে তোলা এঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো। এই অর্কেস্ট্রার নেতাও কাকা। নানান ভাব ও সুরের এই অবিরাম

ধারাই কি সেদিনের সেই কিশোরকে ভাবীকালে 'নবজীবনের গান'-এর স্রষ্টা করে তুলেছিলো ?

কতদিক থেকে কতভাবে যে ভারতীয় সঙ্গীতের সকল-ধারা এসে জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর শিল্পীমনকে সরস ও উর্বর করে তুলেছিলো ভাবলে বিস্ময় জাগে। ছোটোবেলায় অঘোর চক্রবর্তীর শিষ্য সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে টপ্পার তালিম, মাতৃবন্ধু সরলা দেবীর দাক্ষিণ্যে পাওয়া ব্রহ্মসঙ্গীত। এই প্রসঙ্গেই শিল্পী স্মরণ করলেন বালকবয়সে নানা মিটিং-এ কোরাসে গাওয়া 'বন্দেমাতরম', 'দেশ দেশ নন্দিত করি', 'বঙ্গ আমার জননী আমার', 'এবার তোর মরা গাঙে', 'চলরে চল সবে ভারত-সন্তান' এবং 'বেত মেরে কি মা ভোলাবি' ইত্যাদি গানের কথা—যেগুলো সেকালের পটভূমিতে মনের মধ্যে একটা উদ্দীপনা সৃষ্টি করত। আরও পরে ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও তাঁর কাছে পাওয়া সযত্ন তালিম দীনেন্দ্রনাথ, অনাদিকুমার দস্তিদার, শৈলজাদা, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিদার কাছে নানা উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা রবীন্দ্রসঙ্গীত ও সংস্কৃতির ঐশ্বর্যলোকের দিক যেন তাঁর স্পর্শকাতর মনকে ঠেলে দিলো। কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তনের বাঁধাধরা ছাত্র তিনি নন। কিন্তু বিরাট সাঙ্গীতিক পশ্চাৎপটের শক্তিতেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাব-গৌরবকে অন্তরে বরণ করে নিতে তাঁর দেরী হয়নি। এখনও তিনি নিজেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একনিষ্ঠ ছাত্র বলে মনে করেন।

তিনি যখন রবীন্দ্রসঙ্গীত গান সে গানের শাস্ত্রীয় রাগ ও ধ্রুপদী আঙ্গিককে পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেও রবীন্দ্র-কল্পনার যে রূপটি যথাযথ ভাবে সৃষ্টি করেন তার মধ্যে কোনো ম্যানারিজম নেই। তবু তাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে এক নিমেষে চিনে নেওয়া যায়। তার কারণ শিল্পীর বহুধাবিস্তৃত সাঙ্গীতিক অভিজ্ঞতার প্রসাদে প্রতিটি পথের বাঁকের ভেতরের পথগুলিও তাঁর কাছে এত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। তাই এ গান হয়েছে তাঁর সঙ্গীত-ধর্মেরই অঙ্গ। বাদল খাঁর ঘরানা ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের এবং মুস্তাক হোসেন খাঁর ঘরানার কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তালিম ধ্রুপদী ভাস্কর্যের বুকে জাগিয়েছে রংবাহারের আবেশ। এ-আবেশকে বারবার রসসিক্ত করেছেন ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মেলনে গুণীদের গানবাজনা শুনে। শিল্পীর জীবনে শেখায় চেয়ে অনেক বড় ভূমিকা প্রকৃত ওস্তাদদের গান শোনা—জ্যোতিরিন্দ্রবাবু এই কথাটাই বারবার বলছিলেন ঘরোয়া পরিবেশে এক সাক্ষাৎকারে বসে।

নাগরিক-ধারা, শাস্ত্রীয়-ধারা, রবীন্দ্রসঙ্গীত ধারা ও গ্রামীণ সঙ্গীত-ধারার সঙ্গে মিলল ইউরোপীয় সঙ্গীতের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা যার পথপ্রদর্শক প্রধানত বিষ্ণু দে ও চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। এরপর জীবনে এলো গণনাট্য আন্দোলনের ঢেউ। তাঁরই ভাষায়—কেবলমাত্র আত্মকেন্দ্রিক আত্মপ্রসার, আত্মগরিমার পথ ছেড়ে আমার কাব্য ও সঙ্গীতচর্চা একটা সুনির্দিষ্ট পথ বেছে নিলো।

'নবজীবনের গান' এই যুগেরই। সে সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা করব 'বাংলা গানের' অধ্যায়ে। উপস্থিত আমাদের আলোচ্য রবীন্দ্রসঙ্গীত।

ভারতীয় সঙ্গীতের সকল ধারাই আপনার অধিগত, তবু রবীন্দ্রসঙ্গীত আপনার মন জুড়ে আছে কোন শক্তিতে?—এইটেই ছিলো তাঁর কাছে প্রথম প্রশ্ন।

কথা, সুর ও ছন্দের মিলিত আবেদন মনের দুয়ারে যেন ধাক্কা দিলো। কথার সীমাতীত ব্যঞ্জনা বিশেষ যুগকে অতিক্রম করে পেঁাছে দেয় চিরায়ত কালের আঙিনায়। রবীন্দ্রনাথ সেই গানেরই উদ্গাতা, যে গানের ভিতর দিয়ে বাঙালী বিভিন্ন যুগ, যুগের মানুষ, আর তার ধ্যান ও ধারণাকে ছুঁতে পারে। এ-গানের সর্বমুখীন গতি ও দিক অতীত, বর্তমান ও ভাবী যুগের স্বপ্ন, কল্পনা ও ভাষাকে অনুরণিত করে। মাটির গানের সঙ্গে আকাশের মিতালীর চরম বিকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথেরই গানে। এই মিতালীর মহত্তর কোনো রূপ কল্পনা করা যায় না।

তবে এই উদার ব্যাপ্তিকে তাঁর আপন স্বরূপে বোঝাবার জন্য নতুন কোনো শক্তিশালী প্রবক্তার দরকার—যিনি সকল বন্ধতা ও ম্যানারিজম থেকে মুক্ত করে এ-গানকে তার আপন গরিমায় পেঁাছে দিতে পারবেন। শুধু সুকণ্ঠ ও স্বরলিপিই যথেষ্ট নয়। এর জন্য চাই কল্পনার ব্যাপক ব্যাপ্তি ও সঙ্গীতের উদার এবং গভীর দৃষ্টি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতকে তার আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রেখেও তার ডাইমেনশনের ঐশ্বর্যে উপলব্ধি ঘটানোর দিন এসেছে। বাক, বীটোফেনের মৌলিক সঙ্গীতকে সংরক্ষণ করেও ইউরোপীয় সঙ্গীতকার তাদের নতুন ইন্টারপ্রিটেশন দিতে পারেন। ঠিক এই অ্যাপ্রোচের প্রচুর অবকাশ রবীন্দ্রসঙ্গীতেও আছে। তবে নিজেদের খুশীমত পরিবর্তন ও তছনছ করার নাম যথার্থ পরিবেশনা নয়। আগে অর্জন করতে হবে সংরক্ষণের গর্ব, তারপর আপন নিয়মেই আসবে ব্যাখ্যানার শক্তি ও অধিকার। সংরক্ষণ ও আবহমানতার মধ্যে ঠিক একটা ভারসাম্য বা সমন্বয় না ঘটলে এ-বস্তু সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবগভীরতা, কথার অন্তর্নিহিত গভীর অর্থ না বুঝে কি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া যায়?

ধন্যবাদ। ঐ আলোচনাতেই ত আসতে চাইছিলাম। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভেতর ঢুকতে হলে কাব্য ও সাহিত্যবোধ এবং বিশেষভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। সেইজন্য আমার মনে হয় এ-গান শেখবার আগে অথবা শেখার সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট সময়ের রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠ্যক্রম যোগ্য গুরুর কাছে অধ্যয়ন করা উচিত। এটা আমি আমার ব্যক্তিগত ধারণার কথা বলছি। যাঁরা বিশেষ প্রতিভার অধিকারী, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। কারণ ঈশ্বর তাঁদের এ-বোধ দিয়েই পৃথিবীতে পাঠান।

আগেই বলেছি রবীন্দ্রসঙ্গীত হলো কথাশ্রয়ী গান। 'বক্ষে তোমার বাজে বাঁশী'—কেন এবং কিভাবে বাজে, সে-কথা বুঝতে হলে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হবে। আই পি টি এ-তে (এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতিরিন্দ্রবাবুই) থাকতে আমরা 'বাঁধ ভেঙে দাও', 'মরু বিজয়ের কেতন উড়াও', 'দারুণ অগ্নিবাণে'

ইত্যাদি গান কত গেয়েছি, আর গাইতে গাইতে উপলব্ধি করেছি রবীন্দ্রসঙ্গীতে দারুণ দীপ্তি—যে-দীপ্তি তাঁর গানের বিরুদ্ধে মেয়েলীপনার অভিযোগকে কোথায় ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

এ-গানের লোকপ্রিয়তা সৃষ্টিতে পঙ্কজদার অবদান সকল সন্দেহ ও প্রশ্নের অতীত। আগে সাধারণ মানুষের গান বলতে নজরুল সুরসাগর এবং দেশাত্মবোধক গানকেই সবাই জানতেন। ব্রাহ্মসমাজ, জোড়াসাঁকো, সঙ্গীত সংঘের অতিপরিশীলিত বিদগ্ধ মহলে রবীন্দ্রসঙ্গীত সীমাবদ্ধ ছিলো। ছায়াছবির মাধ্যমে এবং সায়গল-কাননের মত কণ্ঠের গাইয়ে এবং নিজেও রেডিওতে সঙ্গীতশিক্ষার আসরে দীর্ঘদিন বহু রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে তিনিই সাধারণ মানুষের সঙ্গীত-ভাবনায় এ-গানের ঢল নামালেন। তাঁর গান কতটা রাবীন্দ্রিক এবং কতটা অ-রাবীন্দ্রিক সে-বিচারের চেয়ে অনেক বড় সত্য হলো এই রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঐশ্বর্য-লোকের দ্বার সাধারণ মানুষের সামনে তিনিই প্রথম খুলে দিয়েছেন। তাঁর প্রাপ্য গৌরব তাঁকে না দিলে নিজেদেরই দীনতা প্রকাশ পাবে।

*

'রাবীন্দ্রিক' বলতে আমি বুঝি রবীন্দ্রবোধ। এই বোধ মানে যে-কোনো সমৃদ্ধ সঙ্গীতধারার নিজস্ব রূপকে যথার্থ রাখতে হলে ক্ল্যাসিক্যাল গানের শিক্ষা ও ভিত্তি থাকা দরকার। সেই চিরন্তন বোধই চিরন্তনকে চিনিয়ে দিতে পারে। এখনকার রবীন্দ্রসঙ্গীতে বৈচিত্র্যের অজস্রতার কারণে এ-গানের ক্ষেত্রে আছেন কত শিল্পী, কিন্তু রাজেশ্বরী, কণিকা, সুচিত্রারা কি অনেক হন? না হওয়া সম্ভব? তারা এক বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। প্রথম কারণ প্রতিভা দ্বিতীয় কারণ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভিত্তি। এইমাত্র তুমি প্রশ্ন করেছিলে না রাজেশ্বরী দত্ত-কে কেন নকল করা যায় না? তার কারণ অমিয়া ঠাকুর, রাজেশ্বরী দত্ত ধ্রুপদী অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতা মিলিয়ে এমন একটা অনুভব পর্যায়ে পৌঁছেছেন এবং সে অনুভব তাঁদের কাছে এত স্বতঃস্ফূর্ত ও আপন হয়ে উঠেছে যে, এই স্বতঃস্ফূর্ততা না এলে ঠিক এইভাবে গাওয়া যায় না।

আর কি? গায়কী? জগৎ এবং জীবনের প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে দেশের গতিপ্রবাহ বদলায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রূপ ও চিন্তা বদলায়—আর গায়কী থাকবে অনড়, অচল হয়ে, এটা কি একটা কথা হলো? জীবনে 'এনএভিটেবিলিটি' অথবা অনিবার্যকে মানতেই হয়। প্রতি যুগের চিন্তা ও আবেষ্টনীর ছোঁয়ায় গায়কী আরও প্রাণবন্ত হবে নিশ্চয়, তবে মেইন স্ট্রিম বলে একটা কথা আছে ত? লক্ষ্য রাখতে হবে সেই মূল প্রবাহের গতি যেন অব্যাহত থাকে। এখনকার কীর্তন একশো বছর আগের গাওয়া কীর্তনের চেয়ে আলাদা। তবু কীর্তন বলে চিনতে ত ভুল হয় না? এটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সম্ভব। তবে একটু আগে যে-কথাটি বললাম—তার জন্য চাই 'প্রিজারভেশন' বা সংরক্ষণের দিকে শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

আর কি বললে? আধুনিক গানের ভঙ্গিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার অভিযোগ অনেকে আনেন? এ-কথার উত্তরও রয়েছে আমার একটু আগের

আলোচনায়। সমাজের মত গানও জীবনের গতিতেই বদলায়। সে বদলাক। কিন্তু সজাগ থাকতে হবে গানের স্পিরিট বা মূল ভাবটি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। এতবড় এক বিশাল ঐশ্বর্যের মর্যাদা রাখার দায়িত্ব সম্বন্ধে সকল গায়ক-গায়িকারই সচেতন থাকা উচিত। তাঁরা একখানা রবীন্দ্রসঙ্গীতই গান, কি একশোখানাই গান—এ দায়িত্ববোধ কোনোমতেই শিথিল হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কার এক্সপ্রেশন সাচ্চা কার ঝুটা—কালের কষ্টিপাথরেই তার যাচাই হয়ে যাবে।

সকল রকম বন্ধনমুক্ততা রবীন্দ্র-সাহিত্য, কাব্য ও সঙ্গীতের প্রাণের কথা সত্য। কিন্তু কিছু বন্ধন না থাকলে মুক্তির আনন্দই বা আসবে কেমন করে? তাই সকল রকম বন্ধনকে মেনে নিয়েই মুক্তির স্বাদ পেতে হবে। 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়, লভিব মুক্তির স্বাদ'—রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে এইটিই হলো আমার প্রথম প্রধান এবং শেষ বক্তব্য।

নীহারবিন্দু সেন

রবীন্দ্রসঙ্গীতের রূপ ও রীতির বিষয়ে আমার ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট। 'তাঁর রচিত গীত-কবিতার মর্মে পৌঁছতে না পারলে শিল্পী কখনও এই গানের প্রকৃত রূপটি ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না। সুর ও ছন্দ বাণীর প্রয়োজনেই সংযোজিত।

সযত্ন শিক্ষায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিস্তারকে যে ক'জন সঙ্গীতগুরু এবং যে ক'টি প্রতিষ্ঠান সুদূরপ্রসারী করে দিয়েছেন তাদের মধ্যে নীহারবিন্দু সেন এবং গীত-বিতান শিক্ষা কেন্দ্রের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গেই উল্লেখ করতে হয়।

জীবনের বহুধা বিস্তৃত অভিজ্ঞতা তাঁর সঙ্গীত মানসের পটভূমি রচনা করেছে। আজকে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গান তাঁর চিত্ত ও চেতনাকে আচ্ছন্ন করে আছে প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন রাজনীতির বন্ধুর পথের পথিক! যদিও চেতনার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই গান তাঁর সঙ্গী। তাঁরই ভাষায় গুরুদেবের কথাকে অনুসরণ করেই বলতে ইচ্ছে করে কবে যে গান গাইতে পারতাম না সে কথা মনে পড়ে না। ছোটবেলায় মুকুন্দদাসের যাত্রা দেখে এসে তাঁরই মতন মাথায় পাগড়ী বেঁধে দুলে দুলে গাইতাম, 'ভাইরে মানুষ নাইরে এ দেশে,' অথবা 'দেশের উল্টে গেছে হাওয়া।' কখনো বা সাধারণ পোশাকেই গাইতাম, সারারাত ঘুমিয়ে কেটে সকালবেলা উঠি হঠাৎ দেখি আজ আমাদের হয়ে গেছে ছুটি।

তারপর হঠাৎই একদিন নীহারবাবু কলকাতায় এসে পড়লেন যাদবপুর কলেজ অফ্ ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ভর্তি হতে।

সেই সময়ই শুনে শুনে তিনি অনেক গান লিখতেন, এবং সুরও দিতেন। এঁর গান ও সুর-রচনার সংবাদটা পরিচিত রসগ্রাহী বন্ধুদের উৎসাহে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এবং হঠাৎই একদিন হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি থেকে আমন্ত্রণ এলো তাঁরই কথা ও সুরে দুজন নতুন শিল্পীর রেকর্ড করানোর জন্য।

সেই রেকর্ড যখন বাজারে বেরোলো তখন আমার অনুভূতির রোমাঞ্চ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। তারপর এমন একটা অবস্থা দাঁড়ালো যে অজয় ভট্টাচার্য ও শৈলেন রায়ের রচিত গানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার গান চলতো। দু বছর পর যাদবপুর কলেজ ছেড়ে দিলাম। পাইওনিয়ার রেকর্ড কোম্পানিতে ট্রেনার ও কম্পোজার হিসেবে যোগ দিলাম।

এখানে স্ব-রচিত গানের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ডের

ট্রেনিং-ও দিতে লাগলাম। গুরুদেব তখনও জীবিত। আমার আনন্দ এই যে আমার ট্রেনিং-এ করা একটি গানও নাকচ হয়নি। শৈলদেবী, মাধুরী চৌধুরী, নমিতা সেনগুপ্ত, বেচু দত্ত, সুপ্রীতি ঘোষ, প্রতিমা গুপ্ত—এঁদের সবার রেকর্ডগুলি আমার শিক্ষকতায় হয়েছিলো। পরবর্তীকালে দেবব্রত বিশ্বাস, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন গুপ্ত, বিমলভূষণ, গীতা সেন, সাবিত্রী নাগ, আরও অনেক শিল্পীর রেকর্ড করিয়েছিলাম।

কলকাতাতে এসেই নীহারবাবু স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী চৌধুরানী, ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। সরলা দেবীর অনুরোধে তাঁরই সুরারোপিত ত্রিশটি গানের একটি স্বরলিপি বই তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। বইটির নাম গীতত্রিংশতি। পরে পুলিন সেনের আগ্রহে কবি অতুলপ্রসাদ সেনের গানের স্বরলিপি পুস্তক এখন পর্যন্ত পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশিত। কাকলির সম্পাদনাও করেছেন। কাকলির প্রকাশক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

গীতবিতানের প্রসঙ্গে নীহারবিন্দুবাবু বলেন, ১৯৪১ সালে গীতবিতান প্রতিষ্ঠার সময়ে আমি ছিলাম সে উৎসবের আমন্ত্রিত দর্শক। গীতবিতান শুরু হতে না হতেই জাপানী বোমার দাপটে বন্ধ হয়ে গেলো। অনাদিকুমার দস্তিদার তখন দেশে পলাতক। ঠিক কিছুকাল আগে থেকেই শান্তিনিকেতনে সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষ শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অঙ্গনে সকলের প্রতিই তাঁর উদার আহবান ছিলো। তাঁরই আগ্রহে ১৯৪২ সালে রবীন্দ্রজন্মোৎসবে আমি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলাম। এ বছরই যখন গীতবিতান আবার আশুতোষ কলেজে শুরু হলো—কনকদি, আমি ও স্বর্গত সুজিতরঞ্জন রায় গীতবিতানের শিক্ষকতার কাজে বহাল হলাম। ১৯৪৩ সালে গীতবিতান স্থানান্তরিত হলো ২৫বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডে। এখন গীতবিতান শুধু বাংলাদেশেরই নয় সারা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান। জানিনা সারা পৃথিবীতে এরচেয়ে বড় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান আছে কিনা। শুধু মাত্র কোলকাতাতেই গীতবিতানের চারটি কেন্দ্র। ভবানীপুর, উত্তর কলিকাতা ও বালিগঞ্জ। এই চারটি কেন্দ্রে বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা তিন হাজার। তাছাড়াও কোলকাতার বাইরে আরো ছ'টি অনুমোদিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তন আছে।

নীহারবিন্দুবাবুর কর্মজগৎ আনন্দজগৎ সব কিছু গীতবিতানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, হায়ার সেকেণ্ডারী বোর্ডের পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারেও তিনি সহযোগিতা করেন।

আপনি নিজে গীতিকার এবং সুরকার। তাছাড়া সবরকম গান সমান আগ্রহে ও যত্নে আহরণ করেছেন এবং গেয়েছেনও। তবু রবীন্দ্রসঙ্গীতে সমর্পিত প্রাণ হয়ে ওঠবার কারণ কি? নীহারবাবুর মুখে সঙ্গীতজীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের কাহিনী শোনাবার পর এইটেই ছিলো আমার প্রথম প্রশ্ন।

এর উত্তরে আমার ছাত্রী লতিকা সেনের একটা মন্তব্য উল্লেখ করছি—নীহারবাবু হেসে বললেন, সে এখন এ আই আর দিল্লীতে আছে। একবার খুব সম্ভব ১৯৭১ সালে, কলকাতায় এসেছিলো। সেই সময় রেডিও স্টেশনে ওর সঙ্গে দেখা হতেই সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের, (তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিশিষ্ট ব্যক্তি) আমায় দেখিয়ে বললেন এই যে মানুষটিকে দেখছো এর মধ্যে অসাধারণ প্রতিভা ছিলো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একে গ্রাস করেছেন।

কথাটার মধ্যে ওর একটা স্নেহের অভিযোগ ছিলো। কিন্তু আমার কাছে ও-কথাটা একটা মস্তবড় কমপ্লিমেন্ট বলে মনে হয়েছিলো। কারণ ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর আমি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করতাম। যা একটু আধটু শুনতাম তাই সারাদিন গাইতাম। আমার বাবার ধর্মাচরণ ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন ছিলো। একটু বড় হয়েই বাবার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে যেতে হতো। সেখানে তারিণীবাবুর সঙ্গে ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতাম। ঢাকাতে ব্রাহ্মসমাজে আমিই ছিলাম একমাত্র গায়ক। ‘তুমি যত ভার’ আরও গান গাইতাম। দাড়িওয়ালা, গম্ভীর প্রকৃতির আচার্যও আমার কাছে এসব গান শিখতেন। গানের কোনো রীতিগত শিক্ষা আমি পাইনি। প্রধানত শুনে শুনেই শেখা—বললাম ত একটু আগে। এই প্রসঙ্গেই আমার বোন অশ্রুর কথা নেমে পড়ছে। তার কণ্ঠ ছিলো খুব মিষ্টি। সেও শুনে শুনেই গান শিখতো। একটু রীতিগত শিক্ষা পেলে ও খুবই ভালো গাইয়ে হয়ে উঠতো বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু গানের শিক্ষক রেখে গান শেখাবার প্রথা তখন অন্তত মফঃস্বল শহরে প্রচলিত ছিলো না। প্রথম জীবনে বেশ কিছুদিন আমি স্বদেশী সভায় গান গেয়েছি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ওপর আকর্ষণ আমার অন্য সব গানের আকর্ষণকে ছাপিয়ে উঠছিলো। একসময় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর সংগ্রহ করতে পারিনি বলে নিজেই সুর তৈরী করে গাইতাম। এখনও ‘গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি—’ গানটির সুর নেই। পরবর্তীকালে ‘এই ত তোমার প্রেম’ ইত্যাদি গানের স্বরলিপি যখন বেরোলো অথবা কোনো শিল্পী গাইলেন আমার রচিত সুর শিখে ঐসব গান যারা গাইতেন তাঁরা সকলে ঠাট্টা করতো এ কি সুর শিখিয়েছেন ?…এই-সব ঘটনা থেকেই বুঝতে পারো আমার মনটা কি পরিমাণ রবীন্দ্র সমুদ্রমুখী হতে আকুল হয়েছিলো এবং তাঁর গানের অন্তহীন প্রবাহে মিশে যেতে চাইছিল। কথা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছবি এঁকেছেন। সুর ও ছন্দের তুলি দিয়ে রং ফলিয়েছেন। যখন গান গাইনি শুধু কবিতা আবৃত্তি করেই একটা অনির্বচনীয় আনন্দ পেতাম। সেই আনন্দই আমায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের দিকে টেনে নিয়ে গেছে।

গীতবিতানে কাজ করবার সুযোগ আমার কাছে যেন বিধাতার আশীর্বাদ হয়ে এলো।

গীতবিতানের প্রথম যুগ থেকেই যে কোনো সঙ্গীত ও নাট্যানুষ্ঠানে আমি শৈলজাদা ও অনাদিদার সহযোগী রূপে কাজ করেছি। এখনকার অনুষ্ঠানে আমার পরিকল্পনা, এবং তার সার্থকতার মূলে তাঁদের চিন্তার প্রভাব অনেক-

খানি। এসব অনুষ্ঠানে আমার প্রধান সহায় গীতবিতানেরই অন্যতম শিক্ষক-তরুণ মিত্র। আর সবচেয়ে বড় কর্মী শিক্ষক শিক্ষিকার দল—যাদের অধিকাংশই আমার ছাত্রছাত্রী।

শিক্ষক হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা এই যে, শিক্ষক যদি তাঁর ভাবনায় আন্তরিক হন তবে তাঁর সিরিয়াসনেস শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বর্তাবে। যাঁরা আন্তরিক নন তাঁরা আপনা থেকেই সরে যাবেন।

গীতবিতানের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে আমাদের ভূমিকা যতখানি থাকে ঠিক ততখানিই শিক্ষার্থীদের। আমার পরিচালনায় গীতবিতানের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হলো মায়ার খেলা, বাল্মীকি প্রতিভা, কালমৃগয়া, ১৯৫৯ সালে বর্ষামঙ্গল, ১৯৬০ সালে শ্রাবণ গাথা, ১৯৭৩ সালে রবীন্দ্রসংস্কৃতি পরিক্রমা ও ১৯৭৫-এ রবীন্দ্রসঙ্গীত রচনার শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে গীতোৎসব। রবীন্দ্রনাথের গ্রীষ্মপ্রধান ঋতুর গান নিয়ে আমার নিজস্ব রচনা ও প্রয়োজনা হলো তপোবহ্নি। গীতবিতানের সুদীর্ঘ ৩৫ বছরের মধ্যে আমরা কখনও চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা বা শ্যামা নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করিনি।

গত বছরের উৎসব আমায় খুব আশাবাদী করে তুলেছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতিষ্ঠা ও জয়যাত্রা সম্বন্ধে। দেখলাম রবীন্দ্রনাথের নামের অনুষ্ঠানে সকল শিল্পীই অকুণ্ঠভাবে সাড়া দিয়েছেন এবং সকলের এই মিলিত উৎসবে আমি অনুভব করেছি গুরুদেবের প্রসন্ন মুখের দীপ্তি। আর এই মিলনেই আমি রবীন্দ্রসংস্কৃতির বিশ্ববিজয়ী প্রতিষ্ঠার আশ্বাস পেয়েছি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রসঙ্গে আর একটি নীরব রবীন্দ্রপ্রেমিকের কথা আজ মনে পড়ছে। তিনি হলেন সুকমলকান্তি ঘোষ। বহুদিন আগে ওয়াই ডবলিউ সি এ-তে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমপর্যায় নামে একটি অনুষ্ঠান করার সময় সুকমলদার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো। সেদিন থেকে শুরু করে আজ অবধি সকল কাজেই তাঁর অকৃপণ সহযোগিতা পেয়ে আসছি।

একজন বড় শিল্পী সত্যিকারের বড় হন তিনিই অনেক প্রতিভাকে এগিয়ে আসার পথ করে দেন। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে মায়ার খেলার একটি ঘটনা। প্রথম তিনটে শো-তে রাজেশ্বরী গেয়েছিলো প্রমদার গান। মাঝখানে 'আর কেন আর কেন কেন এলিরে'-র পর এক সখির গানের জন্য আমি একজনের নাম প্রপোজ করেছিলাম। রাজেশ্বরী বলল, যদি অন্য কাউকে দিতেই হয় গীতাকে দিন। সি সিংগস উইথ ফিলিংস অ্যান্ড মেলোডি।

সেই থেকে মায়ার খেলায় গীতার গান বাঁধা হয়ে গেলো। পরে বড় রোলেও গীতা গেয়েছে এবং সে গান প্রশংসিতও হয়েছিলো। তবে গীতাকে দিয়ে এ গান গাওয়াবার রেওয়াজ প্রথম শুরু করেছিলো রাজেশ্বরী, ইদানীং-কালে ওকে এর সম্মান দিয়েছেন সুকমলদা। সেদিন শ্মশানে রাজেশ্বরীকে অগ্নিশয্যায় তোলার সময় ওরা যখন (গীতা, অশোক, বাণী, মায়া) 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে' গানটি গাইছিলো সেই কথাটিই বারবার মনে পড়ছিলো।

আপনার কাছে আমি শুনতে চাই রবীন্দ্র গায়কী সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য।

গীতরীতি বা ঘরানাকে একাকার করে ফেলি। কিন্তু একটার সঙ্গে অন্যের তফাত আছে। গায়কী কথাটা ব্যক্তিগত কিন্তু ঘরানা হচ্ছে একটা বিশেষ পদ্ধতিনির্ভর। ফৈয়াজ খাঁর গায়কী হতে পারে কিন্তু ঘরানা? সেটা সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের রূপ ও রীতির বিষয়ে আমার ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর রচিত গীতিকবিতার মর্মে পেঁছতে না পারলে শিল্পী কখনও এই গানের প্রকৃত রূপটি ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না। সুর ও ছন্দ বাণীর প্রয়োজনেই সংযোজিত। এই জন্যই আমি গুরুদেবের শেষ জীবনের গান-গুলিকে উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত বলি।

পঙ্কজ মল্লিক

রবীন্দ্রসঙ্গীতকে আমি জনপ্রিয় করেছি একথা ভাববার স্পর্ধা আমি রাখি না। তাঁর গান গাইবার এবং শেখাবার অধিকার যাঁরা আমাকে দিয়েছেন এ গৌরব তাঁদেরই প্রাপ্য।

সঙ্গীতে রবীন্দ্রযুগ নামে যে উজ্জ্বল অধ্যায়টিকে আজ চৈতন্যযুগের সেই 'প্রেমে মাতোয়ারা চোখে বহে ধারা'-র সঙ্গে অনায়াসেই তুলনা করা যায়, সে-অধ্যায়ের স্রষ্টা একমেবাদ্বিতীয়ম পঙ্কজ মল্লিক। এ-কথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। ইনি একাধারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুরু, সাধক, যথার্থ ভাবধারক। সুরের আগুন তিনি জ্বালিয়ে দিয়েছেন দীনাতিদীনেরও প্রাণে এবং সেই কারণেই 'সে আগুন ছড়িয়ে গেলো সবখানে।' এ-বইয়ের লেখা শুরু হওয়া উচিত ছিলো তাঁর মত যুগস্রষ্টা শিল্পীকে দিয়েই। অনিবার্য কারণে যা হয়ে ওঠেনি, তার জন্য সহৃদয় পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং তাঁদের ধৈর্যের প্রতি সম্মান জানিয়েই সঙ্গীতগুরুর যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ চিত্র মেলে ধরার চেষ্টা করছি। শুধু শিল্পীই নয়, এমন সরস অন্তঃকরণের অধিকারীর দর্শন কমই পেয়েছি। কারণ, তিনি হলেন সেই যুগের শিল্পী, যে-যুগে গায়ক গাইতেন আত্মপ্রকাশের দুর্বার প্রেরণায়। অকারণ পুলকের অজস্র দাক্ষিণ্যে শ্রোতাদের প্রাপ্তির করপুট পূর্ণ করে দিতেন। ব্যবসায়িক কারণে ইনি সঙ্গীতকে গ্রহণ করেননি। গান গেয়েছেন, না গেয়ে পারেননি বলে।

অন্তহীন বাধা, দাবিয়ে দেওয়া লাঞ্ছনা (কারণ গান-গাওয়া মানুষ সে-যুগের সমাজের ওপরের মহলে ছিলো অন্ত্যজ) অবজ্ঞার সকল কাঁটাকে উপেক্ষা করে বিকশিত শতদলের মত দল মেলেছিলো যে অপরূপ সঙ্গীত-ব্যক্তিত্ব, তিনিই তুলনাবিহীন শিল্পী পঙ্কজ মল্লিক।

বাংলা কাব্য সঙ্গীতের অনন্য শিল্পী পঙ্কজ মল্লিক সঙ্গীতজগতের এক স্বর্ণযুগের প্রতিভূ। দুর্লভ কণ্ঠসম্পদে ইনি কিংবদন্তীতুল্য, অতুলনীয় সুরস্রষ্টা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবগৌরব ও সুরের ঐশ্বর্যের সঙ্গে বাঙালীর তথা ভারতের পরিচয় যাঁরা ঘটিয়েছেন সেই সব দিকপাল সঙ্গীতদিশারীর একজন—এ খবর জানা ছিলো। কিন্তু এ সবের চেয়েও অনেক বড় তাঁর গভীর ভাবের ভাবুক মনটির খবর অজানাই থেকে যেতো যদি না ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৫-এর মধ্যে কয়েক বার তাঁর বাড়ি হানা দিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে জানবার সুযোগ ঘটতো।

প্রথম দিনের কথা একটু না বলে পারছি না। কারণ ব্যক্তি স্বরূপের পটভূমিকা জানা থাকলে—জনমানসের দেউলে তাঁর রবীন্দ্রচেতনার লক্ষ প্রদীপ জ্বালানোর যাদুকরী ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ করা সহজ হবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে পঙ্কজবাবু যেন ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। আত্মগত ভাবে বলে চললেন, ঊনবিংশ শতাব্দী সর্বদিক দিয়েই ভারতের গৌরবময় যুগ—হোক না সেটা পরাধীন ভারত। সে যুগেই বিরাট মনীষী, নাট্যকার, সমাজ-সংস্কারক, দেশপ্রেমিক তপস্বীর আশ্চর্য আবির্ভাব ঘটেছে—। এবং এই যুগেই ভারতের রবি-র জন্ম।

রবীন্দ্রনাথের উপাধি কি ছিলো জানো?

ঠাকুর।

সে অনেক পরে। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন কুশারী—এই কুশারীরাই হলেন ঠাকুর। আর এই ঠাকুর পরিবারের কুলোত্তম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি হলেন ভানু সিংহ—যিনি সবুজ মনের মধুর আবেগ দিয়ে পদাবলীর গহন-কুসুম-কুঞ্জ মাঝে মধুর বংশী বাজিয়েছেন।

এতগুলো কথা বললাম শুধু এইটুকুই বোঝাতে যে, রবীন্দ্রনাথ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। প্রেম তাঁর মজ্জায়। তাই গাছপালা, আকাশ, ফুল, লতা—সবকিছুর ওপরই তাঁর এত প্রেম, এত ভালবাসা। এদের ভাষা তিনি শুনতে পেতেন। এরা তাঁর কাছে রীতিমত জীবন্ত ছিল। বিশ্বপ্রেমিক? উঁহু, বিশ্বপ্রেমিক বললে কিছুই বলা হয় না। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুপরমাণুর সঙ্গেও তিনি একাত্ম। তাই সকলের বেদনা এমন বাস্তব হয়ে উঠেছিলো তাঁর অনুভবলোকে। আর এই অনুভবেরই আশ্চর্য প্রকাশ হয়েছে তাঁর গানে, কারণ কথা ও সুরের এমন মিলন কবি ও সুরকারের এমন সমন্বয় 'রবীন্দ্রনাথ' না জন্মালে আমাদের ধারণায় আসত না।

শান্ত, মুক্ত, করুণাঘনর কাছে ধরণীতলকে কলঙ্কশূন্য করার কাতর প্রার্থনায় তিনি কতবার কতভাবেই না উচ্ছল হয়ে উঠেছেন—সেই বৈষ্ণব রবীন্দ্রনাথকে এই মরমী শিল্পী চিনেছিলেন শুধুই দুর্লভ শিল্পচেতনা ও কল্পনার মহত্বেই নয়। যদিও তাঁর শিল্পীব্যক্তিত্বের একটা বিরাট অংশ অধিকার করে আছে এই দুটি বস্তু। কিন্তু তারচেয়েও বড় হলো যে সত্যটি সেটি হলো এই যে, পঙ্কজবাবু নিজে বৈষ্ণব ভাবানুরাগী এবং সেইজন্যই অনুভবের এই দিব্যদৃষ্টির অধিকারী। কিসে মনে হলো? তারই উদাহরণ দিচ্ছি তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রথম দিনের একটা ঘটনার ছবি দিয়ে।

বলেছিলাম, আমায় "আপনি" বলবেন না।

সরস মানুষটি অমনই মুখর হয়ে ওঠেন, জানো মা একদিক দিয়ে বিচার করলে 'তুমি'র চেয়ে আপনি বেশী আপন। ইংরিজিতে সুবিধে আছে 'ইউ' বলতে তুমি আপনি দুই-ই বোঝায়। কিন্তু বাংলাতে দুটোর তফাত আছে। শোভাবাজারে রাজা অসীমানন্দর ওখানে একদিন সবাই বসে আড্ডা দিচ্ছি। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কথা উঠলো। উনি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ'

বলছ কেন ? কৃষ্ণবাবু বলতে পারছ না ? তার কি একটা সম্মান নেই ? ওঁর গম্ভীর ভঙ্গিতে কথা বলার ধরনে সবাই হেসে উঠলাম। সত্যিই দেখ, বাড়ির ছোট ছেলের নাম যদি 'গোপাল' হয়, আমরা ত তাকে আদর করে 'গোপালবাবু' বলেই ডাকি। অতএব বয়সে ছোট হলেও তোমায় 'আপনি' বলে বেশী আপনার ভেবেছি এটাই বা কেন মনে করছ না ?—বলেই তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের হাসিতে সারা ঘর ভরিয়ে দিলেন। এ-হাসির ধ্বনিতে তাঁরই গাওয়া কোন একটি গানের সুরের মিল খুঁজে পেলাম। কোন গান ? কোন গান ? মনে পড়েছে—

সে সোনার আলো
শ্যামলে মিশালো
শ্বেত উত্তরী আজ কেন কালো ?

মনে হলো এঁর সঙ্গে যেন কতকালের চেনা।

বড় শিল্পীর সংস্পর্শে যখনই এসেছি, অনুভব করেছি তাঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যেন কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণী শক্তি আছে যা অপরিচয়ের দূরত্বকে এক লহমায় উড়িয়ে দেয়। মানুষের মনকে কাছে টানার শক্তি নিয়ে জন্মান বলেই কি এঁরা শিল্পী ? না, শিল্পীকে মানুষ সহজেই আপনার ভাবতে পারে ? কে জানে ?

···যাক যা বলছিলাম—নিজে যথার্থ বৈষ্ণব মনের অধিকারী বলেই পঙ্কজ মল্লিক বৈষ্ণব রবীন্দ্রনাথকে চিনেছিলেন এবং সেই কারণেই কবির গানের আনন্দ-বেদনার সুর তাঁর গানে এমন গভীর রবে বেজেছে। আর সেই কারণেই আজকের দিনের শ্রোতারাও তাঁর কাছে শ্রদ্ধায় নতজানু। এই ত গত রবিবারের কথা। রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবে সেদিনের গানের আসরের শেষ শিল্পী পঙ্কজ মল্লিক আসেননি বলে শ্রোতাদের কি মনস্তাপ। আরে দূর মশাই, পঙ্কজ মল্লিক আসবেন না আগে বলেননি কেন ? তাহলে এতক্ষণ বসে থাকতাম না ?

···প্রশ্ন করলেন, কি জানতে চাও মা ? লাইফ স্কেচ ?

না না—ওসব নয়। শিল্পী-হৃদয়ের আনন্দ-বেদনার দোলা, এককথায় আই ওয়ান্ট টু নো জাস্ট দি ফিলসফি অফ ইওর মিউজিক ?

ফিলসফি অফ মিউজিক—কথাটা মন্ত্রের মত কাজ করলো। ঐ একটি কথাতেই তাঁর হৃদয়ের আবেগ যেন সহস্রধারে ঝরে পড়লো। মানুষটি শুধু গানই গান না। সঙ্গীতশাস্ত্র এমন গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছেন, বেদ-পুরাণের অতলে মনটা এমন-ভাবে ডুবে আছে যে কাছে না এলে টের পেতাম না। সেই প্রসঙ্গে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেললেন। আর সেই আত্মহারা মানুষটিই তাঁর স্বরূপকে যেন ছবির মত চোখের সামনে মেলে ধরলেন। সকাল দশটা থেকে বেলা একটা অবধি তিনি বলে গেলেন কত কথা, কখনও গানে কখনও সুন্দর স্তোত্রে। শুনলাম সুন্দর কবিতার আবৃত্তিও। কারোরই হুঁশ ছিলো না। জীবনে এক-একটা মুহূর্ত আসে যখন মানুষের অন্তর-

লোকের সেই ঘুমন্ত সত্তাটি যেন জেগে ওঠে, প্রতিদিনের জীবনের অতি-পরিচিত মানুষটার চেয়ে যে আলাদা। পঙ্কজবাবু শুধু শিল্পী নন। সঙ্গীতশাস্ত্রে তিনি পণ্ডিতও। কিন্তু সেদিনের হঠাৎ-জ্বলে ওঠা আলোয় তাঁর সেই শিল্পীমানস যেন রঙে, রসে উচ্ছল হয়ে উঠলো তাঁর সবকিছুকে এমনকি পাণ্ডিত্যকেও ছাপিয়ে।

সেসব কথা তেমন করে বলবার যোগ্যতা বা ক্ষমতা কোনোটাই আমার নেই। শুধু তার মর্মবস্তুকে যতটা সম্ভব মেলে ধরবার চেষ্টা করব। অ-ধরাকে ধরার আকুতিই ত সুন্দরের আরাধনা।

বড় ভাল কথাটা বলেছ মা! কিন্তু হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন মনে জাগলো?

জাগলো এই জন্য যে আপনি এবং আপনার ট্রেনিং-এ কতদিন আগে আপনার সতীর্থ শিল্পীরা গেয়েছেন যেসব গান, সেইসব গানের রেকর্ড শুনলে মনটা আজও দুলে ওঠে। মনে হয় গানের কাছে মানুষ যা চায় তা পাওয়া গেলো। সেইসব রেকর্ড হবার পর কত বছর কেটে গেছে। টেকনিকের কত উন্নতি হলো, শিল্পীরা সেদিনের চেয়ে আজ কত বেশী সম্মানিত।

শিক্ষার কত সুযোগ, আত্মবিকাশের বহুধাবিস্তৃত ক্ষেত্র, শিক্ষিত সু-কণ্ঠেরও অভাব নেই। তবু কই, মন তো তেমন করে ভরে না! সে-ছন্দটি ত তেমন করে মনের তারে বেজে ওঠে না—যেমন বেজে উঠত আপনাদের গানে?

সঙ্গে সঙ্গে যুক্তকরে নমস্কার করে তিনি বললেন, আমাদের মত সামান্য শিল্পীদের তোমরা নবীন যুগের মানুষেরা মনে রেখেছে, সেজন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। তুমি প্রশ্ন করলে—তাই বলছি, আমায় যেন কেউ ভুল না বোঝেন। গানের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে সৌন্দর্যবোধ, যার অভাবে গান হয় নিষ্প্রাণ। এই সৌন্দর্যবোধ বস্তুটি কি? না, কথার ভাবের সঙ্গে সুরের যথাযথ মিলন ঘটছে কিনা সেই অনুভব। নবরসের কোন রসটি গানকে রঞ্জিত করছে সেটি লক্ষ্য করা। এই লক্ষ্যটি আয়ত্তে এলে গানে প্রাণ আসবেই। ধরো, একবার কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য কয়েকজন শিল্পীকে আমি একটি গান শেখাতে চাইলাম—'প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ী মানমনি-দানম।' তাঁরা যখন সুর তুলছেন তখন তাঁদের গলার সূক্ষ্মতা, কাজ আমায় এত মুগ্ধ করেছিলো যে, মনে হয়েছিলো আমি কি শেখাবো? আমিই ত এঁদের কাছে বসে শিখতে পারি। কিন্তু কথার দিকে কারো লক্ষ্য নেই। তার ফলে গানটিতে যথাযথ রসসঞ্চার হচ্ছে না। আমি কত বোঝাচ্ছি—কথাটা হচ্ছে মানম+অনিদানম—কিন্তু এই সহজ অর্থটা কারো চোখেই পড়ছে না। এইটুকু যদি ঘটতো, তবে গানের চেহারাই বদলে যেতো। তাই এঁদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, এঁরা শুধু সুরের দিকে মনকে নিবিষ্ট না রেখে কথার অন্তরে প্রবেশ করবার দিকেও যেন মন দেন। অন্তত গান যিনি রচনা করবেন তিনি যেন গানের ভাববস্তুটি এঁদের মর্মগোচর করেন। গানের বক্তব্য তাঁর পক্ষেই পরিস্ফুট করা সম্ভব যিনি গান রচনা করেন। আমাদের

শাস্ত্রে একটি শ্লোক আছে—

কবিতারসমাধুর্যম কবির্বেত্তি ন তৎ কবি
ভবানী ভ্রূকুটিভঙ্গি ভবর্বেত্তি ন (তৎ) ভূধর।

ভবানী-ভ্রূকুটির অর্থ একমাত্র তাঁর কান্ত শঙ্করই বোঝেন। ঠিক তেমনই কোনো কবিতার রসমাধুর্য তাঁর স্রষ্টারই উপলব্ধির বস্তু—অপরের নয়।

তারপর সায়গল এবং কানন দেবীর শিল্পবোধের যে চিত্তগ্রাহী চিত্র মেলে ধরলেন সে-সব তাঁদের. প্রসঙ্গে বলব—পরে,—যথাস্থানে। অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই একটি কথার উল্লেখ করছি—শাস্ত্রে বলে 'নমন্ত্রম অক্ষর নাস্তি'—এমন কোনো অক্ষর নেই যা দিয়ে মন্ত্র রচনা হতে পারে না। অপেক্ষা শুধু যোগাযোগের। এই যোগাযোগ কাননের শিল্পীজীবনে ঘটেছে। তারপর আত্মগতভাবে বলতে লাগলেন, সঙ্গীত জিনিসটা এমন যে, সত্যিকারের সঙ্গীত মানুষের স্বভাব, প্রবৃত্তি বদলে দিতে পারে। একটা মজার গল্প শোনো—

একবার এক ব্যাধ হরিণবধ করবার জন্য এক হাতে বীণা, আর এক হাতে তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়েছে। তার বীণার সুরে আকৃষ্ট হয়ে হরিণ যেই না তার কাছে এলো অমনই সে ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করে তাকে বধ করলো। মরণাহত হরিণ তখন ব্যাধকে বলছে—

ফর্, ফর্, ফর্, ফর্ পত্তি হিলে
ওড়ি সিংহল দ্বীপ,
তেরে বীণাকি রবসে
মেরা শির কিয়া বখশিস।
শির কাটো কাটারা বানাও
গোস মেরা খাও,
তুম মেরা মৃগচর্মপর বৈঠকে
হরদম বীণা বাজাও।

চকিতের মধ্যে ব্যাধের ভেতরটা যেন তোলপাড় হয়ে গেলো। মৃগয়ার মত্ততা রূপান্তরিত হলো বিষণ্ণ বৈরাগ্যে। সে বলল—

কেয়া বাজায়ুংগে বীণা
টুট গয়ে সব তার,
যব ঐসে শুনলেওয়ালা চল গয়ে
কেয়া বীণা বাজায়ুংগে আর।

এই হলো সঙ্গীত আর এই আমার ফিলসফি অফ মিউজিক।

সঙ্গীতের ওপর অনুরাগ জন্মালো কেমন করে? তখনকার দিনে ত সঙ্গীতের এমন বহুধা-বিস্তার ছিলো না?

তখন স্কুলে পড়ি। গান ভালো লাগত। রেকর্ড থেকে, এখান-ওখান থেকে গান তুলতাম, গাইতাম। সবাই জানতো এ ভালো গায়।

পাবলিকের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে গাইলেন কবে?

সে লজ্জার কথা বোলো না মা। এখনও মনে পড়লে গ্লানি আসে। পঞ্চম

জর্জের জুবিলী উৎসবের সময়। স্কুলের এক পণ্ডিত বোধহয় রাজাকে খুশি করবার জন্যই গান রচনা করলেন—'হে ভারত আজি রাজার চরণে ভকতি কররে দান।' ছিঃ ছিঃ! কত বড় মূর্খতা দেখেছ? মাকে বলছি বিদেশীর পায়ে ধরতে। সে লজ্জাকর অধ্যায় স্মরণে আনতেও কষ্ট হয়। —বলার পর অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে চুপ করে রইলেন স্পর্শকাতর শিল্পী।

সুরসৃষ্টির প্রেরণা এলো কেমন করে?—মৌনতা ভেঙে আমিই আবার প্রশ্ন করি।

যখন রথের সময় রথ বেরোতো সবাই মিলে আনন্দ করে তার সঙ্গে যাওয়া হতো। সেই সময় নানারকম কথা ও কবিতার মালা গেঁথে উচ্ছ্বসিত আবেগে গাইতাম। তার কাব্যমূল্য কতটা ছিলো জানি না। সঙ্গীত-শিক্ষা শুরু হয়েছিলো শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (চলচ্চিত্রশিল্পী কিন্তু নন) কাছে, তেরো বছর বয়স থেকেই…

মনে হচ্ছে আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলেন। সুরসৃষ্টির প্রেরণার খবরটা ঠিক পেলাম না।

মৃদু হেসে বললেন, ধরেছ।*প্রেরণা বলতে যা বোঝায় সে-ত এক দৈব যোগাযোগ। সেই শুভলগ্ন জীবনে এসেছিলো একবার তখন সেকেন্ডে ক্লাশে পড়ি। একদিন দুপুরে গণেশ পার্কের কাছে বসে আছি, হঠাৎ—উনি একটু থামতেই আমি উৎসুক হয়ে উঠলাম। কিন্তু উনি থেমে গেলেন। কি ভেবে বললেন, না, সে-কথা বলবার সময় এখনও আসেনি মনে হচ্ছে। বলব একদিন, ঠিক বলব। সময় আসুক।

জোর করলাম না। যে শুক্তি ছোট্ট একটি মুক্তোকে অন্তরের গভীরে লুকিয়ে রাখতে চায়, কৌতূহলের তাড়নায় তাকে ভেঙে সেই মুক্তোটিকে টেনে বার করে দেখবার নির্মম প্রবৃত্তি হলো না। পরে সময় এসেছিলো আমায় বলেওছিলেন (১৯৬৯-এ)। সে-কথা আমার জানানোর সময় এলো আজ।

কিন্তু সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে বলি, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গান শিল্পীর জীবনে এলো কেমন করে।

তখন প্রধানত গানের টানেই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে আমার যাতায়াত ছিলো। সেইখানেই 'পদপ্রান্তে রাখ সেবকে,' 'চরণ ধরিতে দিও গো'—গানগুলি শুনে শুনে আপনমনে গাইতাম। কিন্তু মন ভরতো না। ইচ্ছে করতো খুব ভালো করে রবি ঠাকুরের ভালো ভালো গান (তখনও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিভাষার সৃষ্টি হয়নি) শিখি কার কাছে? কে তাঁর রত্নভাণ্ডারের দুয়ার খুলে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে কবির সেই আশ্চর্য সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে?

তখনই এই মহলের ওয়াকিবহাল লোকদের কাছে শুনলাম দীনুবাবুর (দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) নাম। কি করে তাঁর সংস্পর্শে এলাম? সে এক মজার ঘটনা।

প্রথম-মহাযুদ্ধ শেষ। শিশিরবাবু নাট্যসংস্থা খুলেছেন। ইডেন

গার্ডেনেরই এক কোণে অভিনীত হচ্ছে তাঁর 'সীতা' নাটক। এই 'সীতা' দেখতেই একদিন বাড়ির সবার (মা, বাবা, কাকা) সঙ্গে গেলাম ইডেন গার্ডেনে। 'সীতা' নাটক অনেক সুন্দর সুন্দর গান ছিলো। গানগুলি জনপ্রিয়ও হয়েছিলো। 'অন্ধকারের অন্তরেতে', 'জয় সীতাপতি'-ইত্যাদি অনেক গান।

সুরস্রষ্টা হিসাবে নাম দেখলাম গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—দেখতে দেখতে চোখ পড়ল দীনু ঠাকুর নামটির ওপর। যে গানটির সুর তিনি দিয়েছিলেন সেটি হল—'মঞ্জুল মঞ্জরী নব সাজে'—সর্বদা মনে মনে জপ করতাম। দীনু ঠাকুর, দীনু ঠাকুর। রবি ঠাকুরের গানের ভাণ্ডারী তিনি, তাঁর কাছে পৌঁছলে কবির গান পাওয়া যাবে অঞ্জলি ভরে। সেই আকর্ষণেই বোধহয় মন দিয়ে গানটি শুনলাম এবং তুলেও নিলাম। স্বপ্ন দেখা কিশোর মন ঐ গানের সুরকারকে ঘিরে কত কল্পনার জাল বুনে চললো!

এই ঘটনার কিছুদিন বাদে খবর পেলাম দীনুবাবু এসেছেন এবং জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আছেন। নিজের মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে হাজির হলাম। সামনে দাঁড়িয়ে ধাঁধায় পড়ে গেলাম। তিনটি বাড়ির কোনটিতে দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আছেন? দরোয়ান দেখিয়ে দিল। বলল, উপরমে। ঠাকুরবাড়ির নামেই মনের মধ্যে একটা স্বপ্নলোক রচিত হয়ে উঠেছিল। ও-বাড়ি হল রূপের রাজত্ব। বুক দুর দুর করছে। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে দোতলার বারান্দায় পৌঁছলাম। বারান্দার মাঝখানেই একজন বসে। ঠাকুরবাড়ির মানুষের সম্বন্ধে মনে আঁকা ছবির সঙ্গে তাঁর কোন মিল নেই। তাঁকেই জিজ্ঞেস করলাম, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে কি?

কি দরকার? বজ্রগম্ভীর কণ্ঠের জবাব এলো।

তখন ভয়ে, লজ্জায় গলা বুজে আসছে। কপাল দিয়ে আবার টপ টপ করে ঘাম ঝরতে শুরু করেছে। প্রাণপণ শক্তিতে মনে সাহস এনে পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাড়মুখ মুছে ঢোক গিলতে গিলতে বললাম, আজ্ঞে আমি গান, মানে রবি ঠাকুরের গান শিখতে চাই।

তুমি গান গাও?

উত্তরে কি বলব ঠিক বুঝতে পারলাম না। কি বললে খুশী হবেন, কি বললে রাগ করবেন কে জানে? চটে গেলে যদি গান শেখাটা মাঠে মারা যায়?

গম্ভীর কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হল, শোনাও একটা গান?

আজ্ঞে হারমোনিয়ম?

ওঃ! হারমোনিয়ম ছাড়া বুঝি গাইতে পারো না?

পারি, তবে—

গাইলাম। ওঁরই সুর দেওয়া 'মঞ্জুল মঞ্জরী নব সাজে'—গান শেষ হবার

পর জিজ্ঞেস করলেন—এ গান কোথা থেকে শিখলে ?

আজ্ঞে সীতা নাটক দেখতে—

তুমি থিয়েটার-দ্যাখো ? প্রায় গর্জে ওঠেন দীনু ঠাকুর। তখনকার দিনে ছোটদের থিয়েটার দেখা কেউ ভাল চোখে দেখতেন না। আমার চোখের সামনে যেন অন্ধকার নেমে এল। এইরে! তীরে এসে বুঝি তরী ডুবল। আমি শশব্যস্ত হয়ে বললাম—আজ্ঞে আমি যাইনি। মা-বাবা-দাদার সঙ্গে গিয়েছিলাম। সেখানেই।

মানে ঐ থিয়েটার দেখতে গিয়েই সেখানের কোনো দৃশ্যে গান শুনেই ত তুলেছ ?

হ্যাঁ…তবে আমি যাই নি, আবার কাঁচু-মাচু হয়ে বলি, মা-বাবা দাদার সঙ্গে—অন্তরাল থেকে নারী কণ্ঠে খিল খিল হাসির শব্দ শোনা গেল। কাছে পিঠে কোথাও রমাদেবী বোধহয় ছিলেন আর পুরো দৃশ্যটি উপভোগ করছিলেন কৌতুকভরে। সেই হাসি শুনে আমি আবার ঘামতে শুরু করলাম।

তারপর দীনু ঠাকুরের নির্দেশে রমাদেবীই গীতাঞ্জলি নিয়ে এলেন। গীতাঞ্জলিখানা খুলে ধরে একটা কবিতা আমায় পড়তে বললেন। 'হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে।' পড়লাম। কিন্তু কেমন পড়েছিলাম, কিংবা আদৌ পড়তে পেরেছি কিনা—সে সম্বন্ধে আজও আমি সন্দেহমুক্ত নই। শুনেছিলাম ঠাকুরবাড়ি পরীর রাজত্ব। সেই কথাটা মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি নি। পড়তে পড়তে কেবল মনে হচ্ছিল অন্তঃপুর থেকে ডানাকাটা পরীরা সব মুখ টিপে হেসে আমার কম্পিত কণ্ঠের আনাড়ি উচ্চারণের পাঠ শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছেন।

পড়া শেষ হল। দীনুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ভুবন মানে কি ?

আমার তখন স্মৃতি একেবারেই বিলুপ্ত। ভুবন মানে বলতে পারলাম না। অপরূপা অন্তঃপুরিকাদের কল্পিত কৌতুকী হাসির হুল অনুভব করে কান গরম হয়ে উঠল।

এর পর ঐ গানটিই শেখাতে শুরু করলেন। একবার গেয়ে বললেন—গাও—

আজ্ঞে…এ বলে মাথা চুলকোচ্ছি।

থিয়েটারে ত শুনেই মঞ্জুল মঞ্জরী শিখেছিলে ? না কি ?

আমি আবার ব্যাকুল হয়ে বলতে থাকি, আজ্ঞে থিয়েটারে আমি যাই নি। মা-বাবা দাদার সঙ্গে…

থিয়েটারে গানটা ক'বার শুনেছিলে ?

আমি প্রায় নতজানু হয়ে আবার বলি, আজ্ঞে সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন আমি থিয়েটার দেখতে যাইনি। মা-বাবা দাদার সঙ্গে—

এতক্ষণে বোধহয় ওঁর করুণা হলো। এবার নরম সুরে বললেন, আমি মানছি। বুঝতে পেরেছি তুমি মা-বাবা দাদা-দিদির সঙ্গেই গেছ। কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, ওখানে তুমি গানটা ক'বার শুনেছিলে আর কত দূর থেকে ?

এবার একটু ভরসা পেয়ে বললাম, আর একবার শুনলেই গাইতে পারব।

এর পর একবার নয়। বেশ কয়েক বারই উনি গাইলেন। তারপর আমিও গাইলাম। সেই প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা এবং যথার্থ গুরুর কাছে। এর পর থেকে উনি যখনই কোলকাতায় আসতেন—খবর দিতেন—আর খুব যত্ন করে আমায় কবির গান শেখাতেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের আগে অন্য গানও ত গাইতেন এবং পরেও গেয়েছেন। সব গানই আপনার কণ্ঠে যেন আশ্চর্য মায়ালোক হয়ে উঠেছে। তবু সব ছাপিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতই আপনার হৃদয় জুড়ে রইল কোন সম্পদে ?

আকাশচারী ভাবের ঐশ্বর্যে।

রবিঠাকুরের গান শোনবার বা গাইবার আগে যেসব গান গাইতেন তার মধ্যে ঐশ্বর্য ছিল না ?

ঐশ্বর্য নিশ্চয়ই ছিল তবে এ ঐশ্বর্য ছিল না।

এ ঐশ্বর্যের খবরটাই ত আপনার মত ঐশ্বর্যবানের কাছে শুনতে চাই। কোন অনুভব, কোন ধ্যান আপনার ভাবুক চিত্তকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পথে টেনে নিয়ে গেছে ?

তখন গান শোনা ত সাধারণত নাটক-থিয়েটার এসব থেকেই। আসরের গান বলতে বেশীর ভাগই ছিল নিধুবাবুর টপ্পা। তিনি প্রচণ্ড শক্তিমান প্রতিভা—এবং বিশেষ পরিবেশ, বিশেষ শ্রেণীর শ্রোতার কাছে তাঁর মধুর রসাশ্রিত গান জমে উঠত। আর নাটকে নজরুলের গান, ভক্তিমূলক এই সবই চলত। বেশীর ভাগ গানই বিশেষ অর্থবহ এবং বিশেষ উদ্দেশ্যেই গাওয়া হত। কাজেই বাঁধাধরা সীমার মধ্যেই তার প্রয়োজন এবং আয়ু শেষ হয়ে যেত। এই সীমাবদ্ধতা, এতটুকু গণ্ডীর মধ্যে ঘোরাফেরার সংকীর্ণতা মনকে বড় পীড়া দিত। গান গেয়ে তৃপ্তি হত না, সব সময় এতটুকু সীমার পরিসর অতিক্রম করে সীমাহীন ভাবের আকাশে মুক্তি পাবার জন্য মনটা ছটফট করত।

কিন্তু একটি কথা বলে রাখি মা, আমাকে যেন কেউ ভুল না বোঝেন—আমি কোন গান বা তার রচয়িতাকে ছোট করছি না। সকলেই সুন্দরের পূজারী। আমার মনটা সঙ্কুচিত হয়ে যেত এসব গানের উদ্দেশ্যবহতার কারণে। কারণ বেশীর ভাগ গানই নাটকের প্রয়োজনেই লেখা তা বুঝেছ ?

বোধহয় বুঝেছি। কবির নিজের ভাষাতেই রয়েছে এর উত্তর —

মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রি-দিন।
মানুষের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।
ধূলি ছাড়ি একেবারে ঊর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সঙ্গীতের মতন স্বাধীন।

ঠিক হয়েছে ?

একেবারে ঠিক। খুশীতে শিল্পীর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সঙ্গীতের মতন স্বাধীন কথাটা লক্ষ্য করেছ মা ? যে স্বাধীনতা মানুষ প্রতিদিনের

জীবনে পায় না, সমাজে পায় না, সংসারে পায় না সেই স্বাধীনতা খোঁজে সঙ্গীতে। এখানে স্বাধীনতা মানে মুক্তি। তথাকথিত স্বাধীনতার অধিকারী হয়েও আমাদের মনটা নিজেরই গড়া নানান বন্ধনে জড়িয়ে থাকে। সকল বন্ধনমুক্ত হয়ে এক অন্তহীন আনন্দের আকাশে—মেঘের দোসর হয়ে 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' বলবার কল্পনাও কি করতে পারতাম যদি এই ভারতেই এমন সর্বগামী মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ না জন্মাতেন? মানুষ, প্রকৃতি জীব সব কিছুকেই ভালবেসেছেন বলেই সবকিছু থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছেন। এই প্রেমিক ও মুক্ত মন নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন এবং পরিণত বয়সে পৌঁছবার আগেই তাঁর মন পরিণতির তীরে এসে দাঁড়িয়েছিল। একটি উদাহরণ দিই শোন। তাঁর এই বৈষ্ণব মনকে মহর্ষি চিনেছিলেন। তাই একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করেছিলেন তাঁকে সংস্কৃত রসশাস্ত্র পড়াবার জন্য। তখনও কবি বয়সে কিশোর। একদিন খুব বৃষ্টি পড়ছে। তখনও পণ্ডিত এসে পৌঁছন নি। জোড়াসাঁকোর বারান্দায় বসে সেই স্বপ্নবিভোর কিশোর একমনে আবৃত্তি করে যাচ্ছে—

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে,—
পততি পতত্রে···পততি পতত্রে

ক্রমাগত মন্ত্রমুগ্ধের মত বলে যাচ্ছে। ঐ ক'টি শব্দে ধ্বনিমাধুর্যের মধ্যে যে সঙ্গীত আছে, যে হৃদয় ছোঁওয়া ব্যঞ্জনা আছে তারই মধ্যে ভাবীকালের মহাকবি যেন ডুবে গেলেন। তাঁর চারপাশের জগৎ, জীবন ও পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে কোন হুঁশ নেই। হঠাৎ কাঁধের ওপর কার টোকার স্পর্শে চমকে উঠে পিছন ফিরে দেখলেন দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ এক বুক স্নেহ নিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অনেকক্ষণই দাঁড়িয়েছিলেন। দেখছিলেন এবং শুনছিলেনও সেই মন্ত্রোচ্চারণের মত আবিষ্ট আবৃত্তি। তারপর যেন আপন মনে নিজেকেই উদ্দেশ করে বললেন এই জন্যই বাবামশাই এই বয়সেই তোকে গীতগোবিন্দ পড়াবার ব্যবস্থা করেছেন। বুঝলে মা এইসব কাব্যে নায়িকার রূপ বর্ণনায় দেহগত বাসনা কামনার বিহ্বলতাকে অতিক্রম করে একটা অপার্থিব রূপলোকে পৌঁছবার মত মন তাঁর সেই বয়সেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল। কারণ এ মন তাঁর এই এক জন্মের নয়। জন্ম-জন্মান্তরের। সে সাধনার সম্পদই হোক আর বিধিদত্তই হোক এই মন নিয়ে জন্মেছিলেন বলেই আপনার সীমিত আবেষ্টনীর মধ্যে মানুষ যেটুকু দেখতে পায় তিনি তারচেয়ে অনেক বেশী দেখতে পেতেন। আর তাঁর এই দিব্যদৃষ্টির প্রসাদেই গড়ে তুলেছিলেন এমন এক মহাবিশ্ব যার মধ্যে মানুষের কোন অনুভব আবেগ ও হৃদয়ের ক্ষুদ্রতম স্পন্দনও হারায় না।

বিপ্রলব্ধ ও সম্ভোগের চারটি করে পর্যায় এবং তার চারটি করে সাব-ডিভিশনের সব ক'টিতেই ছিল তাঁর মানসবিহার। সেই জন্যই যে যা চায় সবই পায় তাঁর কাব্যে, সাহিত্যে আর তাঁর ধ্যানকল্পনার চরম বিকাশ তাঁর গান। তাই ত তাঁর অন্তর্ধান ঘটবার পর তাঁর গানই হয়ে উঠল এমন

সর্বব্যাপী।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। অনেকেই রবীন্দ্রনাথের সুখ-দুঃখ, ভালবাসা, বেদনার অনুভূতিকে ইম্পার্সোন্যাল বলে মনে করেন। কিন্তু এ ধরনের কথা শুনলে আমার মনটা খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ নন। যেমন ধরুন—'আজ তোমাকে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে' গানটিতে সুন্দর একটা হিউম্যান টাচ আছে না? যার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে বেশ নিজের লোক, নিজের লোক মনে হয়? কিন্তু ইম্পার্সোন্যাল ইত্যাদি কথাগুলো যেন সেই ধারণাকে আঘাত করে। এর কি করা যায়?

আঘাত পাবার কোন কারণ নেই। তিনি কোন অনুভব, কোন রসেরই বাইরে নন। তিনি রস, সঃ এব রস। রসের মধ্যে ডুবে থাকতেও জানেন আবার রসোপভোগের মধ্যেও নিস্পৃহ হতে জানেন। তিনি যে ভগবান। তাই তিনি পার্সোন্যাল হয়েও ইম্পার্সোন্যাল, আবার ইম্পার্সোন্যাল হয়েও পার্সোন্যাল। ভাব হতে রূপে তাঁর অবিরাম যাওয়া আসার লীলাই ত তাঁর সৃষ্টি।

কিন্তু অসীম অনন্তে উত্তরিত হয়েও তাঁর মনে একটা অশান্তি ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর জগৎ তাঁকে ভুলে যাবে। তাই তিনি নির্মোহ হয়েও পৃথিবীর কাছে চেয়েছিলেন একটি মাটির তিলক।

তাই ত চাইবেন। ভগবানের ত কোন কিছুরই অভাব নেই মা। তবু ত বার বার এই মাটির পৃথিবীতে ফিরে আসেন। কখনও বা কলসীর কানার আঘাত পান। কখনও ক্রুশবিদ্ধ হন! ত্রিভুবনের অধীশ্বর মানুষের কাছে ভালবাসার মুষ্টিভিক্ষা চান। কারণ মানুষ যে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের। 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।'

আপনি লোকচক্ষুর আলোয় এলেন কেমন করে?

রেডিওর মাধ্যমে। এখনকার এ আই আর শৈশবে ছিলো ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি। এই ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির চার-পাঁচ মাস বয়স থেকেই আমি রেডিও অফিসে যোগদান করেছিলাম।

আপনিই ত ছায়াছবি ও সঙ্গীত শিক্ষার আসরের মাধ্যমে কবির সুরের আগুনকে সবখানে ছড়িয়ে দিলেন—সেই অধ্যায়ে একটু দাঁড়ান না? আপনার মুখে সেই কাহিনী শোনবার জন্য পাঠকরা উৎসুক হয়ে রয়েছেন—

আমি জনপ্রিয় করেছি একথা ভাববার স্পর্ধা আমি রাখি না। তাঁর গান গাইবার এবং শেখাবার অধিকার যাঁরা আমাকে দিয়েছেন, এ-গৌরব তাঁদেরই প্রাপ্য।

হ্যাঁ, ১৯২৯ থেকে সঙ্গীতশিক্ষার আসরে যোগ দিলাম। বললে অহঙ্কার মনে হবে, কম্পিটিশন ইত্যাদির তাগিদে সাধারণের মধ্যে গানের প্রেরণাও জাগলো। কিছু শিল্পীও তৈরী হলো। আজ সঙ্গীতশিক্ষার আসরের বয়স ৪৬ বছর। ১৯৩২ সালে প্রথম রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে চৌত্রিশখানা গান

নির্বাচন করি বিভিন্ন শিল্পীকে দিয়ে গাওয়ানোর জন্য। তখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে তবলা বাজতো না। আমি জিদ করে তবলা ও পাখোয়াজের সঙ্গতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার প্রথা প্রচলন করলাম। রবীন্দ্রনাথ হলেন ছন্দের সম্রাট অথচ তাঁরই গানের সঙ্গে তবলা বাজবে না? এ আবার কোন সৃষ্টিছাড়া কথা?

তালবন্ধ গান গাওয়া হতো কেন?

জোড়াসাঁকোর কাছাকাছি ছিলো চিৎপুরের কুখ্যাত পল্লী। সেইসব জায়গায় তবলা বাজিয়ে গান গাওয়া হতো। সেইজন্য তবলার সঙ্গে গান গাইতে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের আপত্তি ছিলো···

যাই হোক ঐ চৌত্রিশখানা গানের মধ্যে তেত্রিশখানা তবলা এবং পাখোয়াজের সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পীরা গেয়েছিলেন। শুধু কনক বিশ্বাস তবলার সঙ্গে গাইতে রাজী হননি। তিনি বিনা সঙ্গতেই গেয়েছিলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রজয়ন্তী নাম দেওয়া হয়েছিলো বলে রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন কবি আসেন নি। এসেছিলেন তার পরের দিন। এ-ধরনের আত্মপ্রচারে তাঁর রুচি ছিলো না।

কবিগুরুর সংস্পর্শে এলেন কেমন করে?

দীনুবাবুর কৃপায়। ১৯১৮ সাল সেটা। আনন্দ পরিষদ বলে একটা প্রতিষ্ঠান প্রথম রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস মঞ্চস্থ করে। 'চোখের বালি' বই হবে। তারই একটি গানে 'কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে'—আমি সুর দিয়েছিলাম। দীনুদা বললেন, চল, গুরুদেবকে শুনিয়ে আসবি। ওঁরই সঙ্গে গেলাম শোনাতে গুরুদেব চুপ করে শুনলেন—তারপর আপনমনে একটি গানের সুর ভাঁজতে লাগলেন। আমরা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পরেও অনেকবার গেছি ছায়াচিত্রে কবির গান প্রয়োগের অনুমতি ভিক্ষা করতে।

বলুন না সেই কাহিনী।

মুক্তি শুরু হয়েছিলো, ১৯৩৪-এ। নিউ থিয়েটার্স তখন তিন বছরের। এই তিন বছরে যে কয়েকখানা ছবি হয়েছিলো, আমি সুর দিয়েছিলাম। কিন্তু যেহেতু আমি মিউজিক ডিরেক্টর ছিলাম না, আমার নাম প্রকাশিত হতো না।

এ অবিচার বড়ুয়া দেখেছিলেন। 'মুক্তি' করবার পরিকল্পনা নিয়ে তিনি একদিন আমায় ডেকে বললেন, সিনারিও শোনো একেবারে পুরো মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে। শুনতে শুনতে কি খেয়াল হলো নিজের মনেই সুর করে গাইতে শুরু করে দিলাম—

কে সে মোর কেই বা জানে?
কিছু তার দেখি দেখি আভাস
কিছু পাই অনুমানে
কিছু তার বুঝিনা বা।

বড়ুয়া শুনে চমকে উঠলেন, এটা কার গান?

কার গান? আরে বাবা স্বয়ং ভগবানের গান। সিনারিও পড়া বন্ধ করে

উনি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর কেমন যেন অন্যমনস্কভাবেই বললেন, আজ থাক।

থাকবে কেন ?

আমি এ সিনারিও পাল্টাবো। পরের দিন আবার ডাকলেন। সিনারিও শুনতে শুনতে আমি তেমনই আপন মনে গেয়ে উঠলাম।

ফুলের বাহার নেইকো যাহার
ফসল যাহার ফললো না
অশ্রু যাহার ফেলতে হাসি পায়…

বড়ুয়া আবার তাঁর উদাস চোখ দুটি তুলে প্রশ্ন করলেন—এটা গাইলে কেন ?

জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন—এক উদাসী চিত্তের বিষণ্ণতার সুর পেলাম প্রশান্তর স্বেচ্ছানির্বাসিত জীবনধারায়—তাই ঐ কথাগুলোই কেমন করে মনে এসে গেলো—ঠিক ঐ সুরেই !

এ গান আমার চাই এ ছবির জন্য।

অসম্ভব। কবি অনুমতি দেবেন কেন ? তাঁর গান। আমি সুর দিচ্ছি—আবার সিনেমাতে প্রয়োগ করব। এতখানি স্পর্ধার কথা তাঁর সামনে মুখে আনব কেমন করে ? আর তিনিই বা এতখানি অত্যাচার সহ্য করবেন কেন ?

আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। যেমন করে হোক—অনুমতি আদায় করতেই হবে।

রথীদাকে সব কথা বললাম। উনি বললেন, বাবামশায় যখন কোলকাতায় আসবেন শোনাতে হবে। কিছুদিনের মধ্যেই উনি এলেন। সে দৃশ্য এখনও চোখের সামনে ভাসছে। রথীদা, দীনুদার সঙ্গে গেলাম। গুরুদেব ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি। আমি গান শুরু করলাম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। যেখানে আমি বসে তার ঠিক ২০ ফিট দূরে উনি বসেছিলেন। উনি যখন যেখানে বসতেন সামনে ছোটো একটি টেবিলের ওপর খাতা, কলম রাখা থাকতো।

গান শেষ হতে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম আমরা সকলেই। শুধু একজন ছিলেন এবং এইটেই নিয়ম ছিলো। উনি যখন বসে বসে লিখতেন, কাছাকাছি একজন কেউ থাকতো। ওঁর যদি কোনো দরকার হয়।

কিন্তু অনুমতির কি হলো ?

দিয়েছিলেন—শুধু তাই নয়, উপরিপাওনা হিসাবে 'আজ সবার রঙে' ও 'তার বিদায়বেলার মালাখানি'—ঐ ছবিতে প্রয়োগ করবার পরামর্শও তিনিই দিয়েছিলেন। আর যে ব্যাপারটা আমাদের সবাইকে নতুন প্রেরণায় মাতিয়ে তুলেছিলো, সেটা হলো এই যে, আমার সঙ্গীত পরিচালনায় প্রমথেশ বড়ুয়ার ঐ ছবির নাম 'মুক্তি' তিনিই দিয়েছিলেন। ওঁর পরামর্শ দেওয়া গানদুটি কাননকে দিয়ে গাইয়েছিলাম(এ প্রসঙ্গ এর পরে কানন দেবী শীর্ষক নিবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে)।

এরপরেও অনেকবার গেছি ছায়াচিত্রে কবির গান প্রয়োগ করবার অনুমতি ভিক্ষা করতে। কবি স্নেহ করতেন। তাই অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন মনে হয় আমি কি মূর্খ, কি আহাম্মকি করেছি? 'মুক্তি' ছবিতে সরাইওয়ালার মুখে কবির গান জুড়ে দিয়েছি। ছিঃ ছিঃ! কি মতিভ্রম!

মতিভ্রম কেন বলছেন? এই জুড়ে দেওয়ার ফলে কত বড় কাজ হয়েছে। ঐসব কথাচিত্রের মাধ্যমেই ত রবীন্দ্রসঙ্গীত এত জনপ্রিয় হয়েছে। কবির কাছে গান শোনবার বা শেখবার সুযোগ ক'জনের হয়েছে? ফিল্ম ও রেকর্ডের জন্যই ত তাঁর গান লোকের মুখে মুখে ফিরেছে।

তা হয়তো হয়েছে। তবে তখন ওসব কিছু ভেবে ত করিনি। তাই এখন মাঝে মাঝে মনে হয় কবির প্রতি অবিচার করিনি ত?

কবিকে যিনি ভগবান মনে করেছেন, তিনি কখনও তাঁর প্রতি কোনো অবিচার করতে পারেন না। রেকর্ড করার যোগাযোগ ঘটলো কিভাবে?

চণ্ডীবাবু (হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টসের স্রষ্টা চণ্ডীচরণ সাহা) রেকর্ডিং শেখবার জন্য জার্মানি গেলেন। ফিরে এসে অক্রুর দত্ত লেনে কোম্পানি খুললেন। প্লোবল সাহেব আগেই শুরু করেছিলেন। আমি রেডিও অফিস ফেরত অক্রুর দত্ত লেনে যেতাম। ওখানের একতলায় বসে অর্গ্যান বাজিয়ে গান গাইতাম। ওধারে চণ্ডীবাবু রেকর্ডিং রুমে বসে বসে হাত পাকাচ্ছেন।

আগেই বলেছি প্লোবল সাহেবের তত্ত্বাবধানে ১৯৩৩ সালে এখনকার কলাম্বিয়া তখন কলাম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানি নামে রেকর্ডিং সেন্টার খুলেছিলো ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং-এর একতলা ভাড়া নিয়ে। আমার বরাবরই গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড করবার সখ ছিলো। ও কোম্পানির রিহার্সালরুম ছিলো ভবানীপুরে, বিষ্ণুভবনে। ওঁদের ট্রেনার ছিলেন জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেব, বিমল দাশগুপ্ত ও ধীরেন দাস। আমি রেকর্ড করাবার আবেদন নিয়ে অনেকবার ওখানে যাতায়াত করলাম। জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেবের সময় নেই। দু-তিন বছর ঘুরিয়ে উনি বললেন, ধীরেনবাবুর কাছে যাও। ধীরেনবাবুর কাছে যাও। ধীরেনবাবুর কাছে আর যাওয়া হয়নি।

প্লোবল সাহেবের আমন্ত্রণে কলাম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগ দিলাম। ট্রেনার হিসাবে ছিলাম আমি ও তুলসী লাহিড়ী। এখানে প্রথম রেকর্ড করেছিলাম বাণীকুমারের গান 'নমো নমো হে রুদ্র সন্ন্যাসী।' রবীন্দ্রসঙ্গীত করবার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু শান্তিনিকেতন থেকে পারমিশন ইত্যাদি আনতে দেরী হবে বলে হলো না।

ওদিকে হিন্দুস্থান কোম্পানিতে চণ্ডীবাবু তখন 'তোমার আসন শূন্য আজি' ও 'প্রলয়নাচন নাচলে যখন' বার করেছিলেন। বিশ্বভারতীর পারমিশন ইত্যাদির ব্যবস্থা বুলা মহলানবীশ করে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুর দেবার প্রেরণা এলো কেমন করে? এ-সংবাদটা অনেক-দিন আগে যখন এসেছিলাম বলবেন বলেছিলেন। আজ ওভার-ডিউ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

তখন 'আনন্দ পরিষদ' ছিলো আমাদের একটা মস্তবড় আড্ডার জায়গা। ওখানে শরৎচন্দ্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সবাই আসতেন। ওখানে যাবার আগে একদিন একটা বই খুলতেই হঠাৎ চোখে পড়লো 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে'—কথাগুলি এতো ভালো লাগলো যে, নিজের মনেই সুর দিয়ে গাইতে শুরু করলাম, 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে'—গাইতে গাইতে মনের মধ্যে কেমন একটা ভাবের আবেশ ছড়িয়ে গেল। অজান্তেই নির্জনতাপ্রেমিক মনটার তাগিদে চলে গেলাম গণেশ অ্যাভিনুতে। সেই সন্ধ্যায়, মুক্ত আকাশের নীচে বসে 'তারার পানে চেয়ে চেয়ে' মনে হয়েছিলো ওরা যেন আমার কত আপনার। আকাশ আর পৃথিবী যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য এক হয়ে উঠলো। অনুভব করলাম আমি আকাশ থেকে পৃথিবীতে আসছি আবার যাচ্ছি আকাশে, এক শুভ্র আলোর সেতুপথ দিয়ে। এ অনুভূতি জীবনে একবার দুবারই আসে ···

কতক্ষণ এভাবে ছিলাম না। সংবিৎ ফিরে আসতে আনন্দ পরিষদের দিকে এগোলাম। ও অনুভব ত আর ফিরে আসবে না। অন্তত সুরটা যাতে না হারিয়ে যায় সেই জন্যই হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতে লাগলাম 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন'। গাইছি। হঠাৎ পেছন থেকে কে বলল, একটু তফাত হচ্ছে—। চেয়ে দেখি লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র দাঁড়িয়ে। আমি বললাম, তফাত হচ্ছে মানে? এ সুর ত আমার দেওয়া—।

ভাগ্।—গুল মেরো না। এ গানের সুর আছে এবং এই রকমই। তোমার একটু অন্যরকম হচ্ছে বলেই বললাম। দেখে নিও।

পরে দেখলাম সত্যিই ঠিক ঐ রকমই সুর। এক অভূতপূর্ব আনন্দে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তবে কি আমি কবির উপলব্ধিলোকের দ্বারের কাছাকাছি পৌঁছেছি—তাই অজান্তেই আমার মনের তার ওঁরই সুর বাঁধা হয়ে গেছে!

আমিও হতবাক। এই জন্যই কি নিজের গানকে সুরে সুরে রূপময় করবার অধিকার কবি তাঁকে দিয়েছিলেন? নিজের গান সম্বন্ধে কবির স্পর্শকাতরতা ত কতভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। আজকালকার অনেক রেডিও গায়কও অহঙ্কার করে বলে থাকেন, তাঁরা আমার গানের উন্নতি করে থাকেন। মনে মনে বলি, পরের গানের উন্নতি সাধনে প্রতিভার অপব্যয় না করে নিজেরা গান রচনায় মন দিলে তাঁরা ধন্য হতে পারেন। সংসারে যদি উপদ্রব করতেই হয় তবে হিটলার প্রভৃতির ন্যায় নিজের জোরে করাই ভালো।

সেই মানুষের অনুমতি পাওয়া তাঁরই গানে সুর দেওয়ার? এ তো অসাধ্য-সাধনা!

কি করে কোন যোগ্যতায় আমার মত মহামূর্খ যে তাঁর স্নেহ পেলো? জানো মা 'মরণের মুখে' গানে।

আঁধার আলোর পারে
খেয়া দিই বারে বারে
নিজেরে হারায়ে খুঁজি—

এখানে আমি শুদ্ধ ধা দিয়েছি। আবার 'ফুলের বাহার নেইকো যাহার' —এসব জীবনের শেষ প্রহরের গান। অথচ এখানে—সকালবেলার সুর দিয়েছি। তাও কবি আপত্তি করেন নি। তার কারণ সকালবেলার সুরেই বেলাশেষের রেশ আছে।

এখনকার রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারায় জনপ্রিয়তার যে বিপুল উচ্ছ্বাস, তার মূলে ত প্রধানত আপনিই রয়েছেন। তাই এ সম্বন্ধে আপনার মতামতটা জানতে ইচ্ছে করে।

দেখো মা আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, তিনি ভগবান। তিনি ইচ্ছে করেছিলেন তাঁর গান জয়প্রিয় হোক তাই হয়েছে। আমি কখনও কোনো কিছুর লোভে এতবড় কথা বলতে পারি না যে আমি তাঁর গান জনপ্রিয় করেছি। তবে এখনকার রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা সম্বন্ধে এইটুকুই বলতে পারি যে এমন অপূর্ব কণ্ঠ এখনকার শিল্পীদের। কিন্তু একটু যদি অভিনিবেশের সঙ্গে গাইতেন ? স্বরলিপি অনুসরণ করে কোনোরকমে গাওয়াই কি সব ? যেমন ধর না 'সর্ব খর্ব তারে দহে' গানটির কথাই। যতীন দাস হাংগার স্ট্রাইক করেছিলেন লাহোর জেলে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে এই সংবাদ পেয়েই তিনি রিহার্সাল বন্ধ করে দিয়ে এই গানটি লিখেছিলেন। পরে 'তপতী'তে এ-গান যুক্ত হয়। এখানে কবি প্রার্থনা করেছেন—

দূর কর মহারুদ্র
যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ—

কিন্তু একবার এক গানের আসরে ঐ গানটি শুনলাম। কোথায় সেই মহাভৈরবের কাছে বলিষ্ঠ মনের তেজ ও শক্তির প্রার্থনার সুর ? এত দ্রুত লয়, কথার উচ্চারণ এত অস্পষ্ট যে, মনে হচ্ছে একদল লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে। পথ জানে না। উঁচু-নীচু রাস্তায় পা পড়ে হোঁচট খাচ্ছে।

আর একবার চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য দেখতে গেছি। সেই চিত্রাঙ্গদা-রূপমুগ্ধ অর্জুনের গান 'অশান্তি আজ হানলো এ কি দহনজ্বালা ?' যেই শুরু হলো অমনি কাড়ানাকড়া জোরে জোরে বেজে উঠলো, আর অর্জুনের ভূমিকাভিনেতা স্টেজে—এসে এমন দাপাদাপি শুরু করলেন—তাঁর সঙ্গে সঙ্গে লাল-নীল-হলদে-সবুজ আলো এমন বেগে নাচতে লাগলো যে মনে হলো ভূমিকম্প হচ্ছে।

অথচ 'অশান্তি আজ হানলো'—গানটি অর্জুনের মনের কোন অবস্থায় গাওয়া ? তপশ্চর্যারত অর্জুন সুন্দরী চিত্রাঙ্গদার রূপ দেখে হঠাৎ মনের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য অনুভব করলেন—আর সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরে জাগলো একটা অশান্তিবোধ। কারণ এ-চাঞ্চল্য তখনকার ব্রহ্মচর্যের প্রতিকূল। এই দ্বন্দ্বর গাম্ভীর্য, ভাবান্তর গাওয়ায় যদি না ফুটে ওঠে তাহলে ত গান গাওয়াটাই নিরর্থক। আমি শুনতে শুনতে ভাবছিলাম গুরুদেব যদি এ-গান শুনতেন, নিজের সৃষ্টির এহেন রূপ দেখে তাঁর কি মনে হতো ? হাউ উড হি ফিল ?

আবার মুগ্ধ হলাম কবির গানের অন্তরে প্রবেশের দুর্লভ দিব্যদৃষ্টিতে। আমার শেষ প্রশ্ন ছিলো, এ-দিব্যদৃষ্টি কি তাঁর সহজাত না গুরুদেবের কাছে প্রাপ্ত ?

নিজের মধ্যে কিছুটা হয়ত ছিলো। তারপর চোখ খুলল যখন দীনুদা 'হেরি অহরহ' গানটি শেখাবার আগে আমায় দিয়ে বারবার পড়িয়ে নিলেন এবং 'ভুবন' কথাটির মানে জিজ্ঞেস করলেন। এ-বোধ মর্মে গেঁথে দিলেন স্বয়ং কবিগুরু। ঠিক খেলার মত সহজ করে মধুর করে একটি গানের অর্থ, ব্যঞ্জনা ও অসঙ্গতি বুঝিয়ে দিয়ে। সে গান ওঁর নিজের নয়। কিন্তু আমার হাত ধরে সেই গানের পথে হাঁটিয়েই যেন কবি শিখিয়ে দিলেন কেমন করে সকল গানের অন্দরমহলে প্রবেশ করতে হয়।

কীভাবে ? একটু বলুন না ? বারবার ত বিরক্ত করতে আসব না ?

দেশের মাটি বই-এ একটা গান ছিলো পরে অবশ্য সেটা বাদ গিয়েছিলো। অজয়ের লেখা গান—'লোহার লাল পরশ পাথর ধুলোয় সোনা গড়ে।' কবিকে শোনালাম। কবি মুচকি হেসে বললেন বুঝিয়ে দাও। তখন অল্পবয়সের দোষে জ্যাঠামশাইগিরি করবার লোভটা খুব। বোঝাতে লাগালাম, লোহার লাঙলে ফসল ফলানো হলো। ঘরের মেয়েরা সযত্নে ঘরে তুলে রাখলেন।

কবি চোখ বড় করে তাঁর সহজাত মিষ্টি মিহি সুরে বললেন—ও-ও ! তাহলে চাষবাসের খবর রাখা হচ্ছে ? তারপর ?

সোনার দরে সোনার ধানের দামটি নেব চেয়ে।

বাব্বাঃ, আবার ব্যবসার দিকেও লক্ষ্য আছে। সোনার দরই চাই। সোনার দরের বদলে অন্য দাম চলবে না। বাঃ ! বাঃ ! বেশ। তারপর ?

মায়ের কোলে হাসবে ছেলে
বোনের কোলে ভাই
লক্ষ্মী মায়ের পায়ের সিঁদুর
মাথায় রাখি তাই।

তা হ্যাঁ রে, পায়ে আবার মা কবে থেকে সিঁদুর পরছেন ? সিঁদুর ত পরে সিঁথিতে, পায়ে থাকে অভ্র। যাক—তারপর ?

(এখানে সূক্ষ্মভাবে বুঝিয়ে দিলেন সুন্দর গানটির ত্রুটিটুকু)

সূর্যঠাকুর তোমায় বলি দিও মিঠে রোদ
মাঘমণ্ডল ব্রতে হবে তোমার দেনা শোধ।

তোর দেশ কোথা ? কুমিল্লা ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তাই ভ বলি কুমিল্লাবাসী নইলে এমন কথা আর কে বলবে ? হিরণ্যকশিপু তপস্যা করে দেবতাকে তুষ্ট করলেন। যা বর চাইলেন দেবতা বললেন তথাস্তু। তোমরা ওসব তথাস্তুর অবলিগেশনে যেতে চাও না—ধার চাও। মাঘমণ্ডলে শোধ দেবে। আচ্ছা বেশ। তারপর ?

ধার শোধের ব্যাপারটা বুঝেছ মা, কুমিল্লাতে মাঘ মাসে এক মাস ধরে

সূর্যপুজো হয়। তখন সূর্যবাবুকে এক মাস বাজার খরচ করতে হয় না।

কবির স্নেহের পাত্র ছিলেন বলেই কি আজও ওঁর কথা বলার ভঙ্গীটি এমন প্রাণকাড়া ?

তারপর শেষটা শোনো—

রূপার ঝারি হাতে নিয়ে বর্ষারানী এসো
নদেয় যেন বান ডাকে না মোদের ভালোবেসো।

এক বছর শেষ হলো বুঝি ? তাই বর্ষার খোশামোদ ? তোমরা দুজনে একেবারে অশ্বিনীকুমারদ্বয়—আমাকে ও অজয়কে লক্ষ্য করে বললেন।

দেখো গান যখন শুরু করেছিলাম—এত কথা, এমন ব্যাখ্যা মনে আসেনি। কবি বলার পর মনে হলো তাই তো, দেখ মা, তুমি গানের ফিলসফি চাইছিলে ফিলসফির সঙ্গে গানের প্যাথোলজিও এসে গেলো।

গুণীর ধর্মই হলো যা চেয়েছি তার কিছু বেশী দেওয়া।

কথাটা বড় ভালো বলেছ। তারপর শোনো। অজয়কে এসে বললাম—কবি তোকে ও আমাকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলেছেন। অজয় আমায় জাপটে ধরে বলল—বল শীগগির তোর কোন কানটা কবির দিকে ছিলো ?

বাঁ-কানটা। ও চট করে ওর কানটা আমার কানে লাগিয়ে বলল, কবির কথামৃত এই কান থেকে আমার কানে চলে আসুক, চলে আসুক, চলে আসুক। বলেই নাচতে লাগলো। সে সব আনন্দের দিন মনে হলেও রোমাঞ্চ জাগে।

উনি থামলেন। বাইরে তখন অজস্রধারায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। বাদলা-আলোয় ধারাযন্ত্রের গুঞ্জরণে যেন অতীতের কাহিনীরই কানাকানি।

এক সময় বৃষ্টি থামলে চলে এলাম। আমায় উনি সহৃদয় স্নেহে রাস্তা অবধি এগিয়ে দিলেন। এক বিচিত্র অনুভূতিতে মনটা ভরে রইলো। মনে হলো ইনি শুধু বড় শিল্পীই নন। একটা গৌরবময় যুগের সাধনা তার সমস্ত আনন্দ বেদনা নিয়ে এঁর মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে। সেই ঐশ্বর্যে মনটি এমন করে ভরে আছে বলেই সমস্ত বৈদগ্ধ ও মধুরতা দিয়ে এমন কয়েকটি সোনার মুহূর্ত রচনা করতে পারলেন।

শান্তিদেব ঘোষ

গুরুদেবের গানের শক্তি রয়েছে তাঁর অনুপম ব্যক্তিত্বে। এ গান চলবে সেই জোরেই।

প্যাণ্ডেলের বাইরেই 'সবার শেষে যা বাকি রয়, তাহাই লব'—কানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো একটি ছবি। দিনান্ত বেলায় পথ-ক্ষ্যাপা বাউল হাঁটছেন—লালমাটির পথে। পরনে গৈরিক আলখাল্লা, হাতে একতারা। বিদায়ী সূর্যের অস্ত-আভা প্রতিফলিত তাঁর শুভ্রকেশে। গোধূলির আলো, গৈরিক বেশ, নিস্পৃহ সুরবেশ সব মিলিয়ে একটা উদাসী বৈরাগ্যভাব যেন মূর্ত। ঐ পথিকই কি রবীন্দ্রনাথ? অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ পাবার তৃষ্ণাতেই যাঁর মন ক্ষণে ক্ষণে উদাসী হাওয়ায় পথে পথে ঘুরেছে?

ওঃ এতক্ষণ বলাই হয় নি এ গানটি গাইছিলেন শান্তিদেব ঘোষ। ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্র মেলায়। এর আগে এবং পরেও তাঁর গান বহু আসরে শুনেছি। কিন্তু এক কলি দূরভাষী গানের সুরে এমন ছবি ভেসে ওঠা? এরকমটা আর কখনও ঘটেনি। হয়ত সেই মুহূর্তে যিনি গাইছিলেন আর যে শুনছিলো তার মধ্যে কোনো অদৃশ্য ভাবনার সেতুবন্ধনের ব্যাপার চলেছিলো।

তারই ক'দিন বাদে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ ঘটেছে, সেই অভিজ্ঞতাকেই নতুন করে ঝালিয়ে নিলাম—একমাস আগে।

আজ কর্মজীবনের অবসানে আর একটি জীবন তার প্রবল দাবী নিয়ে আমার সমস্ত অবসর দখল করে বসে আছে। সেটি হলো—অবিরাম গান গেয়ে যাবার নেশা। গাইতে বসলে এক একটা গান আমায় এমনভাবে পেয়ে বসে—যে কখন ঘণ্টা পেরিয়ে যায় বুঝতেই পারি না। আর গাইতে বসে এমন একটা আনন্দে সারা হৃদয় উপচে পড়ে যে গুরুতর বাস্তবের ভারও যেন হাল্কা হয়ে যায়। এ বেশ জীবন। যেন গান নিয়ে খেলা। আত্মগমন আনন্দের উদ্ভাস শান্তিদেববাবুর চোখে।

আপনার কথা শুনে কবিরই একটি গানের কলি আমার মনে আসছে—'সারাদিন হেলাফেলা, এ কি খেলা আপন মনে?'

অবিকল তাই—

এ-হলো সুদীর্ঘ কর্মজীবনের পরের অধ্যায়। সেই অবিরিত কর্মরত জীবনের ফসল আজকের এই প্রশান্তি, আর সুরের উদার ব্যাপ্তি। সে

জীবনের স্পর্শ আমরাও মাঝে মাঝে পেয়ে থাকি—যখন তিনি কোনো উপলক্ষ্যে গাইতে আসেন। কিন্তু তার আগের জীবন? তখন কি এমন সুর নিয়ে খেলার কথা ভাবতে পারতেন?—আলোচনার সূত্র ধরে ওঁর সঙ্গে চলে গেলাম শান্তিনিকেতনের আশ্রম জীবনের একেবারে শুরুতে।

ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুরে আজকের অন্যতম সঙ্গীতগুরু শান্তিদেব-বাবুর জন্ম। মাত্র এক বছর বয়সে শান্তিনিকেতন গেছেন। তারপর থেকেই একটানা সেখানেই। শুধু ওঁর জীবনের নয়, শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মুহূর্ত থেকেই উনি সেখানে রয়েছেন। তারপর আজ অবধি—শান্তি-নিকেতনের কত বিচিত্র অধ্যায়ের পালাবদল—বহুধা অভিজ্ঞতার অভিনব স্বাদের শরিক হওয়ার চমকপ্রদতা এই নিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর জীবনদর্শনই শুধু নয়,—রবীন্দ্রদর্শনও।

শান্তিনিকেতনের মোটামুটি তিনটি যুগ বলা চলে। প্রথম যুগ হচ্ছে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের। বলতে বলতে সেই যুগেই যেন শিল্পীর মন নিবিষ্ট হয়ে গেলো, সে যুগ সত্যিই বড় দারিদ্র্যের—বড় কষ্টের। আমরা যে ক'টি পরিবার ছিলাম সে আঁচ আমাদের ওপর দিয়ে গেছে। আমাদের মত করে শান্তিনিকেতনের সংগ্রামী অধ্যায়ের বেদনাকে কেউ অনুভব করেনি, অথচ মজা দেখো—একটু হেসে বললেন, তখন কষ্টকে কষ্ট বলে মনেই হতো না। সে যেন এক তপস্যার যুগ। এই তপস্যা ও স্যাক্রিফাইসের প্রেরণা ছিলেন স্বয়ং গুরুদেব। কেউ ভাবত না—ভবিষ্যৎ কি হবে। সবাই যেন একটা আপনহারা আবেগে কাজ করে যেতো। সেই সৌম্য দেবমূর্তির পানে চাইলেই সকল ক্লান্তি ও নৈরাশ্য কোথায় যে পালাতো! কারণ আমরা যে দেখেছি দিনের পর দিন সকল কায়িক ক্লেশকে উপেক্ষা করে গুরুদেব কি কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে দিবারাত্র কাটাতেন। ওঁর একটিমাত্র চাকর ছিলো। লেখাপড়া, কপি-করা, চিঠিপত্র লেখা,—সমস্ত কাজ নিজের হাতে করতে । রোদ, ঝড়, বৃষ্টির মধ্যে চারদিক ছোটাছুটি, অর্থ সংগ্রহ, সে যে কি প্রাণান্তকর পরিশ্রম—না দেখলে ধারণা করা যায় না।

এইভাবেই চলেছিলো। এই কৃচ্ছ্রসাধনের যুগ মোড় নিলো ১৯২১ সালে। কবি নোবেল প্রাইজ পাবার পর অবস্থার একটু উন্নতি হলো। অবস্থার উন্নতি বলতে আমি আর্থিক উন্নতির কথা বলছি। এ যুগের স্বচ্ছলতা হয়তো আগে ছিলো না। তবে তার জন্য আনন্দের প্রবাহে কোনো বাধা ছিলো না। গুরুদেব সরসময়ই চাইতেন ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে খুব সহজ, স্বচ্ছন্দ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠুক। কারণ বাধাহীন বন্ধুত্বের মধ্যেই শিক্ষাগ্রহণ ও দান সহজ হয়ে ওঠে। শেষের দশ বছর খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি ব্যাপারে কবি আগের মত জড়িয়ে থাকতে পারেননি। কিন্তু গুরুশিষ্যের মধুর সম্পর্কে এতটুকুও ছেদ পড়েনি। সকল কাজের মধ্যেই কবির অলক্ষ্য প্রভাব যেন ফুলের মত ফুটে উঠতো।

দ্বিতীয় যুগ হলো বিশ্বভারতী সোসাইটি সৃষ্টির পরের যুগ। প্রথম

যখন সোসাইটি রেজিস্টার্ড হলো, কবি যেন কিছু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ছাত্রসমাজের এই সহজ, স্বচ্ছন্দ জীবনপ্রবাহ যদি নিয়মের নিগড়ে প্রতিহত হয়? এই সময় এণ্ড্রুজ সাহেবকে লেখা চিঠিপত্রে এই আশঙ্কাই প্রকাশ পেয়েছিলো। ভয় জেগেছিলো, আইনটাই বুঝি বড় হয়ে ওঠে। 'অচলায়তন', 'ডাকঘর' 'শারদোৎসব'—ঠিক এর আগের যুগের সৃষ্টি। নিয়ম, প্রথা এসবে কবির বড় আতঙ্ক ছিলো। সহজ প্রাণের উচ্ছল গতি অপ্রতিহত থাক—শান্তিনিকেতনের মূলমন্ত্র ছিলো তাই।

আপনাদের সকল কাজের আনন্দ, প্রেরণার উৎস ছিলেন তিনিই। তাঁর অন্তর্ধানের পর মনে হলো—না সব শক্তি নিঃশেষ—আর কিছু করার নেই?

প্রথমটায় তা তো হবেই। কিন্তু গুরুদেবের দেওয়া কাজের দায়িত্ব যেন আপন শক্তিতেই সকলকে চালিয়ে নিয়ে গেলো। চোখের সামনে ত দেখেছি তাঁর কি উদ্বেগ দুশ্চিন্তা এই শান্তিনিকেতন নিয়ে। তাই মনে হলো যে, শান্তিনিকেতন শুধু তাঁর প্রাণের নয়, ধ্যানের বস্তু, তাকে ভেঙে যেতে দেওয়া হবে না। ঐই প্রেরণাই শক্তি জাগালে. সেই শক্তির জোরেই আজও চলেছি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সান্নিধ্যের প্রসঙ্গে বললেন—পড়াশোনা, গানবাজনা সবই ছিলো ওঁর তত্ত্বাবধানে। ওঁর পড়াবার পদ্ধতিও ভারী ইনটারেস্টিং ছিলো। শেলী, কীটসের কবিতা আমরা চোদ্দ বছর বয়সেই পড়েছিলাম।

চোদ্দ বছর বয়সে শেলী, কীটস? বুঝতে অসুবিধা হতো না?

সেই মজার কথাই ত বলছি। বুঝতে ত পারতামই। আর সেটা এত ভালো করে যা পরিণত বয়েসেও বোঝা মুশকিল। এর মূলে ছিলো গুরুদেবের শিক্ষাপদ্ধতি। উনি ইনটারেস্ট ক্রিয়েট করতেন কিভাবে জানো? প্রথমে শেলী, কীটসের ভালো ভালো কবিতা বেছে বেছে শোনাতেন। বাংলা অনুবাদের পর ইংরিজিতে লিখতে হতো। এইরকম উল্টেপাল্টে লিখে তারপর ওঁর হাতে দিতাম কারেকশনের জন্য। প্রোজও তাই।

কবির বিশেষ পদ্ধতি ছিলো ছোটদের শিক্ষার জন্য একটু কঠিন বস্তু দেওয়া। যাতে তারা ভাবতে শেখে। 'সাহিত্য' ধরনের কঠিন ও চিন্তাপ্রধান বই ম্যাট্রিকের দু' বছর আগেই আমাদের শেষ গিয়েছিলো। শিশুরা যতটা বুঝতে পারে—তার চেয়ে একটু উঁচু স্ট্যাণ্ডার্ডে শিক্ষা দিতে চাইতেন বলে লাইব্রেরীতেও সেই ধরনের বই রাখতেন। ওঁর মতে ছোটদের এমন জিনিস দিতে হবে—যা তখনই হয়ত আসিমিলেট করতে পারবে না, কিন্তু অবোধ্য বিষয়কে বোঝবার চেষ্টাতেই চিন্তাশক্তি জাগ্রত হবে। তারপর হঠাৎই একদিন তাদের অনুভবের দরজাটা খুলে যাবে। এই দরজাটা খোলবার জন্যই কঠিনের ধাক্কার প্রয়োজন আছে।

কবি অনেকসময়ই বলেছেন, আমি ওদের জন্য এমন সব গান, নাটক রচনা করছি যা ওদের পক্ষে চট করে বোঝাটা হয়ত মুশকিল হবে। যারা বুঝতে পারলো না আমি তাদের জোর করি নি, চাপ দিই নি। বড়দের শেখাচ্ছি—হঠাৎ একদিন নিজেরাই এসে বলেছে শিখব। নাটকের ক্ষেত্রেও তাই।

বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ও ছাত্ররা মিলে অভিনয় করবে বলেই নাটক রচনা করতেন,—কিন্তু ঠিক ছোটদের মত করে নাটক লিখতেন না। গীতাঞ্জলি গীতিমালার গানও আমাদের শেখাতেন। সব সময় বুঝতে পেরেছি এমন নয়। কিন্তু না বুঝতে পারলেও একটা অনুভূতি ভেতরে ভেতরে কাজ করেছে। নাটক, অভিনয়, নৃত্যনাট্য, গান—সমস্তই তাঁর বিচিত্র আনন্দের অনুভূতির রূপ। এ সবেরই অবতারণা করেছেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা আনন্দের—আবেগ জাগাবার জন্য।

রথীদা সব ভার নেওয়ার পর থেকে কবি একটু একটু করে এধার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন। যেটুকু যোগাযোগ রাখতেন,—তা ওপর ওপর।

গানে ছোটোবেলা থেকেই দীনুদা কবির দক্ষিণহস্ত ছিলেন। গাইয়ে বললে ওঁকে ছোটো করা হয়, গানের মাঝ দিয়ে উনি নাটকে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতেন।

গান কিভাবে শেখানো হতো?

গুরুদেব আশ্রমে একজন ওস্তাদ বা যন্ত্রী রাখতেন,—আমাদের গলা তৈরী করবার জন্য। কবি দিনের মধ্যে অজস্র গান রচনা করতেন। তারপর দীনু ঠাকুর সমেত বিরাট দলকে শেখাতেন।

আপনার সঙ্গীতানুষ্ঠান শুরু হলো কিভাবে?

ফাল্গুনী, শারদোৎসব—এসব নাটকে বরাবর থেকেছি, অভিনয় করেছি। ছোটোবেলা থেকেই গানের চর্চা হয়েছে ওঁরই তত্ত্বাবধানে। সকল উৎসবেই আমার ডাক পড়তো। যখন মাঘোৎসব হলো আমার মাত্র ছ'সাত বছর বয়স। আমিই দলের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো ছিলাম। আমার মুদ্রাদোষ ছিলো যখন তখন মাথা চুলকানো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাইতাম। দীনুদা বাজাতেন। হঠাৎ মাথা চুলকে ফেলতাম। আর তাই নিয়ে সকলের কত কৌতুক, মজার খুনসুটি। সেসব আনন্দময় পরিবেশের স্মৃতি বোধহয় সারা জীবনেও ভোলা যাবে না। ১৯২১ সাল থেকে সবসময় সব অনুষ্ঠানেই আমি থাকতাম।

আমার যখন সতেরো আঠারো বছর বয়স গুরুদেব বাবাকে একদিন বললেন—একে গানের দিকেই দাও। একজনকে ত ভবিষ্যতের জন্য তৈরী করা দরকার!

দীনুবাবুর অবর্তমানে যতগুলি নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন, আমায় নিয়েছেন পরিচালনার কাজে। 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যের সময় থেকেই ওঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ ঘটলো। এক একদিন চার পাঁচটা করে গান রচনা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ডেকে শিখিয়েছেন। সে যুগে যেন একটা ভাবের উন্মাদনায় কেটেছে।

আপনি ত প্রথমে গানেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন? তারপর—নাচের প্রেরণা এলো কবে থেকে?

সে এক ভারী মজার কাহিনী। ১৯২৯ সাল থেকেই হবে বোধহয়। বীরভূমে বাউলনাচ, গুরুসদয় দত্তর ব্রতচারী, রাইবেঁশে নাচ দেখে গুরুদেবের

দারুণ ভালো লেগে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের শান্তিনিকেতনে আনালেন আর আমায় বললেন—তাঁদের নাচ দেখে এক একটি নাচ তুলতে। সেইসব নাচই 'নবীন' নাটকে জুড়ে দিলেন। আর নাচ শেখার পর আমার মনে হলো যেন নতুন আনন্দের পাখা গজিয়েছে।

১৯৪০ সাল থেকে শান্তিনিকেতনে পুরোপুরি নাচ এলো।

তার আগের প্রস্তুতিপর্বটা? ১৯১৮ সালে কবি পূর্ব বাংলায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই সময় শিলচরের সমাজ কবিকে মণিপুরী নাচ দেখালো। মণিপুরীর গীতিকাব্যধর্মী নাচ কবির খুব মনে ধরে গেলো। তারপর আগরতলার মহারাজও কবির জন্য এক নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সে-সময় কবির মনে শান্তিনিকেতনের ছেলেদের নাচ শেখাবার বাসনা জাগলো। এবং তাঁরই অনুরোধে আগরতলার মহারাজ শান্তিনিকেতনে নাচ শেখাবার জন্য একজন মণিপুরী গুরু পাঠালেন। আর কবি নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় নানা রকমের গান রচনা করে গানের সঙ্গে নাচের মালা গেঁথে দিতেন।

মেয়েদের হোস্টেল হবার পর থেকে মেয়েদের মধ্যে যে নৃত্যের চল কিছু ছিলো প্রতিমা দেবীর উৎসাহই ছিলো তার প্রধান কারণ। এইসময় শান্তিনিকেতনে এক গুজরাটি মহিলা ছিলেন। তিনি মেয়েদের গুজরাটি ও গরবা নৃত্য শেখাতেন। কাটিহারে গুরুদেব মন্দিরা হাতে একরকমের নাচ দেখে খুব মুগ্ধ হন। এই নাচও শান্তিনিকেতনে আনতে চেয়েছিলেন। ওখানের এক পরিবারকে তিনি কিছুদিন শান্তিনিকেতনে এনে রেখেওছিলেন।

যাই হোক—যা বলছিলাম। মণিপুরী গুরুদেবের মধ্যে শান্তিনিকেতনে প্রথম এসেছিলেন আগরতলার বুদ্ধিমন্ত সিং। তিনি ছ-সাত মাস থেকে চলে যাবার পর ১৯২৬ সালে এলেন নবকুমার সিং। এই নবকুমার পর্যন্ত আমরা—ছেলেরা বেশী ঘেঁষতে পারিনি। মেয়েদেরও নাচেব দিকে বিশেষ দেখা যেতো না। প্রথম সুপরিকল্পিত নৃত্যনাট্য হলো ১৯২৬ বা ২৭ সালে, খুব সম্ভব, 'নটীর পূজা'।"

"ছেলেদের মধ্যে নাচের প্রেরণা এলো কবে থেকে?"

"একবার মাদ্রাজ থেকে একটি ছেলে শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থী হয়ে এলো। সে নাচ জানতো। সবাই তার নাচ দেখে অবাক হয়ে গেলো। ছেলেদের নাচও এত সুন্দর হয়? তখন থেকেই ছেলেদের নাচের দিকটা সকলের সামনে উদ্ভাসিত হলো। এরপর যিনি মণিপুর থেকে এলেন, তাঁর কাছেও আমরা নাচ শিখতে আরম্ভ করলাম।

১৯৩১ সালে নাচ শেখাবার জন্য গুরুদেব আমায় দক্ষিণ ভারতে পাঠাতে চাইলেন। এই উদ্দেশ্যে ত্রিবাঙ্কুরে শান্তিনিকেতনের একজন এক্স স্টুডেন্টকে চিঠি লেখা হলো। উত্তরে তিনি জানালেন এখানে একরকম লোকনৃত্য আছে, মুখোশ পরে নাচে। তাকে 'ডেভিল ডান্স' বলা হয়। এখানে এলে দেখাব ঐ ১৯৩১ সালের মে মাসে মাদ্রাজ চলে গেলাম।

মাদ্রাজে গিয়ে প্রথমটায় নাচের কোনো হদিশই পাইনা। কিন্তু পৌঁছে

গেলাম একেবারে নাচের কেন্দ্রে। সে যোগাযোগও এক মজার অভিজ্ঞতা।

ত্রিবাঙ্কুর যাবার উদ্দেশ্যে ট্রেনে চড়ে বসলাম। কিন্তু ভুল করে ত্রিবাঙ্কুরের গাড়িতে না উঠে উঠলাম কোচিনের গাড়িতে। আর এ ব্যাপারটা যখন জানতে পারলাম, অথৈ জলে পড়লাম। কি উপায় ? সহযাত্রীদের মধ্যে একজন পরামর্শ দিলেন আন্নাকুলাম থেকে স্টেশনে যেতে পার। কিন্তু বড় অনিশ্চিত। তারপর আমার নাচ শেখার উদ্দেশ্যের কথা শুনে এক ভদ্রলোক পরামর্শ দিলেন পরের স্টেশনে নামতে। সেখানে আরকিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের একজন বড় অফিসার থাকেন। তিনি আমার নাচ শেখানোর সকল রকম সুবন্দোবস্ত করে দিতে পারবেন এ ভরসাও পাওয়া গেলো।

তাঁর কথানুযায়ী পরের স্টেশনে নেমে পড়লাম। মাস্টার একজন কুলি সঙ্গে দিলেন। তার সাহায্যে সেই ভদ্রলোকের বাড়ি পৌঁছলাম। তিনি বাড়ি ছিলেন না। বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে আমায় দেখে খুব অবাক হয়ে গেলেন। আমি শান্তিনিকেতনে থেকে আসছি শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন। আবার ঘটনাচক্র কেমন অনুকূল দেখো, ওঁরই কাছে খবর পেলাম ওখানে বিখ্যাত কবি ভাল্লাথল যাঁকে সবাই 'টেগোর অফ কেরালা' বলতেন—তিনি সবে নাচের ক্লাশ খুলেছেন পাশের গ্রামে। তিনি কানে কম শুনতেন বলে মুদ্রায় কথা বলতেন।

পরের দিন ঐ নাচের স্কুলের সেক্রেটারী সেই গ্রামে আমায় নিয়ে গেলেন। গুটিকয়েক ছাত্র নিয়ে সবে শুরু হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠান। আমি গুরুদেবের কাছ থেকে গেছি শুনে ওঁরা আমায় খুবই সমাদর করলেন। সেই নৃত্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্র কারা জানো ? গ্রামের চাষী ক্লাস। ওরা খাতির করে পাশের গ্রামের জমিদার বাড়িতে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আমার মন এতে সায় দিলো না। ওদের সঙ্গে একসঙ্গে থেকে, ওদেরই মত করে জীবন যাপন করে একেবারে ওদেরই মন নিয়ে যদি শিখতে নাই পারলাম তাহলে ওদের নাচের বৈশিষ্ট্যটি আমার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতে পারে কেমন করে ? তাছাড়া জীবন-বৈচিত্র্যকে আস্বাদ করবারও একটা অনন্দ আছে ত ?

তিনমাস এইভাবে কাটালাম। ওদের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে একটা ধারণাও হলো। সকালবেলা নাচের এক্সারসাইজ করার পর সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়লে গুরু তিলের তেল মাখিয়ে পা দিয়ে ডলে ডলে সারা শরীর মাসাজ করে দিতেন। সাবান মাখা বারণ ছিলো। তাতে নাকি শরীর গরম হয়। একরকম গাছের ছাল শুকিয়ে গুঁড়ো করে আমরা সবাই মাখতাম। তাতে হতো কি, স্নান করলে তেলটা উঠে যেতো আর শরীরটাও যেন স্নিগ্ধ হয়ে যেতো।

ওরা বেশীর ভাগই খুব লম্বা এবং ওদের নাচে অভিনয়ের সুযোগও খুব বেশী। তবে কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম ওদের মুদ্রার অঙ্গ এক বিরাট পর্ব। মুদ্রায় হাত দিলেও অধ্যায় অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করা যাবে না, একথাও বুঝতে দেরী হলো না। তাই ও-নাচের ছন্দবৈচিত্র্য আর অভিনয়ের অঙ্গটাই যতদূর সম্ভব আয়ত্ত করবার চেষ্টা করলাম।

তিনমাস বাদে ফিরে এলাম। আমার সবসময় লক্ষ্য ও চেষ্টা থাকতো ঐ

সমস্ত বস্তু ভেঙেচুরে কেমন করে গুরুদেবের গানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়। আমার নৃত্যশিক্ষার উদ্দেশ্যও ছিলো তাই। গুরুদেবের গানের নৃত্য রূপায়ণ।

এরপর কোচিনের মহারাজার মাধ্যমে এক নৃত্যগুরু আনানো হলো। ১৯৩৭ সালে আমি সাউথ ইণ্ডিয়া থেকে কেলু নায়ারকে নিয়ে আসি। ও তখন কথাকলি ছাড়া অন্য নাচ জানতো না। শান্তিনিকেতনে এসে মণিপুরী শিখলো। অল্পদিনের মধ্যেই অসম্ভব রকমের তৈরী হয়ে গেলো। এই সময় কেরালার কথাকলি গুরুর সঙ্গে একজন করে মণিপুরী গুরুও রাখা হতো তবে 'ভরতনাট্যম' কোনো গুরু রেখে শেখানো হয় নি।

ওদেশে উদয়শঙ্কর খুব নাম করার পর একবার শান্তিনিকেতনে এসে-ছিলেন। ওঁর নাচ গুরুদেবের খুব ভালো লেগেছিলো। উদয়শঙ্করের প্রতিভার কাছে ওঁর শুধু বড় আশাই ছিলো না। মস্ত নির্ভরতাও ছিলো। উনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাবার আগে গুরুদেব ওঁকে এক উচ্ছ্বাসমুখর আশীর্বাণী উপহার দিয়েছিলেন। তার এক জায়গায় ছিলো—পৌরুষের দুর্গতি যেখানে ঘটে সেখানে মৃত্যু অন্তর্ধান করে, কিংবা বিলাস-ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে তেজ হারায়, স্বাস্থ্য হারায়, যেমন বাইজির নাচ। এই পণ্যজীবিনী নৃত্যকলাকে তার দুর্বলতা থেকে, সরলতা থেকে উদ্ধার কর।

নাচে গুরুদেব অভিনয়ের ওপর জোর দেওয়াটাই পছন্দ করতেন। শঙ্করের নাচে এই অঙ্গটি জোরালো ছিলো বলে এ-নাচ তাঁর মনকে এমন করে ছুঁয়ে-ছিলো। এই অধ্যায়ে কবিকে নৃত্যনাট্য লেখার নেশায় পেয়ে বসেছিলো। তাই শান্তিনিকেতনে নাচ জমে উঠেছিলো পুরোদমে। এই সমস্ত নাটকে প্রতিমা-দেবীর অনুপ্রেরণা ছিলো একটা মস্ত বড় অবদান। উনি হয়তো কোনো কাহিনী দিয়ে চিন্তা করছেন কেমন করে সেটা দিয়ে ব্যালে তৈরী করা যায়। সেই ভাবনাকে কবি নৃত্যে গানে বেঁধে দিলেন। এইভাবেই চিত্রাঙ্গদা চণ্ডালিকা শাপমোচন নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি।

সে এক উদ্দীপনার যুগ। গান তৈরী হলো। এক একদিনে কবি অনেক গান লিখে সুর দিয়ে ফেললেন। গান তোলা হলো সঙ্গে সঙ্গে নাচও তৈরী হয়ে গেলো। তারপর শেখানোর পালা। খুব খাটতে হতো সবাইকে। অথচ এতটুকুও ক্লান্ত হতাম না। সবাই তখন সৃষ্টির নেশায় বিভোর।

আপনি কোন কোন চরিত্রে অভিনয় করেছেন?

তাসের দেশে রাজপুত্র, শাপমোচনে রাজা, চিত্রাঙ্গদায় অর্জুন। একটু থেমে বললেন, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার যাতে সুন্দর হয়ে ওঠে তার জন্য সবার কি আপ্রাণ চেষ্টা।

নন্দলাল বসু সকলকে নিজের হাতে সাজাতেন। গুরুদেবের পর এরকম বহুমুখী প্রতিভা আমি আর দেখিনি। মামুলী প্রথায় সাজসজ্জা একদম বদলে দিলেন। গভীর অভিনিবেশ সহকারে তিনি প্রতিটি বিষয় চিন্তা করতেন। আর নাটকের চরিত্রের সঙ্গে কি সাজ খাপ খায় বসে বসে তারই স্কেচ করতেন।

কবির রূপকনাট্যে একটা মজা লক্ষ্য করেছ ?

পার্সোন্যালকে ইম্‌পার্সোন্যাল, ইনডিভিজুয়ালকে ইউনিভার্সালাইজ করার ব্যাপার ?

ঠিক তাই। শারদোৎসব, ডাকঘর, ফাল্গুনী, রথের রশি-র বিভিন্ন চরিত্র কোন্ যুগের ? কোনো বিশেষ যুগের শীলমোহরে এদের চিহ্নিত করা যায় কি ? অথচ রাজা মন্ত্রী গ্রামবাসীকে ঠিক তাদের পরিচয়েই চিনতে ভুল হয় না। গুরুদেব একটা চিন্তাকে সামনে রেখে বিভিন্ন যুগের মানুষদের তাঁর নাটকের জন্য বেছে নিতেন। বিশেষ কোনো যুগের উৎস থেকে বেরিয়ে এলেও সর্বকালে ও দেশে তাদের ব্যাপ্তি।

কবির এই চিরায়ত দৃষ্টিকোণকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন নন্দলাল বসু। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবাহকে অনুসরণ করেই তিনি রং, সাজ ও পোশাকের নকশা রচনা করতেন যাতে প্রতিটি চরিত্র হতো যেমন যুগের ফ্রেমে বিধৃত তেমনই যুগাতীতের চিন্তায় উত্তরিত। বাল্মীকি প্রতিভায় বাল্মীকি ও রত্নাকর হাত ধরাধরি করে চলেছে। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এখানে বেশ-ভূষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এ বোঁধ নন্দলাল বসুর ছিলো বলেই মঞ্চ পরি-কল্পনা, চরিত্রের সজ্জা রচনায় তিনি গুরুদেবের ভাবনার দোসর হতে পেরেছিলেন।

স্বয়ং কবিগুরুর অভিভাবকত্বে নন্দলাল বসুর সজ্জা পরিকল্পনায় প্রতিমা দেবীর চিন্তার প্রেরণায় আপনারা কবির নৃত্যনাট্য রূপায়ণ করেছেন। এত-গুলি বৈপ্লবিক প্রতিভার সমন্বয় ত একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। এ ঘটনা বারবার ঘটে না। তুলনার ত প্রশ্নই ওঠে না। শুধু জানতে চাইছি কবিগুরু ও উদয়শঙ্করের মিলিত নৃত্যচিন্তাকে যদি বলি হিমগিরি—তাহলে কোলকাতায় আজকের উপচে পড়া নৃত্যনাট্য প্রবাহকে শাখা নদী উপনদী যে নামই দেওয়া যাক, তার রূপ সম্বন্ধে আপনার অভিমতটা জানতে ইচ্ছে করে।

ওসব আলোচনার মধ্যে যাওয়া কি উচিত হবে ? আবার ভুল বোঝাবুঝি হবে।

কেন ভুল বোঝাবুঝি হবে ? আপনিও ত এঁদের গুরুতুল্য। তাছাড়া কবিগুরুর পরিচালনা অথবা ভাবকল্পনার সম মানের বলে এঁরা কেউ-ই নিজেদের দাবী করেন না। আপনার মতামত এঁদের কাজে লাগবে বলেই জিজ্ঞেস করছি।

আমি খুব বেশী দেখি নি। যা দু-একটি দেখেছি বড় সৌখিনী বলে মনে হয়েছে। অভিনয়ের দিকে নজর নেই। আঙ্গিকে ত নেই-ই। কোনোরকমে স্বরলিপি অনুসরণ করে গান গেয়ে তার সঙ্গে নৃত্যভঙ্গি জুড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত। অভিনয়ের মাধ্যমে কবির চিন্তা কতখানি ফুটে উঠলো সে চিন্তার ছায়া কই ? আমরাও প্রথমটা সৌখিন হিসেবেই শুরু করেছিলাম। তারপর কবির ক্রমাগত তত্ত্বাবধানে ও সকলের সমবেত চেষ্টায় অভিনয় গান ও নৃত্যের সঙ্গে টেকনিক এমন করে মিশে গেছে যে আজ আর চেষ্টা করেও আলাদা করা

যায় না।

এই টেকনিকটা কি?

গানের মেজাজটাকে নাচ দিয়ে বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া। কোন কথায় ও সুরে কিভাবে অ্যাক্‌সেন্ট দিলে তার অন্তরের রূপ মূর্ত হয়ে উঠতে পারে এই বোধ বা তাগিদেই মণিপুরীর কোমল সুষমা ও কথাকলির নাট্যরূপের ছায়া আপনা থেকেই নাচে এসে পড়তো, এটাকে ঠিক চেষ্টা করে আনা হতো না। এইটিকেই আমি টেকনিক বলছি।

এই বোধের অভাবেই গুরুদেবের অমন ভাবসমৃদ্ধ গানও অনেক সময় ড্রয়িংরুম সং হয়ে পড়ে।

সুন্দর জিনিসকে ভালো লাগার শিক্ষা যাতে শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীরা পান সেদিকে গুরুদেবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিলো। সব সময় শ্রেষ্ঠ গুণী সঙ্গীতজ্ঞদের শান্তিনিকেতনে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতেন যাতে ভালো গান কি বাজনা শুনে ছেলেমেয়েদের মানস প্রকৃতিতে সত্যিকারের সৌন্দর্যবোধ জেগে ওঠে।

তাঁরই ইচ্ছায় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। একবার বর্ষামঙ্গল উৎসবে উনি খোল পাখোয়াজ বাজিয়ে মেঘমন্দ্রিত বর্ষার কী রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন ভাবা যায় না। যে কোনো যন্ত্র একবার বাজাতে বসলেই সব ভুলে যেতেন। সত্যিকারের সাধকের জাতই আলাদা। খাঁ সাহেবকে দেখে সেই কথাটাই মনে হতো। পিঠাপুরমের বীণকার সঙ্গমেশ্বর মিশ্রকেও গুরুদেব শান্তিনিকেতনে আনিয়েছিলেন। যেখানে যত গুণীর খবর পেতেন তাঁদের শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ করে আনতেন—ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গীতবোধের প্রসারতা বাড়াবার জন্য। আমাদের সবসময় শেখাতেন তাঁদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখতে। ঠিক প্রাচীন ভারতের আশ্রমবাসীদের মত বিনম্রতা সেবা এসবও শিক্ষার অঙ্গ ছিলো।

গুরুদেবের সঙ্গের শেষ অধ্যায়ের অনেক কথা মনে পড়ে। তিনি তখন রোগশয্যায়। শান্তিনিকেতনের উদয়নে প্রথমবার অসুস্থতার সময়, ১৯৩৭ সাল সেটা, আমরা কয়েকজন পালা করে রাত জাগতাম। এক রাতের কথা মনে পড়ে। কবির তখন অর্ধ অচেতন অবস্থা। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন একেবারে অনাবৃত দেহে, ঐ ঘোরের অবস্থাতেই 'বাথরুম যাব' বলে। দাঁড়িয়েছিলেন মিনিটখানেকেরও কম। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। আমি হঠাৎ চমকে গেলাম। মনে হলো সামনে দাঁড়িয়ে এক জ্যোতির্ময় মূর্তি। মানুষের অবয়ব তাঁর নয়। সারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন আলো দিয়ে গড়া।

যাঁরা মহামানব কোনো না কোনো সময় অজ্ঞাতেই তাঁরা প্রকাশ হয়ে পড়েন। চেষ্টা করেও আপনাকে গোপন রাখতে পারেন না। সেইরকমই একটা দুর্লভ মুহূর্ত যেন হঠাৎ ঝলকে উঠেই মিলিয়ে গেলো। আমার সারা মন কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে এলো।

তারপর থেকে আমি রাত্রে আর ওঁর কাছে থাকতে চাইতাম না। ভয়

হতো। যদি ছুঁয়ে ফেলি? তখন মনে হয়েছিল ঐ অপার্থিব সত্তাকে আমার ছোঁবার কোনো অধিকার নেই।

গুরুদেবের অন্তর্ধানের পর আর এক অধ্যায়। তারপরও ছাত্র শিক্ষকের মধুর সম্পর্কের মধ্যে তাঁরই প্রভাব অলক্ষ্যে কাজ করে। তবু কিসের যেন একটা অভাব মনকে কারণে অকারণে ব্যথিত করে তুলতো। পৌষমেলায়, দোলে, আরো নানান উৎসবে দূর দূরান্তর থেকে কত অতিথি আসেন। শান্তিনিকেতনের কোনো বাড়ি খালি থাকে না।—নানান জাতি ও ভাষার মিলন কলরোলে গুরুদেবকে অনুভব করি। তিনি ত এইটেই চেয়েছিলেন। যেবার এসব উৎসবে ভীড় কম হয় আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। কারণ পৌষমেলা আমাদের পূজা উৎসবের মতই।

আপনাকে যখনই দেখি মনে হয় আনন্দে ভরপুর। এ প্রসন্নতা হয়ত তাঁর সঙ্গ থেকেই পাওয়া। অবশ্য দেখা হয় আর কতটুকু সময়ের জন্যই বা। তবু একটা প্রশ্ন মনে জাগে—আপনার মনে কখনও কোনো অভাব বা অপূর্ণতা-বোধ জাগে নি?

জ্ঞান হয়ে অবধি কবির সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য ঘটেছিলো। শান্তিনিকেতনের সেই দারিদ্র্যের যুগ থেকে শুরু করে প্রাচুর্যের যুগ অবধি ওঁর সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম। ওঁকে দেখতাম সকলরকম পার্থিব সুখ উপেক্ষা করে কেমন করে নিজেকে কাজের মধ্যে ঢেলে দিতেন। চোখের সামনে তাঁর সেই জীবন দেখে অজ্ঞাতেই মনটা এমনভাবে গড়ে উঠেছিলো যে কোনো সুখ বা আরামকে বড় করে দেখতে শিখি নি। তাই অভাববোধও জাগে না। মনে আছে 'শ্যামলী'তে মাটির ঘরের চারদিকে খোলা। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের ধু-ধু রোদের গরম হাওয়া ঝড়ের মত বয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে বসেই কবি লিখে যাচ্ছেন। সেখানে এক মুহূর্তের জন্য গেলেও যেন গরম হাওয়ায় শরীর ঝলসে যায়। কিন্তু কবির নির্বিকারভাব দেখে কেউ সে কথা মুখে আনতেও লজ্জা পেতো। আহার করতেন নামমাত্র। এ দৃশ্য সবসময় সামনে দেখেছি বলেই মেটিরিয়াল কোনো কষ্টকে কষ্ট ভাবতে পারি নি। এটা তাঁর আশীর্বাদ বলতে পার কিংবা সংস্পর্শের প্রসাদ। এটা কেন হয়েছে কিভাবে হয়েছে বলা মুশকিল। যেমন ধর সকালবেলার আলোয় বাজে বিদায় ব্যথার ভৈরবী—শরৎকালের সকালের আলোয় যেন বিদায়-ব্যথার সুর বাজে, এটা বাঙালী হৃদয় যেমন বুঝবে অন্য কোনো প্রদেশের লোকের পক্ষে তেমন করে বোঝা সম্ভব নয়।

প্রথম কবির গান কোলকাতায় ব্যাপকভাবে গাওয়া হলো কি তাঁর জন্ম জয়ন্তী উৎসবে?

হ্যাঁ, তাঁর ৭০ বছরের জন্মোৎসন পালন করা হয়েছিলো। দীনুদা, বিবিদি প্রায় ৭০।৭৫ জন শিল্পীকে নিয়ে গুরুদেবের গানের আয়োজন করেন। বেশীর ভাগই শান্তিনিকেতনের বাইরের—কোলকাতার শিল্পী—যাঁদের গান আমরা কেউ শুনি নি। গুরুদেবও শোনেন নি। এসব দিকে তাঁর মনে এতটুকুও 'কিন্তু' ছিলো না। ইয়ং জেনারেশন তাঁর গান গাইবেন, বুঝবেন,

এটা তিনি অন্তর থেকেই চাইতেন।

গানের সম্বন্ধে তাঁর কোনো বিধিনিষেধ ছিলো না?

প্রথম দিকে একেবারেই ছিলো না। তখন তাঁর গান যে-কেউই নিজের বা অন্যের সুরে গাইতেন। বার্ক সাহেব তাঁর গান গেয়েছিলেন। উদাহরণ সুর কোনোটিই সঙ্গীত রসিকের মনোহরণ করবার মত নয়। কিন্তু কবি বাধা দেন নি। কারণ তিনি চেয়েছিলেন এ-গানের অনুভূতিটা সবার মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ুক।

১৯২৫ সাল থেকে বিশ্বভারতীর অনুমতি, রয়্যালটি ইত্যাদির প্রবর্তন করা হয়। প্রথমত শান্তিনিকেতন গড়বার জন্য অর্থের প্রয়োজন ত ছিলোই। তাছাড়া এ-গানের স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার তাগিদটাও কম নয়।

এই প্রসঙ্গেই জিগ্যেস করছি গায়কী সম্বন্ধে তাঁর কি কোনো নির্দিষ্ট রূপ বা নকশার ধারণা ছিলো?

একেবারেই না। বিভিন্ন গাছে নানা রং ও গন্ধের ফুল ফুটে ওঠার মতই গায়ক গায়িকার কণ্ঠ, সঙ্গীতসংস্কার ও সৌন্দর্যবোধ দিয়ে গড়ে ওঠে তাদের গানের এক্সপ্রেশন। এখানে কোনো নিয়ম বেঁধে দিলে গানের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগটা নষ্ট হয়ে যায়। —এ সম্বন্ধে গুরুদেবের উদারতা ছিলো আমাদের ধারণার অতীত।

একটি উদাহরণ। সাহানা দেবী ছিলেন এদিক দিয়ে তাঁর সবচেয়ে স্নেহের পাত্রী। তাঁর গাওয়া গান সম্বন্ধে গুরুদেবের অভিমত ছিলো—তুমি যখন আমার গান করো শুনলে মনে হয় আমার গান রচনা সার্থক হয়েছে।

কিন্তু সাহানা দেবী ত গাইতেন দিলীপ রায়ের ছাঁদের গান? ওঁর জন্য তিনি সেই ধরনের সুরের গানই রচনা করতেন। শিল্পীর স্ব-ধর্ম কথাটায় উনি ভারী বিশ্বাস করতেন। তার ওপর চাপ দিয়ে স্বভাববিরুদ্ধ কিছু করিয়ে নেবার ওপর তাঁর আস্থা একেবারেই ছিলো না।

তাঁর গানের সঙ্গতে পাশ্চাত্য যন্ত্র বা সঙ্গীত প্রয়োগের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে—

এ সম্পর্কে একটা কথাই বলতে পারি। ওদেশের জীবনধারা অনুসারেই গড়ে উঠেছে সঙ্গীতচিন্তা। ওদের গানে স্বর প্রয়োগের পদ্ধতি হার্মানাইজেশন—সবকিছু ওদের সঙ্গীতের এক্সপ্রেশনের সঙ্গে সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে যায়। সেই-রকম যদি গানের ভাবের বিকাশের সহায়ক হয়ে ওঠে সেখানে ইস্টার্ন বা ওয়েস্টার্ন মিউজিক এরকম কোনো জাত বিচার নিরর্থক। আর যদি ভাবের অনুকূল না হয় তবে কোনো মিউজিকেরই সার্থকতা নেই।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রেরণা কবিচিত্তকে দুলিয়েছিলো। দুবার মাত্র ঐ সুরের মাতন লেগেছে তাঁর গানে। ব্যস্—তারপর আর না। আর ঐ দুবারই এমন সহজে গানের ভাবের সঙ্গে সুর মিশেছে যে তাকে আমাদের বলে মেনে নিতে কোনো দ্বিধাই জাগে না। বাল্মীকি প্রতিভার গানে চরিত্রের প্রয়োজনেই তিনি সি বি এফ সবরকম স্কেলই ব্যবহার করেছেন—কিন্তু

চরিত্রের বক্তব্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে এমনভাবে বিভিন্ন স্কেলের অবতারণা করা হয়েছিলো যে সে সুর কান মন কোথাও প্রবেশের কোনো বাধা ঘটে নি। এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ যদি সৃষ্টি করতে কেউ পারে, তাতে আপত্তির কারণ নেই। শুধু দেখতে হবে সৃষ্টির নামে অপসৃষ্টি না হয়।

বাংলাদেশে (এখনকার বাংলাদেশ অর্থে নয়) রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গে পঙ্কজ মল্লিক, সায়গল, কানন দেবীর ভূমিকা নিশ্চয় স্বীকার্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি দিকও চিন্তা করার আছে। কোন সূত্রে ধরে কোন বস্তু কখন কি রূপ নেয় সে কথা কেউ-ই বলতে পারে না।

গুরুদেবের গান নিজের শক্তিতেই চলবে। ও নিয়ে আমাদের মত মানুষের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তিনি যে বীজ রোপণ করে গেলেন, তারই ফসলের প্রাচুর্য দেখে আজ আমরা দিশেহারা। কিন্তু এ-কথা যেন না ভুলি, তাঁর গানের শক্তির উৎস রয়েছে তাঁরই অনুপম ব্যক্তিত্বে। জনপ্রিয়তা সৃষ্টির প্রধান অংশীদার কে এ বিচার অনেকটা 'রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি'র মতই।

আজ গুরুদেবের গান দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আরও পড়বে। আমার কেন জানিনা কেবলই মনে হয় এমন একদিন আসবে সেদিন চৈতন্যদেবের মতই গুরুদেব গ্রামে গ্রামেও পূজা পাবেন। যারা তাঁর কাব্য দর্শন কিছুই বোঝে না (চৈতন্যদর্শন সাধারণ মানুষের মধ্যে ক'জন বোঝেন ?) তাদের কাছেও তিনি আপনার জন হয়ে উঠবেন।

বাউল গানে দ্যাখো না ? অনেক হেঁয়ালী আছে। এক কথার অনেক মানে। সেসব গানের মানে বুঝতে হলে আমাদের বই খুলতে হবে। কিন্তু ওরা সহজ আনন্দে গেয়ে যাচ্ছে। অমনই মুক্ত প্রাণের প্রবাহে তিনি মিশে থাকবেন।

শুভ গুহঠাকুরতা

"রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের স্বতন্ত্র কোনো পরিচয় নেই। তাঁর সঙ্গে মিশে থাকাতেই আমাদের গৌরব।"

সুরের আগুনের আনন্দযজ্ঞ দীপ্ত হয়ে উঠেছে এক একটি দীপের মতই এক একটি শিল্পী-ব্যক্তিত্বের আলোয়। শিল্পীখ্যাতি এবং জনপ্রিয়তার বিপুল গৌরবের অধিকারী তাঁরা—জীবনব্যাপী সাধনার স্মরণীয় সার্থকতায় ধন্য।

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কোনো গৌরবের দাবী করেন না, তবু অনস্বীকার্য অবদানের অফুরন্ত ঐশ্বর্যে—তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছেন—তাঁর ঋণও রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী মাত্রেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবেন।

গীতবিতান ও দক্ষিণীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা—রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই স্বর্ণযুগের এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কবিগুরুর গানকে বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেবার বিরাট স্বপ্ন তিনিই দেখেছিলেন এবং নিরলস সাধনা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা দিয়ে এ স্বপ্নকে রূপায়িতও করলেন।

অকরুণ বাস্তবের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণেও তাঁর প্রাণরস ছিলো দুর্বার, অপ্রতিহত। প্রচণ্ড শক্তিতে পথের বাধা চূর্ণ করে মহৎ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে এটাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—ম্যান ডাজ নট লিভ বাই ব্রেড অ্যালোন। আমাদের জীবনে দেহের শ্রীহীন দাবী যতখানি সত্য তার চেয়ে কোনো অংশে কম সত্য নয় অন্তরের অতলের অমৃত পিপাসা।

বরিশালের এক বিদগ্ধ পরিবারের সন্তান শুভ গুহঠাকুরতা। ভাল করে চেতনা জাগবার আগেই যার কণ্ঠে অনুরণিত—রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, সুরসাগরের—গানের সুর চেতনায় নিবিড় হয়ে উঠেছিল। এই গানই অলক্ষ্যে তাঁর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। জীবিকার দাবী যখন নির্মম আক্রমণে কৈশোরের রঙীন স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিতে চেয়েছে, রুক্ষ মাটিতে দাঁড়িয়ে তার দাবীকে স্বীকার করে নিয়েও আকাশের দিকে মাথা তুলে সুরের ধ্রুবতারাকে প্রণাম জানাবার এই বিস্ময়কর শক্তিই বুঝি তাঁর সহজাত সম্পদ, বিধিদত্ত প্রতিভা।

অত্যন্ত অল্প বয়সে (সাধারণত যে বয়সে শুধুই স্বপ্ন দেখার) বাবাকে হারাতে হলো এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি সারা সংসারের দায়িত্ব বহন। অপরিণত বয়সেই পরিণত মনের দিব্যদৃষ্টিতে শুভ গুহঠাকুরতা বুঝেছিলেন আজকের যুগ কাঞ্চনকৌলিন্যের যুগ, নিভৃত প্রাণের দেবতাকে পূজারতি করার মত মনও হয়ত একদিন মরে যাবে—যদি-না প্রতিদিনের লৌকিক জীবন অর্থ এবং সামর্থ্যে শ্রীমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

সেই কারণেই জীবনসংগ্রামকে বীর সৈনিকের মতই বরণ করে নিয়েছিলেন সেদিনের দৃঢ়চেতা কিশোর—আজকের প্রসন্ন, প্রদীপ্ত শুভ গুহঠাকুরতা।

জীবনের দাবীতে জীবিকার সন্ধানে ঘুরলেও ছোটোবেলার সেই স্বপ্নদেখা মনটিকে শুভ গুহঠাকুরতা এক মুহূর্তের জন্যও হারান নি। ফুরসত পেলেই চলে যেতেন শান্তিনিকেতনে। সেখানে মুক্ত আকাশ, বাতাস, ফুল, গাছ-আলো-ঘেরা শান্তিনিকেতন ও তার অজস্র গানে গানে সমস্ত দ্বিধা ও সংশয়ের বাধা ছিঁড়ে যেত ধীরে ধীরে, অজান্তেই।

এই সময়েই শৈলজাদা গ্রীষ্ম এবং পুজোর দুটি বড় বড় ছুটি আমাদের বাড়িতে কাটাতেন। এবং তাঁর সরস সঙ্গ ও গানের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে অন্তর ভরে দিতেন। কবির শেষ দশ বছরের গান ও সুরের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। সেইসব গান ও তার পটভূমিকা জানবার প্রশস্ত সুযোগ মিলেছিলো সেই সময়েই। সেই কারণেই কবির গান এমনই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলো যে সে গান গাওয়া বা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তার পরিবেশ এবং সেইসময়ে কবির মনের গতি ও প্রকৃতি চোখের সামনে দেখতে পেতাম। এ বিষয়ে মনের মধ্যে অজান্তেই যেন একটা সংস্কার গড়ে উঠেছিলো। শুভ গুহঠাকুরতা যৌবনের সেই রঙীন দিনগুলিতে ফিরে যান।

আপনি.ত কাজ ও পড়াশোনার অবকাশে গান গাইতেন। হঠাৎ রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়বার আইডিয়া মাথায় এলো কেমন করে?

এ আইডিয়াও শৈলজাদার কাছেই পাওয়া।—একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে এসেই খাবার টেবিলে বসে কথায় কথায় শৈলজাদা বললেন—গুরুদেবের একটা বড় দুঃখ ছিলো তাঁর গান কেউ নিলো না। শান্তিনিকেতনে মুষ্টিমেয় কয়েক-জনের মধ্যেই এতবড় একটা ঐতিহ্য সীমাবদ্ধ রইলো। অথচ তিনি সকলের জন্যই সবরকম গানের ধারা দিয়ে এতবড় সৃষ্টি রেখে গেছেন।

কথাটা আমার মনে বড় লেগেছিলো। বললাম, শৈলজাদা, কিছু ভাববেন না। আগে বি-কমটা পাস করে নিই। তারপর আপনারা ত রয়েইছেন। সবাই মিলে উঠে পড়ে লাগা যাবে। মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পাতন।

একথা যে তাঁর অবসরের অলস স্বপ্ন নয় প্রাণের নিবিড় আকুতি—আজকের সঙ্গীতমুখর দক্ষিণী ও তার স্রষ্টার বহুমুখীন কর্মধারায় সেই কথাটিই যেন ব্যাপ্ত।

কথায় ও কাজে, স্বপ্নে ও বাস্তবে, আদর্শে ও তার রূপায়ণে কবিতার ছন্দের মত এমন মিলন কিন্তু নির্বাধ স্বাচ্ছন্দ্যেই হয় নি।

প্রথমেই উল্লেখ করেছি, জীবিকার জন্য শুভ গুহঠাকুরতা বেছে নিয়েছিলেন বাণিজ্যকে। পরিশ্রমে, সততায়, প্রচেষ্টার আন্তরিকতায়—এই পথ বেয়েই ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা উপচে পড়লো তাঁর জীবনে, সংসারে। সে-ও এক মস্তবড় সাধনার অধ্যায়। কিন্তু এখানে আলোচ্য তাঁর সঙ্গীতসাধনা এবং বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত।

শুভ গুহঠাকুরতা আমাদের সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার 'শুভদা'

হয়ে উঠেছেন শুধুমাত্র তাঁর সঙ্গীত অথবা সংগঠন প্রতিভার কারণেই নয়। যে পরিমিতিবোধ থাকলে সৌভাগ্যের চরম মুহূর্তেও মানুষ তার মনের ভারসাম্য হারায় না নিজে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেও অন্যের প্রতি উন্নাসিক মনোভাব পোষণ করে না এবং বিরুদ্ধমতের মানুষের প্রতিও সহিষ্ণু হবার মত উদারতা রাখে—সেই অসাধারণ মানসিক ভারসাম্যের অধিকারী বলেই সকলেই তাকে আপনার ভাবতে পারে। সহজ মানুষ ও সংগঠকের এ হেন সমন্বয় বিরল।

বাবাকে হারানোর সেই অসহায় অধ্যায়ে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়েই যেমন করে স্থিতধী হয়ে জীবন ও পারিপার্শ্বিককে চিনে নিয়েছিলেন—আজ ঠিক তেমন করেই নির্বিকার অবিচলিত চিত্তে কর্মক্ষেত্রের দাবী পূর্ণ করে যাচ্ছেন তাঁর শিল্পসমৃদ্ধ রমণীয় অট্টালিকার সুখী সংসারে। আলস্যে, বিলাসে সময়ের অপচয় ঘটান না বাড়ির একটি প্রাণীও! অনুগত সহধর্মিণী (সহমর্মিণীও), পুত্র পুত্রবধূ সকলেই রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুশিক্ষিত (রণো গুহঠাকুরতা ত নামকরা শিল্পীই) এবং অবসর সময়ে এঁরা প্রত্যেকেই এমন কোনো কাজেই রত হচ্ছেন যার জন্য সিরিয়াস মুড দরকার।

রবীন্দ্রসঙ্গীত শুভদার প্রাণ। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, অনুরাগ দেখে ভ্রম হওয়া অসম্ভব নয় যে তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতলোকেরই বাসিন্দা। যৌবনকালে তাঁর সবচেয়ে বড় আনন্দ ছিলো কোলকাতা শহরের প্রতিটি ক্ল্যাসিক্যাল কনফারেন্সে রাত জেগে গানবাজনা শোনা। ভীষ্মদেব, সায়গলের তখনকার দিনের একটা মস্তবড় আড্ডা ছিল শুভদার বাড়ি। ওঁর কাছেই শুনেছি তখনকার লালাবাবু ও ভূপেন ঘোষ মহাশয়ের যুক্তসঙ্গীত সম্মেলন হয়েছিলো পূরবী হল্-এ। সেই এগারো রাত জেগে তখনকার দিক্পালদের গান শোনার স্মৃতিচারণে এখনও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন তিনি। আমিও রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম যখন উনি বলছিলেন আবদুল করিম খাঁ সাহেবের কথা। প্রোগ্রামের আগে গ্রীনরুমে বসে খাঁ সাহেব সুর ভাঁজছেন। আগের আর্টিস্টের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। এবার তাঁর পালা। স্টেজ রেডী। শ্রোতারা অপেক্ষা করছেন। কিন্তু সে কথা তাঁর কানে যাচ্ছে কই? আপনমনে গেয়েই চলেছেন। অগত্যা উদ্যোক্তারা ঐ অবস্থাতেই তাঁকে ধরে স্টেজে নিয়ে গেলেন। সারেঙ্গীবাদক চলেছেন সারেঙ্গী ধরে। আর তার সঙ্গে গান গাইতে গাইতে স্টেজে গিয়ে বসলেন আবদুল করিম খাঁ সাহেব। এ দৃশ্য আজ ভাবা যায়? কিন্তু ফ্যাক্টস্ আর স্ট্রেঞ্জার দ্যান্ ফিকশন।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে এমন করে ভালবেসেছেন তবু রবীন্দ্রসঙ্গীতই হয়ে উঠলো ইষ্টমন্ত্র—?

এর জন্য আমি ঋণী শৈলজাদার কাছে। গান, নোটেশন—গাইবার পদ্ধতি সবই উনি এমন করে মনে পৌঁছে দিয়েছেন যে তার অমোঘ প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সহজ নয়। আর মুক্ত হতে চাও না—। কারণ এমন কোনো বিষয় নেই যা রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রতিবিম্বিত হয় নি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে লোকসান

কিছু নেই। আর সবার ওপর রয়েছে এ সঙ্গীতের কাব্যসৌন্দর্য যাকে বলা যায় আপন স্বরূপে আপনি ধন্য। এ আকর্ষণটাও বড় কম নয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি মনে রাখতে হবে—রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাল করে গাইতে হলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভিত্তি থাকা দরকার। নইলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রকৃতি, তার ক্যারেক্টর এসব সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা হয় না।

রণো বাজিয়ে শোনালো শুভদার তরুণ বয়সের একটি রেকর্ড 'ও তার হাতে ছিলো'। তিলক কামোদ ও দেশ-এর আলতো স্পর্শে কি মধুর হয়ে উঠেছে গানের রংবাহার। আর তেমনই মনোরম ছন্দের দোলা। এছাড়াও ছিলো 'আমার কণ্ঠ হতে, আমি তখন ছিলেম অন্ধ'। সব ক'টিই সুন্দর। কিন্তু খুব বেশী শোনা যায় না বলে কিংবা কি জানি কেন 'হাতে ছিলো' গানটি মনকে বেশী স্পর্শ করলো।

রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রথম শুনেছিলেন কার কণ্ঠে ?

তখন রেকর্ড ছিলো পঙ্কজ মল্লিক, কানন দেবীর। সেইসব গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। অনেক পরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গভীরে মন প্রবেশ করেছে শান্তিনিকেতনে গিয়ে শৈলজাদার সংস্পর্শে এসে। সে কথা ত আগেই বলেছি! আমি যখন রেডিওতে গাইতে শুরু করি ১৯৪২ সালে তখন আমরা ক'জনই রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতাম—পঙ্কজবাবু, হেমন্ত, সুজিত, দ্বিজেন চৌধুরী।

দক্ষিণী গড়ে তুলেছিলেন কিভাবে ?

দক্ষিণী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আট বছর আগে গীতবিতান দিয়েই আমার রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুরু। আমি চেয়েছিলাম শান্তিনিকেতনের বাইরে রবীন্দ্রসঙ্গীত তার যথার্থ রূপে ছড়িয়ে পড়ুক। হিন্দুস্থানী গান শিখতে হলে যেমন ভাল ওস্তাদের কাছে নাড়া বাঁধতে হয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতও রবীন্দ্রসঙ্গীতরূপে জানতে বা শিখতে হলে সত্যিকারের গুরুর শিক্ষা দরকার। অনাদিদা, কনক বিশ্বাস, শান্তিনিকেতন থেকে শৈলজাদা, শান্তিদা, মোহর, অরুন্ধতী সবাইকে নিয়ে গীতবিতান শুরু করলাম ১৯৪১ সালের ৮ ডিসেম্বর, ১১৮ নম্বর রাসবিহারী অ্যাভিনুতে। কিন্তু প্রথম দিনেই বাধা পড়তে সবারই মন খুব খারাপ হয়ে গেলো।

বাধা পড়লো কিভাবে ?

সেইদিনই ডঃ কালিদাস নাগ অ্যারেস্টেড হলেন। সারা কোলকাতায় ইভাকুয়েশন।···কিন্তু আমি থামিনি। এই ঘটনার ছ'মাস বাদে আবার গীতবিতানের যাত্রা শুরু হলো আশুতোষ কলেজের লাইব্রেরীর ওপরতলায়।

রাত্রে কমার্স ক্লাস করতাম, দিনের বেলা গীতবিতান ও ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ। সে এক উদ্দীপনার যুগ গেছে। যত কাজ করছি, কাজের উৎসাহ আরো বেড়ে যাচ্ছে। শান্তিনিকেতনের বাইরে সেই প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষাকেন্দ্র। আইডিয়াটার মধ্যে একটা অভিনবত্ব ত ছিলই। তারপর দেখলাম গীতবিতানের অর্থসংগ্রহের জন্য প্রথম যখন নিউ এম্পায়ারে শো করলাম

অরুন্ধতী, মোহর, নীলিমাদের নিয়ে—হাউসফুল। তখনকার দিনে এটা কি ট্রিমেণ্ডাস্ সাকসেস ভাবা যায় না !

অবশ্য এসব বিষয়ে আমার প্রধার সহায় ছিলো বন্ধু সুজিতরঞ্জন রায়। তাঁর সাহায্য ছাড়া এতবড় কাজ এত তাড়াতাড়ি শুরু করতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করার অল্পদিনের মধ্যেই অনুভব করলাম, কবির দুঃখের কোনো কারণ ছিলো না। অন্তহীন সৃষ্টির মধ্যে ডুবে থাকলেও গানই ছিলো তাঁর হৃদয় জুড়ে। তাঁর দিব্যদৃষ্টির বলেই বুঝেছিলেন গানই পরে বড় হয়ে উঠবে সাধারণ অসাধারণ সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই। উত্তরযুগের মানুষ যতবেশী শিক্ষিত ও মার্জিত মন হবে ততবেশী আগ্রহে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে গ্রহণ করবে। আজ চৌত্রিশ বছর বাদে দেখছি রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারাটি কিভাবে প্রবল হয়ে উঠেছে।

দক্ষিণীর জন্ম হলো কিভাবে ?

গীতবিতানের কর্মমন্ডলীর সঙ্গে মতান্তর হওয়ার পর একবছর কিছু করিনি। তারপর, মানে গীতবিতান শুরু হওয়ার আট বছর বাদে দক্ষিণীর যাত্রা শুরু হলো। আজকের দক্ষিণীর খবর ত আমার চেয়ে তোমারাই বেশী জানো—হাসি-ঝলমল চোখে শুভদা চেয়ে রইলেন।

এই ত দু বছর আগেই দক্ষিণীর রজতজয়ন্তী উৎসবে কোলকাতাবাসী কবিমানসের নানামুখী রসধারার স্রোতে অবগাহনের সুযোগ পেয়েছে। গান, নাচ, নৃত্যনাট্য, নাটক, আলোচনাচক্র কোনোটাই বাদ ছিলো না।

অনেকদিন আগের কথা বলছি। তোমরা যখন ছোটো ছিলে, হয়ত জানো না। কিন্তু সাংবাদিকতার প্রয়োজনে জানাবার দরকার বলেই জানাচ্ছি—ক্ল্যাসিক্যাল কনফারেন্সের ঢঙে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন দক্ষিণীর ব্যানারে আমিই প্রথম প্রবর্তন করি। এবারের রজতজয়ন্তী উৎসবের কনফারেন্স ও তিনদিনের অনুষ্ঠানে কোনো শিল্পী বাদ যান নি। ছোটোগল্পের নাট্যরূপও (রবিবার, রাসমণির ছেলে, নষ্টনীড়) আমাদেন পরিকল্পনা। এছাড়াও আলোচনাচক্রে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুরু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসাধক, সাংবাদিক, শিল্পী, সংগঠক অধ্যাপক ও শহরের বিশিষ্ট বিদগ্ধ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানাদিক মেলে ধরেছি যাতে জিজ্ঞাসু ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিধিকে বিস্তৃত করতে পারেন।

এই প্রসঙ্গেই একটা কথা জানিয়ে রাখি। গীতবিতান থেকে শুরু করে দক্ষিণীর আজকের যুগ অবধি প্রতিটি অধ্যায়ে প্রতিটি কাজে যাঁর অকুণ্ঠ সহায়তা পেয়েছি তিনি হলেন সুকমলকান্তি ঘোষ। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। যখন অন্য কোনো পত্রিকা আমাদের প্রতিষ্ঠানকে চলতি বাংলায় যাকে বলে কোনো পাত্তাই দিতো না, অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তরে নিয়মিতভাবে আমাদের সমস্ত অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশিত হতো। এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাই সেই সে দৃশ্য। গীতবিতান প্রতিষ্ঠার সময় সুকমলদার

ঘরে গেলাম। পত্রিকা হাউসের দোতলায়। উনি পত্রিকা যুগান্তরের বিভাগীয় সম্পাদকদের ডেকে তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন—দীর্ঘকাল ধরে আমি শুভকে জানি, দেখো এর প্রতিষ্ঠানের সকল অনুষ্ঠান যেন ভালোভাবে আমাদের কাগজে ফ্ল্যাশ কয়া হয়। এমনদিন আসবে যেদিন শুভর কনট্রিবিউশন বাঙালী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

সুকমলদার ভবিষ্যৎবাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে।

সে তোমরা বুঝবে, শুভদার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত। তবে এ হাসি অহমিকার হাসি নয়। যোজন পথের বাধা অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছলে মানুষের অন্তরে যে পরিপূর্ণতার পরিসমাপ্তি আসে তারই ছোঁওয়া শুভদার হাসিতে।

আর একটা কথা তোমরা হয়তো জানো না, আজ রবীন্দ্রনাথের হাজারো উৎসবে সারা কোলকাতা পরিপ্লাবিত—এর মূলে যে ক'টি মানুষের যথার্থ অবদান আছে সুকমলদা তাঁদেরই একজন। রবীন্দ্রমেলার প্রতিষ্ঠানদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন সুকমলকান্তি ঘোষ। নিজেকে জাহির করা অথবা নিজের কৃতিত্বের ঢাক নিজে পেটানো ওঁর অভ্যেস নেই বলেই হয়তো এ খবর অনেকে জানে না। আজ রবীন্দ্রসংস্কৃতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের অভিভাবক সেজে অনেকেই যখন মাথার ওপর লাঠি ঘোরান সুকমলদা নিজেকে ব্যাকগ্রাউণ্ডে রেখে দিয়েছেন। আত্মপ্রচার জিনিসটাই ওঁর ধাতে নেই!

রবীন্দ্রসঙ্গীতে গায়কী সম্পর্কে একটা বিতর্ক আজকাল মাঝে মাঝে উঠতে দেখা যাচ্ছে। এসম্পর্কে আপনার মতামত?

গায়কী কথাটা আসে গানের ঘরানা থেকে। ওটা হলো ক্ল্যাসিক্যাল গানের পরিভাষা। এখানে কথাটা হওয়া উচিত ঢং বা ভঙ্গি। এ জিনিসটা কোনো বাঁধাধরা সাধারণ নিয়মের মধ্যে পড়ে না। প্রত্যেক শিল্পীর মেজাজ ও প্রকৃতি অনুযায়ী তার স্টাইল গড়ে ওঠে। কণিকার গাইবার ভঙ্গি সুচিত্রার চেয়ে আলাদা। হেমন্তর স্টাইলের সঙ্গে জর্জের গাইবার ভঙ্গির কোনো মিল নেই। অথচ এঁরা সবাই রবীন্দ্রসঙ্গীতই গাইছেন এবং স্বরলিপি-নির্দিষ্ট সুরেই।

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেবার সময় আপনি কোন দিকটির ওপর জোর দেন বেশী?

শৈলজাদার কাছে শেখা শান্তিনিকেতনে শোনা স্টাইলের ওপর। শৈলজাদা কবির শেষের দিকের শ্রেষ্ঠ দশ বছরের গানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন একথা আগেই বলেছি—

এই খাঁটি শান্তিনিকেতনী স্টাইলটি কি?

ধ্রুপদের কাঠামোর সঙ্গে টপ্পার মীড়ের অলঙ্করণ। সংকীর্ণতামুক্ত মন নিয়ে রুচি ও যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানান মিশ্র রাগ, বাউল, কীর্তন, লোকসঙ্গীতের বৈচিত্র্যে কবির গানের ডালি ভরে উঠলেও যে গানগুলি একান্তভাবেই রাবীন্দ্রিকতার মধ্যের অলংকার ধ্রুপদের মীড় গমক ও টপ্পার স্বরক্ষেপণের মিলনে এমন এক মর্যাদাগম্ভীর মাধুর্যের সৃষ্টি হয়েছে যার

তুলনা একমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতেই মেলে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার সময় যে কথাটি সবচেয়ে বেশী মনে রাখা দরকার তা হলো এ সঙ্গীতের কাব্যধর্মিতা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি ও সুরকার। সুরের সৌন্দর্য সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কিন্তু ভারী স্পর্শকাতর ছিলেন কথার সৌন্দর্য বিষয়ে। এখানে এতটুকু গলতি তিনি বরদাস্ত করতেন না। তাঁর গান যাঁরা গাইবে কথার মাধুর্যের বিকাশের প্রতি তাদের লক্ষ্য থাক এই ইচ্ছেই তিনি নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। যেমন গায়কেরা সঙ্গীতকে যে আসন দেন, আমি-তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই।... তাঁহারা গানের কথার ওপর সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের ওপর দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।

রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে আর যে বস্তুটি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেটি হলো ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্বাভাবিক মৃদু ও তীব্রস্বরের ব্যবহার! কাব্যধর্মী সঙ্গীতে তার সপ্তকের স্বরগুলি তীব্রভাবে উচ্চারিত হলে বড্ড শ্রুতিকটু লাগে। কী, যেন, তবু, যদি এই রকম কথায় রবীন্দ্রনাথ ব্যাপকভাবে মীড় প্রয়োগ করেছেন কখনও মনের অস্ফুট প্রশ্ন কখনও বা দ্বিধাকে রূপ দেবার জন্য। কথা বলার মত গাইবার সময়ও এইসব কথার উচ্চারণে জোর দিলে এক্সপ্রেশনেও প্রাণের ছোঁওয়া লাগে।

প্রথমে শ্রোতা হিসেবে পরে শিক্ষকের ভূমিকায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিপুল অভিজ্ঞতা আপনার আছে ; এসম্বন্ধে কিছু বলবেন না ?

শ্রোতা হিসেবে এই কথাই বলব—প্রথমের দিকে পঙ্কজ মল্লিক, কানন দেবী, কনক দাস এবং সায়গলের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনি। পঙ্কজ মল্লিকের সম্বন্ধে কোনোরকম বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে খোলামনেই বলছি, অসাধারণ কণ্ঠ, সঙ্গীতব্যক্তিত্ব ও অনুভবের শক্তিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত তাঁর পরিবেশনায় এমন একটি সরস রূপে পৌঁছেছে যাতে অভিভূত না হয়ে উপায় নেই। ওঁর কণ্ঠে 'তোমার আসন শূন্য আজি' যখন প্রথম শুনি গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিলো।

সায়গলের গানে কণ্ঠমাধুর্য আর শিল্পীসুলভ নিবিড়বোধের মিলনে একটা আবেদন সৃষ্টি হয়ে যেতো। কানন দেবীর কণ্ঠে উচ্চারণ, তাছাড়াও শিক্ষার বনেদটা খুব ভালো ছিলো। এঁদের পরের যুগে জনপ্রিয়তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিরাট অবদান আছে একথা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। হেমন্তের ওপর আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা আছে এই কারণে যে, তার ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সচেতন। সে জানে কোথায় তার অবাধ অধিকার, কোথায় নয়। এই পরিমিতিবোধটুকু আছে বলেই শিল্পী হেমন্ত তার নিজের জায়গায় সসম্মানে দাঁড়িয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথের গান বা অন্য কোনো গান কোনো গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়ে থাক এরকম সংকীর্ণ মনোভাবের আমি ঘোর বিরোধী। এ গানে ব্যাপকতা

আসুক, জনপ্রিয়তার পরিধি বিস্তৃততর হোক যে কোনো রবীন্দ্র অনুরাগীই এটা চাইবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিজস্ব চরিত্র বজায় না থাকলে জনপ্রিয়তা অর্থহীন। বৈশিষ্ট্য-বর্জিত প্রচার অপ-প্রচারেরই সামিল।

অত্যন্ত আনন্দেও কথা আজ একই আসরে হেমন্ত মুখার্জি, সুবিনয় রায় দুজনেই গাইছেন এবং দুজনের গানই শ্রোতারা আগ্রহের সঙ্গে শুনছেন। কিন্তু সুবিনয় রায়ের এই ধ্রুপদী গান অবধি শ্রোতাদের মনকে পৌঁছে দেওয়ায় পঙ্কজ মল্লিক, কানন দেবী, সায়গল, হেমন্ত সবারই সম্মিলিত অবদান আছে। নাক উঁচু দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলে যোগ্য ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করার মত অ-রাবীন্দ্রিক বস্তু আর কিছু নেই।

প্রথম যুগের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এখনকার যুগের শিক্ষার্থীদের কোনো পার্থক্য আছে?

প্রথম যুগে সংখ্যায় কম হলেও সত্যিকারের শিল্পী তৈরী হতো। এখন গায়ক-গায়িকার সংখ্যা বাড়লেও সত্যিকারের শিল্পীসংখ্যা কম। গানের মধ্যে কতটা রাগের ছায়া থাকবে, কতটা কাজ এবং কতটা ভাব এই বোধ না এলে শিল্পীমনের অধিকারী হওয়া যায় না। শিক্ষা দিয়ে মেজেঘষে শিল্পী তৈরী করার কথা ভেবেই কিন্তু আমি এই মন্তব্য করছি। একমাত্র ব্যক্তিক্রম প্রতিভার ক্ষেত্রে। সত্যিকারের প্রতিভার আবির্ভাব ত যে কোনো ক্ষেত্রেই বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে। তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

শুভদার অজস্র রিসার্চ ওয়ার্কের মধ্যে তাঁর লেখা 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা' বইখানি শুধু তাঁর সঙ্গীতচিন্তার উজ্জ্বল নজীর নয়—এ বইখানি শান্তি-নিকেতনের পাঠ্য-পুস্তকরূপে গৃহীত হয়েছে।

শুভদার মধ্যে যে বস্তুটি আমায় মুগ্ধ করে সেটি হলো আর্টের ক্ষেত্রের বড় জিনিস—ঠিক জায়গায় থামতে জানা। প্রাণবন্ত গান গেয়ে মন দুলিয়ে দেবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি গান গাইবার প্রলোভনকে সংযত করে শিক্ষকতার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কারণ গাওয়া ও শেখানো দুটো পরস্পর-বিরোধী বস্তু। একটিকে সার্থক করে তুলতে হলে অপরটিকে বিদায় দিতেই হয়। এই সংযমের শাসনকে নিজের মধ্যে সত্যি করে তুলতে পেরেছেন বলেই তিনি এমন সার্থক গুরু হয়ে উঠতে পেরেছেন। আবার এই অন্তর্দৃষ্টির তাগিদেই এখনও প্রবল কর্মশক্তির অধিকারী হয়েও দক্ষিণীর দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন পুত্র সুদেব গুহঠাকুরতার হাতে। ওঁর মত হলো যথাসময়ে আসন ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী যুগের কর্মীদের তৈরী হবার সুযোগ না দিলে দক্ষিণীর উদ্দেশ্যই ত ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণী শেষ হয়ে যাক এটা আমি চাই না। আর ওদের যদি ভুল-ত্রুটি কিছু ঘটে শুধরে দেবার জন্য আমি ত রইলামই। ক্ষমতা ফুরিয়ে যাওয়ার 'পর থেকেও-না-থাকার চেয়ে ক্ষমতা থাকতে থাকতেই না থেকেও থাকাতেই আমি বিশ্বাসী।

আজকের রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তার এই উদ্বেল মুহূর্তেও অনেকের মনে

সন্দেহ জাগছে এর স্থায়িত্ব সম্পর্কে। এ সম্পর্কে কি বলবেন?

রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই রয়েছে এ প্রশ্নের উত্তর: এই যে আমাদের নতুন জীবনের চাঞ্চল্য, গানের মধ্যে এর কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তাই একদিকে গানবাজনার পরে অনাদরও যেমন লক্ষ্য করা যায় আরেকদিকে তেমনই আদরও দেখছি। আজকাল ঘরে ঘরে হারমোনিয়ম, গ্রামোফোন, পাড়ায় পাড়ায় কনসার্ট। এতে অনেকটা রুচিবিকার দেখা যায়। কিন্তু চিনি জ্বাল দেবার শুরুতে রসে অনেকটা পরিমাণ গাদ ভেসে ওঠে। সেই গাদ কাটতে কাটতেই রস ক্রমে গাঢ় ও নির্মল হয়ে আসে। আজ টগবগ শব্দে সঙ্গীতের সেই গাদ ফুটছে, পাড়ায় টেঁকা দায়। কিন্তু সেটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। সুখবরটা এই যে চিনির জ্বাল চড়ানো হয়েছে।

আজকের দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি সকলের উদ্দীপনার সম্বন্ধেও আমার ঐ একই কথা। বাড়তি কথাটা প্রথমেই বলেছি—এ সঙ্গীতের কাব্যমূল্য শিক্ষা-মার্জিত মনকে টেনে নেবেই।

আমার প্রশ্ন শেষ। আপনার নিজের কিছু বলার নেই?

নিজের বলতে আমার কি আছে বল? রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের স্বতন্ত্র কোনো পরিচয় নেই। তাঁকে নিয়েই আমাদের যা কিছু আস্ফালন, লম্ফঝম্ফ মানবই। তবু তাঁরই সঙ্গে মিশে আছি এইটুকুই আমাদের গৌরব।

শৈলজারঞ্জন মজুমদার

'সুর, লয়, সাহিত্য ও ভাব, এই সব ক'টি বস্তু মিলে গুরুদেবের গানের একটি যে বিশেষ ভঙ্গির সৃষ্টি হয়েছে, সারা মনপ্রাণ দিয়ে আমার ছাত্রছাত্রীদের সেইটেই চিনিয়ে দিতে চেয়েছি।'

এ পর্যন্ত সুরের আগুন আপন ধর্মেই যেন সহস্রশিখায় জ্বলে উঠেছে, আর সে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। অনির্বাণ শিখার গতিপ্রবাহ স্বতঃস্ফূর্ত। আয়াসহীন, আনন্দেই এই অগ্নিস্রোত বয়ে চলেছে সকল শ্রেণীর শ্রোতার চিত্তে—হয়ত বা তাঁদের রসগ্রাহিতা এবং বৈদগ্ধ্যের কারণেই। তবু ইউনিভার্সাল শৈলজাদার প্রসঙ্গে এসে আমায় থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে বারেবারে। রবীন্দ্রসঙ্গীত গোষ্ঠীর মধ্যে শৈলজাদা এক খাপছাড়া চরিত্র, অনেকটা ক্ষ্যাপা বাউলের মত, যিনি খোঁজার নেশায় সারাজীবন ছুটেছেন আর ছোটার নেশার যে কোনো বিষয়ে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেও অশান্ত, অস্থির। এক কর্মলোক থেকে তিনি অন্য কর্মজগতের দিকে তৃষিত নয়নে চেয়ে থেকেছেন এবং যেন নিজের অগোচরেই কখন সেখানে পৌঁছেও গেছেন। কিন্তু সে জগতের আনন্দরস আকণ্ঠ পান করেও তৃপ্ত হননি। হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানের লক্ষ্যেও ছুটেছেন 'যাত্রী আমি ওরে যাত্রী আমি'-র অস্থিরতা নিয়ে।

এম এস.সিতে রসায়নশাস্ত্রে প্রথম হয়েও তাঁকে আইন কলেজে ভর্তি হতে হয়েছিলো নেত্রকোণার ডাকসাইটে উকিলপিতার কড়া নির্দেশে। গান তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য নয়। ব্যবহারিক জগতে ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি অর্জনই ছিলো তাঁর অভিভাবকদের আদর্শ। কিন্তু এহেন গীতহীন পরিবেশে বেড়ে উঠেও চিত্ত পিপাসিত রে গীতসুধার তরে। গানই হয়ে উঠল তাঁর প্রাণধর্ম। তাই নিশ্চিত আরাম আলস্যের ধ্রুবকে অনায়াসে বর্জন করে অধরা গানের ডাকে সাড়া দিতে তাঁর এতটুকুও বাধল না। তাঁর গুরুদেবের গানই এই অকূলে ভাসার আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু অসংখ্য গানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী হয়েও তিনি গায়ক হবার স্বপ্নে বিভোর থাকতে পারেন নি—হলেন শিক্ষক, পরে ভাণ্ডারী। তাতেও শান্তি নেই। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে যুগ থেকে যুগান্তরে পৌঁছে দেবার দিশারী হয়ে আজও তিনি কূলহীন সমুদ্রে তরী বেয়ে চলেছেন। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। এহেন চরিত্রকে ঠিক কোনখান থেকে শুরু করলে তাঁর প্রতি যথার্থ সম্মান দেখানো হবে ঠিক বুঝতে পারছি না। তাই বারবার লিখতে গিয়েও থেমে গেছি। আজ শিবচতুর্দশীর দিনে এই

কঠিন কাজে ব্রতী হলাম। কারণ মহাদেবের মতই তিনি আত্মভোলা, সদাপ্রসন্ন। আবার মহাদেবের মতই হঠাৎ অগ্নিমূর্তি হয়ে ওঠেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে অর্জন করা তাঁরই সঙ্গীত ধর্মের ব্যত্যয় দেখলে। এটা ভাল কি মন্দ, ন্যায় কি অন্যায় জানি না। তবু তাঁর এই অসংযমকে শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই। কারণ তোমারই গরবে গরবিনী হাম-এর প্রেরণা থেকেই এর জন্ম—অধিকারবোধের অহমিকায় নয়।

সে যুগে গানকে কেউ সঙ্গীতশিল্পরূপে দেখতেন না। দেখতেন বয়ে-যাওয়া ছেলেদের বিপথে নিয়ে যাবার অশুভ দূতরূপে। কড়া মেজাজের বাবা গানের ওপর ছিলেন খড়্গহস্ত। সুললিত কণ্ঠের অধিকারী শৈলজারঞ্জনকে তিনি স্কুল ফাংশনে একটি স্তোত্রগীতি গাইতে দিতেও নারাজ। তবু সেদিনের শৈলজা গানের প্রতি অনুরাগকে হৃদয়ে লালন করেছেন অভিভাবকের অকরুণ এবং নির্মম দৃষ্টি বাঁচিয়ে। যখন যেখানে ভাল গান শুনেছেন কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, বাউল, ভাটিয়ালী, রাগপ্রধান, লোকগীতি, সহজাত প্রতিভায় কণ্ঠে ধরে রেখেছেন। প্রাণ খুলে গাইবার অধিকার ছিলো না বলেই অসীম আকুলতায় মনটা আছড়ে পড়েছে তাঁরই চরণে যিনি চিরন্তন হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন গানের ওপারে। এই আকুলতাই তাঁকে পোঁছে দিয়েছে স্বয়ং কবিগুরুর চরণে।

জামতাড়ার স্কুলে পড়ার সময়েই মাস্টারমশাই সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছুটিতে কোলকাতায় নিয়ে আসতেন তাঁকে। তের থেকে সতেরো বছর অবধি এই আসা-যাওয়ার মাঝখানে তাঁরই সঙ্গে জোড়াসাঁকোয় যাবার সুযোগ ঘটেছে। তখনই সাহানা দেবীর গান শুনে এক অনির্ণেয় আবেগে মন দুলে উঠেছিলো। এমন গানও হয়?

১৯২১ সালে কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ, যখন শান্তিনিকেতনের একটি দল জোড়াসাঁকোয় এসেছিলেন বর্ষামঙ্গল উৎসবে। নাটোরের মহারাজ পাখোয়াজ বাজিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে, 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে' কবিতার আবৃত্তির সঙ্গে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে পূর্বরাগের শুরু তখন থেকেই।

ম্যাট্রিক পাস করে ১[illegible] সালে কোলকাতায় এসে তিনি ভর্তি হলেন বিদ্যাসাগর কলেজে। থাকতেন তাঁরই আত্মীয় অধ্যক্ষ সারদারঞ্জনের বাড়িতে। ক্রিকেট ফুটবলের আলোচনা ও সমালোচনায় সে বাড়ি সরগরম। কিন্তু এই গড্ডলিকা-প্রবাহ গান-পাগলা শৈলজারঞ্জনকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। তাঁর মনটা ঘুরতো স্বনামধন্য লেখক নীরদ চৌধুরীর বাড়ির আনাচে-কানাচে। এ-বাড়ির সঙ্গে তাঁর একটা আত্মীয়তার সুরও ছিলো। অনেকটা ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন প্রগতিশীল এই বাড়ি। এখানেই তিনি প্রথম শুনলেন রবিবাবুর গান। সে গান শোনার বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার কাছে এতদিনের চেনা গানের জগৎ যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেলো।

তখন সবে 'গীতপঞ্চশিখা' বেরিয়েছে। নীরদ চৌধুরীর দাদা চারুবাবু

স্বরলিপি দেখে অর্গানে সেইসব গান তুললেন আর বাড়িসুদ্ধ সবাই দলবেঁধে শেখার ধুম পড়ে যেতো। তাঁদের সঙ্গে শৈলজারঞ্জনও গলা মেলাতেন। নির্ভয়ে প্রাণ খুলে যে গান তিনি প্রথম গাইতে পারলেন, সেই গানই হলো রবীন্দ্রনাথের গান। কুণ্ঠিত মনের বন্ধনমোচন ঘটলো এই গানে। আবার মনটা বাঁধা পড়লো যে গানের গাঁটছড়ায় সে গানও তাঁরই।

এই গান শেখার তাগিদেই তিনি পেঁছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। তাঁর দলের সঙ্গেই তিনি জোড়াসাঁকোর পাগলাঝোরা অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিলেন এবং এই উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর গান শেখবার সুযোগ ঘটেছিলো। ১৯২৯ সালে সেটা। তৃষ্ণা ত জাগলো। কিন্তু তৃষ্ণার শান্তি পাওয়া যায় কোথায়? শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শিবদাস রায় ও অনাদিকুমার দস্তিদারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের কাছ থেকে কিছু গান সংগৃহীত হলো গানভিখারীর ঝুলিতে।

এই সময়েই রাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর উদার সহযোগিতায় শীতল মুখোপাধ্যায়ের কাছে এস্রাজ শিক্ষা করবার সুযোগও এলো। পরবর্তী সঙ্গীতজীবনের অধ্যায়ে তাঁর এ বিদ্যা একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। এখনও অনেক গানের আসরে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা সেন, নীলিমা সেন) শৈলজাদাকে এস্রাজ বাজাতে দেখা যায়। সবার অলক্ষ্যে সবদিক দিয়েই তাঁর জীবনবিধাতা যেন তাঁকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুরু হবার জন্য গড়ে নিচ্ছিলেন।

ঘটনাচক্রে বাবা রমণীকিশোর মজুমদারের ইচ্ছেয় আইন পাস করে নেত্রকোণার বার লাইব্রেরীতে নাম লিখিয়েছিলেন। এ-ও হয়তো তাঁর সৃষ্টিকর্তার এক অভিনব কৌতুক। মনটা যার সুরের আকাশে পাখা মেলতে চায় তাকেই বন্দী থাকতে হলো আইনের বেড়াজালে। নির্বাসনদণ্ডের চেয়েও বুঝি ভয়ংকর এ দণ্ড। এরই মধ্যে একবার বন্ধুবর প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের আমন্ত্রণে সাতদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে যাওয়ার আমন্ত্রণ জুটে গেল। শান্তিনিকেতনের এই সাতটা দিন যেন একরাশ মুক্ত হাওয়ার মত মনের দরজা-জানলাগুলো খুলে দিলো। এইখানেই প্রভাতবাবুর সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথ ও দীনেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় ঘটলো। ভাবতে এখনও রোমাঞ্চ জাগে গুরুদেব আমায় দেখেই চিনতে পেরেছিলেন। তুমিই ত জোড়াসাঁকোর উৎসবে গান গেয়েছিলে গো—। এই সাতদিনেই দীনদার কাছে চোদ্দটি গান শিখেছিলাম। তখন সঙ্গীত ভবন ছিলো না। দীনদার বাড়ি সুরপুরীতে ছিলো আমার একক গানের ক্লাস। দীনদার কাছে গান শিখতে চাইতেই তিনি মহাখুশী। সঙ্গে সঙ্গে সকাল ন'টায় তাঁর নিয়মিত ক্লাশের ছাত্রছাত্রীদের সেই ক'দিনের জন্য ছুটি দিয়ে দিলেন। গান শেখা বন্ধ হওয়ার জন্য তাঁরা ক্ষুণ্ণ হলেও এক গান-পাগলা ভদ্রলোক নেত্রকোণা থেকে শান্তিনিকেতনে গান শিখতে এসেছে এটা তাদের কাছে কৌতূহলের এবং সেই সঙ্গে আনন্দের খবর হয়ে উঠেছিলো। এই প্রসঙ্গেই একটা কথা বলি। দীনেন্দ্রনাথের নামকরণ করে-

ছিলেন গুরুদেব স্বয়ং। দিনের যিনি ইন্দ্র—দীনেন্দ্র। দীন—মানে দরিদ্র নয়। এই বানানটি অনেকেই ভুল করে থাকেন।

শান্তিনিকেতন থেকে চলে এলাম। কিন্তু ঐ সাতদিনের অভিজ্ঞতা আমার এতদিনের অভ্যস্ত জীবনধারাকে যেন ওলটপালট করে দিলো। নেত্রকোণার জীবনকে মনটা আর মেনে নিতে চাইলো না।

ঠিক এই সময়েই বন্ধুবর প্রভাতচন্দ্রের টেলিগ্রাম পেলাম—শান্তিনিকেতনে রসায়নের অধ্যাপক পদ খালি। শিগ্‌গির চলে এসো আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। মনে হলো স্বয়ং ভগবান যেন ভক্তের কাতর প্রার্থনায় সামনে এসে দাঁড়ালেন।

বাবাকে অসন্তুষ্ট করেই এ-পদ গ্রহণ করে শান্তিনিকেতনে যাত্রা করলাম। তখন মনের অবস্থা বেপরোয়া। কোনোদিক ভাববার মত ধৈর্য নেই।

শৈলজাবাবু শান্তিনিকেতনে যোগ দেবার কিছুদিন বাদে তাঁর ভাইও সেখানে পড়তে আসেন। এই প্রসঙ্গে শৈলজাদার বন্ধু ও সতীর্থ প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের নিবন্ধের একটি অংশ উপভোগ্য। শান্তিনিকেতন যাত্রার আগে তাঁর হাতে তিনশো টাকা দিয়ে বাবা বললেন, শুনেছি রবি ঠাকুরের ওখানে হতচ্ছাড়া গরীব দশা, টাকা পয়সা ঠিকমতো দিতে পারে না। শেষটা টাকার অভাবে উপোস না থাকতে হয়।

শান্তিনিকেতনে এসে রসায়ন অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে শৈলজারঞ্জনের গান শেখাও চলতে লাগলো তাঁর দিনদার কাছে। একদিন কলাভবনে বর্ষামঙ্গলের রিহার্সাল চলছিলো; দিনেন্দ্রনাথ সেখানে যাবার আগে হঠাৎই শৈলজাবাবু গিয়ে পড়লেন ওঁর বন্ধু প্রভাত গুপ্তের সঙ্গে। দীনু ঠাকুর তাঁকে গাড়িতে জোর করে তুলে নিলেন। পাশে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—শৈলজা, তুমি গান গাইবে, না এস্রাজ বাজাবে? শৈলজা নিরুত্তর? তাঁর শান্তিনিকেতনে আসার পর সেই প্রথম অনুষ্ঠান। বোধহয় সেইজন্যেই যোগ দিতে সঙ্কোচবোধ করছিলেন। যোগ দেননিও। শুধু নিয়মমাফিক রিহার্সালে যেতেন গান শিখতে আর দিনদার অননুকরণীয় শেখানোর ক্ষমতা দেখতে। এ-দেখা তাঁর উত্তর-জীবনে কাজে লেগেছে।

প্রথম গাইলেন কবে?

বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের পর নুটুদি (রমা কর) বর্ষা-সঙ্গীতের আয়োজন করেছিলেন উদয়নে কোনো এক মঙ্গলবার। কারণ, মঙ্গলবার সন্ধ্যাতেই আশ্রমে সাহিত্যসভা, নাচগান, পাঠচক্র আলোচনা—এইসবের রেওয়াজ ছিলো। সে-আসর বসেছিলো গুরুদেবের সামনে। আমি দিনদার কাছে শিখে 'গগনে গগনে আপনার মনে' গানটি গেয়েছিলাম। পরদিন নুটুদি হেসে বললেন, আপনি ত মেরে দিয়েছেন? আমি অবাক হয়ে গেলাম, কেন বলুন ত?

গুরুদেব আপনার গান খুব পছন্দ করেছেন।

শৈলজাদার মুখখানিতে আনন্দের উদ্ভাস। ১৯৩২ সালের দিনগুলি যেন চোখের সামনে দেখছেন। এরপর আশ্রমের নাটকেও তাঁকে নামতে হয়েছিলো।

তিনি অভিনয় করেছিলেন কালের যাত্রা ও বৈকুণ্ঠের খাতা—দিনু ঠাকুরের পরিচালনায়। প্রথমের দিকে তিনি শেখাতেন। ফিনিশিং টাচ দিতেন রবীন্দ্রনাথ। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে সে এক অমূল্য সঞ্চয়। বৃন্দাবনের সেই লীলা অভিরামের আরও কত কথা তাঁর স্মরণে আসে। শৈলজাদার কাছে দিনের পর দিন গিয়ে বসলেও বোধহয় সে সব কাহিনী শোনা শেষ হবে না। গৈরিকের টানা বারান্দায় বসত আমাদের আড্ডা। দিনদাও ছিলেন সে-আসরের এক মস্তবড় পাণ্ডা। একবার নতুন কিছু করবার হুজুগে আমরা মাঝরাতে এক বৈতালিক দল তৈরী করে সারা আশ্রম পরিক্রমা করে গান গেয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছিলাম। দিনদা আমায় এই বৈতালিকের জন্য শিখিয়েছিলেন 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে'। এই দলে আমার সঙ্গে ডাঃ শচীন মুখোপাধ্যায়, প্রভাত গুপ্ত ছিলেন। মেয়েরাও যোগ দিয়েছিলেন।

শৈলজার সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের একটা অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এ সম্পর্কেও তাঁর শান্তিনিকেতনের সঙ্গী প্রভাতবাবুর অভিমানভরা সরস মন্তব্য স্মরণীয়। 'গুরুদেবের সঙ্গে শৈলজাবাবুর সহজেই ভালোরকম আলাপ-পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। সুযোগ পেলেই আমরা যেতাম তাঁর কাছে, দিনান্তের অবসরে তিনিও পরিচিতদের নিয়ে গল্পগুজব আলোচনা করতে ভালবাসতেন···শৈলজাবাবু সঙ্গে থাকলে সাধারণত গান নিয়েই নানা কথা ও আলোচনা উঠত, অন্য প্রসঙ্গ এবং অন্যরা থাকত একটু অবহেলিত। তাতে মনে মনে আমরা যে একটু ক্ষুণ্ণ বোধ না করতাম এমন নয়। কিন্তু বুঝতে পারতাম, নিজের গান ও অনুরাগীদের সম্বন্ধে গুরুদেবের এক ধরনের দুর্বলতা ছিল। এই সূক্ষ্ম সেতুর যোগে শৈলজাবাবুর পক্ষে গুরুদেবের কাছাকাছি যাবার এক অলক্ষ্য বন্ধন গড়ে উঠেছিলো।'

তারপর আস্তে আস্তে শান্তিনিকেতনের বাইরেও এখানের দলের উৎসবে যোগ দেওয়া শুরু হলো। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লক্ষ্ণৌর এক সঙ্গীত সম্মেলন থেকে শান্তিনিকেতনের আমন্ত্রণ এলো। রবীন্দ্রনাথ তখন সেখানে ছিলেন না। প্রতিমা দেবীর পরিচালনায় শাপমোচন ও নবীন এ উৎসবে মঞ্চস্থ হয়। বাংলার বাইরে সেই প্রথম শান্তিনিকেতনের নৃত্যাভিনয়। সে দলে শৈলজাবাবুও ছিলেন।

সেই বছরই সঙ্গীতভবনের প্রতিষ্ঠা হলো এবং নিয়ম ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে শিক্ষার শুরু তখন থেকেই। মুহূর্তকাল কি ভেবে শৈলজাদা বললেন, ক্লাস শুরু না হলেও গান কিন্তু থেমে থাকেনি। মুক্ত আকাশের নীচে প্রকৃতির সাজবদলের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে গান শেখা ও গাওয়া চলতো।—গানই ছিল শান্তিনিকেতনের প্রাণ—নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মতই। গুরুদেব কখনও কোনো ক্লাস নিতেন না। গান শেখানোর দায়িত্ব ছিল পুরোপুরি দিনদার ওপর। উনি মাঝে মাঝে শেখাতেন। প্রতি প্রহরে গান চলতো আপন নিয়মে। তবে বর্ষামঙ্গল শারদোৎসব ছিল বিশেষ অনুষ্ঠান। প্রতি বুধবারের উপাসনা-সভায় ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক মিলিত হতেন। ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় তিনশো। রবীন্দ্রনাথ

এ উপাসনায় সারা সপ্তাহের কর্মসূচী নির্ধারণ করতেন। পরিকল্পনার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সকলকে বুঝিয়েও দিতেন।

সঙ্গীতভবনের সৃষ্টি হলো শান্তিনিকেতনের ক্রমবিকাশের অধ্যায় হয়ে। সঙ্গীতভবনের প্রথম অধ্যক্ষ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ হেমেন্দ্রলাল রায়।

সঙ্গীত ভবন প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথ, শান্তিদেব ঘোষ, শৈলজারঞ্জন মজুমদার সকলকেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নিতে বললেন। কারণ শাস্ত্রীয় রাগরাগিণীর ধারণা সুস্পষ্ট এবং কণ্ঠের ভিত তৈরি না হলে কোনো গানই ভালো করে গাওয়া সম্ভব নয়। প্রথম উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে ভর্তি হলেন অনেকেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিঁকে রইলেন শান্তিদেব ঘোষ ও শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

বোম্বাই-এ রবীন্দ্রসপ্তাহের অনুষ্ঠান হলো এর পরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষণ এবং শান্তিনিকেতনের 'শাপমোচন' ও 'তাসের দেশ' পালা দুটির নৃত্যনাট্য রূপায়ণ। ১৯৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথ বয়স এবং স্বাস্থ্যের বাধা অগ্রাহ্য করেও 'শাপমোচন' ও 'গীতোৎসব'-এর দল নিয়ে সিংহলের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর অনুপম নৃত্য ও ও সঙ্গীতরূপের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দীনেন্দ্রনাথের ওপর ছিল পরিচালনার ভার। এইসব দলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্নেহের শৈলজাকে নিতে ভোলেন নি।

হয়ত গান ও নৃত্যনাট্যের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজনার কাজ শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে তোলার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ শৈলজারঞ্জনের ওপর এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন।

...১৯৩৪ সালে দীনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শৈলজাবাবুর সঙ্গীতশিক্ষার ভার নিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—বলেছিলেন, আমি ত জানি গানই তোমায় আশ্রমে টেনে এনেছে। গান থামলে চলবে কেন?

রবীন্দ্রনাথ যতদিন আশ্রমে থাকতেন এ-শিক্ষায় ছেদ পড়েনি একদিনও। বছরের পর বছর চলেছিল শিক্ষাদান ও গ্রহণের পালা। গুরু-শিষ্য দুজনেই ক্লান্তিহীন একনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এ ধরনের শিক্ষাদানের নজির আছে বলে আমাদের জানা নেই—এই প্রসঙ্গে পুনরায় উল্লেখ করছি প্রভাত-বাবুর উক্তি : দৈবাৎ যদি কখনো গুরুদেবের এই গান শেখাবার সময়ে গিয়েছি তাঁর কাছে তবে তিনি যেন কতকটা অন্যমনস্কের মত হ্যাঁ করে গেছেন আর শৈলজারঞ্জনকে দূরে দেখতে পেলেই বলে উঠতেন এবার আমার চাকরি শুরু হবে। ঐ আসছে 'গীতাম্বুধি'—ঐ নামে অনেক সময় তিনি অভিহিত করতেন শৈলজারঞ্জনকে। বুঝতাম, এখন মানে মানে সরে পড়তে হবে। এবার আসর বসবে সুয়োরানীর (গানের)। মানুষের জীবনে সকল প্রাপ্তি সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যবশত শৈলজারঞ্জনের পারিবারিক জীবন সুখের হয়নি বলেই বোধহয় সারা মনপ্রাণ তিনি গানেই ঢেলে দিতে পেরেছেন। খুব সম্ভব ১৯৩৫ সালেই আশ্রমে তখন রবীন্দ্রনাথের গান শেখানো ও অনুষ্ঠানের সকল দায়িত্ব ছিল

শান্তিদেব ঘোষের ওপর—রবীন্দ্রনাথের ঘন ঘন তাগিদে শৈলজাবাবু ছোটোদের একটা গানের ক্লাশ নিতে শুরু করলেন। শিক্ষকতার শুরু হলো এইভাবে। এটাও হয়ত রবীন্দ্রপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তই।

গ্রন্থাগারের সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়ের ছোট্ট মেয়ে মোহর গায় পাখীর মত সহজ আনন্দে। তার ভার পড়লো শৈলজারঞ্জনের ওপর। তাকে কখন কি গান শেখানো হবে সে নির্দেশ দিতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আবার নানা জায়গা থেকে রবীন্দ্রনাথের জন্য আসা তেল, সাবান, সেন্টের থেকে মোহরের জন্য সরিয়ে রাখা কিছু ভাগ পাঠানো হতো শৈলজারঞ্জনের হাত দিয়েই। এই মোহরই এখনকার রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয় শিল্পীদের অন্যতমা, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই শৈলজাবাবুর প্রথম ছাত্রী। এই পর্বের আর দুজন কৃতী ছাত্রী হলেন নীলিমা সেন ও অরুন্ধতী দেবী (গুহঠাকুরতা)।

শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শৈলজাবাবুকে স্বরলিপিকার গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন। দীনেন্দ্রনাথ আশ্রম ছাড়ার পর কবি নতুন কোনো গান রচনা করলে সে গান শেখবার জন্য ডাক পড়তো অমিতা ঠাকুর, শান্তিদেব ঘোষ, শৈলজারঞ্জন এবং অন্যান্য যাঁদের হাতের কাছে পেতেন। এই সময়েই শৈলজাবাবু স্বরলিপি লেখার কাজ আয়ত্ত করে নিলেন এবং স্বরলিপি দিয়ে গান সংরক্ষণের ব্যাপারে কবি ক্রমে তাঁর ওপরই নির্ভরশীল হয়ে উঠতে লাগলেন। এবিষয়ে তাঁর কখনও কোনো আলস্য বা শৈথিল্য ছিলো না। রবীন্দ্রনাথের কাছে শেখা পুরানো গান এবং তার কাছে সদ্য পাওয়া নতুন গান এ দুই প্রাপ্তির সুযোগে তাঁর ভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ-জীবনের গানের তিনিই অদ্বিতীয় ভাণ্ডারী। এত গান আর কারো কাছেই নেই। আর নতুন পুরানো সব গানই একেবারে স্রষ্টার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে আহৃত। এই পরিপ্রেক্ষিতে শৈলজারঞ্জন দীনেন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগের লিপিকার ও সংরক্ষকও বলা যায়।

শৈলজাবাবু প্রথমে নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ও নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার স্বরলিপি করেন এবং নৃত্যনাট্য শ্যামার স্বরলিপি সম্পাদনা করেছিলেন। ক্রমে বিভিন্ন শিল্পীর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড যখন কবির কাছে অনুমোদনের জন্য আসতো—সেসব গান শোনার সময় তিনি শৈলজাবাবুকেও সঙ্গে নিতেন এবং রায় দেবার আগে তাঁর মতামতটাও জেনে নিতেন। পরে এ দায়িত্ব তিনি অনেক সময় একা শৈলজাবাবুর ওপরই ছেড়ে দিতেন।

সকল দিক দিয়ে তাঁর যোগ্যতাকে পূর্ণতর পরিণতির পথে এগিয়ে দিয়ে কবি যেন তার কাজের যথার্থ বাহকরূপে শৈলজাবাবুকে গড়ে তুলতে চেয়ে-ছিলেন। তৃতীয় নয়নের দিব্যদৃষ্টি দিয়ে তিনি চিনেছিলেন তাঁর সুরের রসিককে। ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর/অক্টোবরে আশ্রমের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলছিলো। কবি মান্দ্রাজ ও ওয়ালটেয়ার গেলেন শাপমোচন নৃত্যনাট্যের দলবল নিয়ে। সঙ্গে ছিলেন শৈলজাবাবু। আশ্রমে তাঁর নাট্যাভিনয়ে শেষ অংশগ্রহণ পরের বছর শারদোৎসবের অভিনয়ে সন্ন্যাসীর ভূমিকায় এবং সাধারণ

রঙ্গমঞ্চে তাঁর সর্বশেষ অবতরণ ডিসেম্বর মাসে প্রথমে আশ্রমে ও পরে কোলকাতায় অরূপ-রতন নাটকে ঠাকুর্দা ও অন্তরালে থেকে রাজার ভূমিকায়। এইসব নাটকের সঙ্গেও শৈলজাবাবু, প্রভাতবাবু এঁরা যুক্ত ছিলেন।

১৯৩৫ সালে সম্পূর্ণ নিজস্ব পরিকল্পনা ও দায়িত্বে একটি অনুষ্ঠান উপহার দিয়ে শৈলজাবাবু আপন যোগ্যতা প্রমাণ করলেন। এই উৎসবে হলো 'রবীন্দ্র-পরিচয়সভার গীতোৎসব শরৎপর্ব'। এর সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন প্রভাত গুপ্ত এবং উৎসবের দায়িত্ব পরিচালনার ভার ছিলো শৈলজাবাবুর ওপর। এ অনুষ্ঠান ছিলো উদ্যোক্তাদের একটা চ্যালেঞ্জ। সেই সময়কার ছকে-বাঁধা উৎসবের মধ্যে—এ উৎসব আনতে চেয়েছিল একটা বৈচিত্র্যের স্বাদ। বলা বাহুল্য এ চ্যালেঞ্জ সার্থক হয়েছিলো। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেছিলেন। যে মেয়েটি 'সাধারণ মেয়ে' আবৃত্তি করেছিলো—কবি তাকে দিনের পর দিন শিখিয়েছিলেন। সে আবৃত্তি সবাইকে মুগ্ধ করেছিলো। 'তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি' গানটি দ্বৈত-কণ্ঠে পরিবেশন করেছিলেন শৈলজাবাবু গুরুপল্লীর মেয়ে সুরধ্বনির সঙ্গে।

মূল আকর্ষণ ছিলো রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের আবৃত্তি 'সামান্য ক্ষতি' আর তার সঙ্গে রানী চন্দর মূক-নৃত্যাভিনয়; সে উৎসবে শৈলজাবাবুর আব্দারে গরদের ধুতি চাদর পরে কবি অংশগ্রহণ করেছিলেন। সব দিক দিয়েই এ উৎসবের নূতনত্ব সকলকে অবাক করে দিয়েছিলো। এরপর প্রতি বছর শান্তিনিকেতনের দল কোলকাতায় এসেছে নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা', 'পরিশোধ,' 'বর্ষামঙ্গল', 'চণ্ডালিকা' ও 'শ্যামা' অভিনয় করতে। পাটনা, এলাহাবাদ, লাহোর, দিল্লী ও মীরাটে গেছে চিত্রাঙ্গদা নিয়ে। এসবের সঙ্গে যুক্ত থেকে রবীন্দ্রপ্রযোজনার নাচগান, অভিনয়, সাজপোশাক, আলো—সমস্ত দিকগুলিই শৈলজাবাবুর নখদর্পণে এসে গিয়েছিলো।

হেমেন্দ্রলাল কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে যাবার পর সঙ্গীতভবনে পরিচালনার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। প্রতিমা দেবীকে অধ্যক্ষ পদে বসিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছিলো। এবার রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ও আদেশে শৈলজাবাবুকে এই ভার নিতে হলো। তাঁর দিক থেকে সকল দ্বিধা সঙ্কোচকে কোনো আমল না দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'কার হাতে রেখে যাব আমার গান আর নাটক? তুমি যদি ভার নাও আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। আমি জানি, তুমি পারবে।'

গান ছিলো কবির সবচেয়ে আপন। যতদিন দীনেন্দ্রনাথ ছিলেন, তাঁর ওপর গান সংরক্ষণের ও প্রচারের জন্য কবি নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু দিনু ঠাকুর ছিলেন আপনভোলা উদাসী প্রকৃতির মানুষ। কোনো বাঁধা নিয়মের মধ্যে থেকে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ধাত তাঁর ছিলো না। এ বিষয়ে অনাদিকুমার দস্তিদারের ওপরও তাঁর দৃষ্টি ছিলো—কিন্তু পারিবারিক কারণে অনাদিবাবুকে কোলকাতাতেই থাকতে হতো। শেষ অবধি কাছে রইলেন বলে শৈলজাবাবুর হাতেই তিনি তুলে দিলেন এই বিপুল দায়িত্ব।

কবির গানের সংরক্ষণ, প্রচার, শিক্ষাদান, নতুন গানের স্বরলিপি-রচনা

এবং স্বরলিপি বই-এর সম্পাদনা—সব কিছু দায়িত্ব তাঁরই ইচ্ছেয় হাতে নিলেও রসায়নের অধ্যাপকের কাজটাও বজায় রইলো শৈলজাবাবুর নিজের ইচ্ছেয়। গ্রামোফোন রেকর্ডে এবং সিনেমায় গাওয়া গানে অনুমোদনের কাজেও তার ডাক পড়তো। কুণ্ঠাসত্ত্বেও শৈলজাবাবু এসব দায়িত্ব নিয়েছিলেন এই ভেবেই, মাথার ওপর গুরুদেব ত রইলেনই। প্রয়োজন হলে এবিষয়ে তাঁর নির্দেশ পাওয়া যাবে।

একনিষ্ঠ সঙ্গীতসেবার পুরস্কার কবির এই স্নেহের দান শৈলজারঞ্জনের জীবনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তাঁকে যোগ্য পাত্র বলে চিনেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ প্রতি পদক্ষেপে তাঁর প্রতি লক্ষ্য রেখে—নানারকম দায়দায়িত্ব তাঁর ওপর চাপিয়ে দিয়ে ধাপে ধাপে তাঁকে এগিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গীত-সাধককে ওকালতির গণ্ডীতে বেঁধে রাখা হয়েছিলো। এ বিড়ম্বনার হাত থেকে কবিই তাঁকে মুক্তি দিলেন। এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় শৈলজাবাবুর এক জন্মদিনে তাঁর আশীর্বাণী :

'জন্মদিন এল তব আজি
ভরি লয়ে সঙ্গীতের সাজি।
বিজ্ঞানের রসায়ন রাগরাগিণীর রসায়নে
পূর্ণ হলো তোমার জীবনে।
কর্মের ধারার তব রসের প্রবাহ যেথায় মেশে
সেইখানে ভারতীর আশীর্বাদ অমৃত বরষে।'

যতদিন কবি বেঁচেছিলেন, শৈলজাবাবু সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁর ওপর সকল দায়িত্ব অর্পণ করে তিনি পরম শান্তি পেয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর অন্তর্ধানের পর গান সম্বন্ধে তাঁর নিজের প্রবর্তিত নিয়মগীতি অক্ষুণ্ণ থাকেনি। বিশ্বভারতী এক সময় কেন্দ্রীয় সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হলো। ফলে দায়িত্বের ক্ষেত্রে এলো দ্বৈতশাসন। নতুন কর্তৃপক্ষের বিধানে শৈলজাবাবু নামেমাত্র অধ্যক্ষপদে বহাল রইলেন। তাঁর দায়িত্ব সীমিত করা হলো সঙ্গীতভবনে বিভাগীয় দপ্তর সংক্রান্ত কাজকর্মের অধ্যক্ষতায়। উদ্ভব হলো স্বরলিপি সমিতির। স্বরলিপি সম্পাদনার কাজ এক হাতে না থেকে ভাগাভাগি হয়ে গেলো।

কবির অন্তর্ধানের পর ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী শান্তিনিকেতনে এলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এখানেই ছিলেন। ইন্দিরা দেবীকে সঙ্গীত-ভবনের প্রনেত্রীপদে বহাল করা হলো। দুঃখের দিনে এইটুকুই ছিলো শৈলজাবাবুর সান্ত্বনা। রবীন্দ্রনাথের অনেক পুরানো গান ইন্দিরা দেবী জানতেন। সেইসব গানের এবং কিছু কিছু পূর্ব প্রকাশিত গানের স্বরলিপি—ইন্দিরা দেবীরই ভাষায় যেন 'পুলিশ পাহারায়' দাঁড়িয়ে থেকে আদায় করে নিয়েছিলেন।

বহু আগে শৈলজাবাবুর সঙ্গে ইন্দিরা দেবীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ রহস্যভরে বলেছিলেন, 'বিবি তোর পিছনে একটি বাজ লেলিয়ে

দিলাম আজ, টের পাবি পরে।'

সেই টের পাবার দিন এলো এতদিনে।

"আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ্ব-ভারতীতে উপাচার্যের পদে যোগ দেওয়ার পর দ্বৈত শাসনজনিত বিশৃঙ্খলা দেখে রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে শৈলজাবাবুকে আগের অধিকারেই প্রতিষ্ঠিত করলেন। ১৯৫৯ সালে অবসর গ্রহণের পর তাঁকে পুনর্নিয়োগ করা হলো।

কিন্তু নানা কারণে পরিবর্তিত আশ্রম পরিবেশে হৃদ্যতার অভাবে তাঁর মন পীড়িত বোধ করছিলো। তাই ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে সেখানকার কাজে ইস্তফা দিয়ে তিনি সঙ্গীতের সাধনপীঠ শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে এলেন কলকাতায়। (প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত)

কোলকাতায় আসার পর আস্তে আস্তে তাঁর নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হলো—তার বিস্তারও ঘটতে লাগলো দিনে দিনে। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীনই তিনি ১৯৪১ সালে শুভ গুহঠাকুরতা ও সুজিতরঞ্জন রায়দের গীতবিতান প্রতিষ্ঠার প্রেরণা পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এটা একটা চিহ্নিত অধ্যায়। এর আগে শান্তিনিকেতনের বাইরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিলো না। তার অনেক আগে অবশ্য গীতালি সংস্কার সৃষ্টি হয়েছিলো ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু সেটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছিলো।

এই গীতবিতানকে গড়ে তোলার কাজে শৈলজাবাবুর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে? দক্ষিণীর সূচনা সংগঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও শৈলজাবাবুর অবদান আছে। দক্ষিণ কলকাতায় সুরঙ্গমা (১৯৫৭ সালে স্থাপিত) তাঁরই পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান এবং তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানেই হয়েছে।

এছাড়া কলকাতা এবং তার আশেপাশে এমন কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতিষ্ঠান নেই যার সঙ্গে তিনি যুক্ত নন। এখন অবশ্য সুরঙ্গমার মধ্যেই তিনি বেশী কেন্দ্রীভূত।

১৯৫৪ সালে রেঙ্গুনের টেগোর সোসাইটির আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনের দল নিয়ে শৈলজাবাবু সেখানে গিয়েছিলেন। প্রায় দুমাস সেখানে ছিলেন। সেখানে বর্মী ছাত্রছাত্রীদের রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাতেন নিয়মিত ক্লাশ নিয়ে। এবং শান্তিনিকেতনের ধারায় তারা নাচও অভ্যাস করতো নৃত্যশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে। শান্তিনিকেতন রেঙ্গুনের সম্মিলিত দল নিয়ে তিনি রেঙ্গুনে নৃত্যনাট্যও মঞ্চস্থ করেছেন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬০ অবধি তিনি (১৯৫৭ সাল বাদ) একাজ করেছিলেন। প্রতিদানে শান্তিনিকেতনের দল বর্মীদের কাছে পোয়ে নাচ শিখতো।

দুই দেশের এই সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটেছিলো শৈলজাবাবুরই চেষ্টায়।

রবীন্দ্রসংস্কৃতির সুযোগ্য ধারকরূপে শৈলজারঞ্জন কাশ্মীরের যুবরাজ করণ সিং-এর আমন্ত্রণে সেখানে গিয়েছিলেন চিত্রাঙ্গদা ও ভানু সিংহের পদাবলীর নৃত্যানুষ্ঠান দেখাতে, শান্তিনিকেতনের দল নিয়ে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও সঙ্গীতের উপদেষ্টা ও পরীক্ষক হিসাবে তিনি

বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী, রাঁচি ও ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন। পাটনা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন অনুরূপভাবেই।

বেতার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও আছে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। মোটকথা শৈলজাবাবুকে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নৃত্যনাট্য তথা রবীন্দ্রকলার জীবন্ত অভিধান বললেও অত্যুক্তি হয় না। এখনও বয়সের বাধা, স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করে ভারতের নানা প্রান্তে ছুটে বেড়ান সঙ্গীতের প্রচারের কাজে। এ বিষয়ে যে-কোন আহ্বানই তাঁর কাছে শ্যামের বাঁশির মতই দুর্নিরোধ্য। সম্প্রতি বাংলাদেশেও তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীত শাস্ত্রবিশারদ শৈলজাবাবু ছাড়াও আরো হয়ত অনেকে আছেন এবং ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে শৈলজারঞ্জন মজুমদারের তফাতটা কোথায়?

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণে আসে দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কথা। কিন্তু এঁরা দুজন ঠাকুর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জন্ম থেকেই ছিলো এঁদের নাড়ীর যোগ। এবং তাঁরা হয়েছিলেন কবির অন্তরঙ্গ স্নেহভাজন। অতএব রবীন্দ্রচিন্তা এঁদের কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির মতই।

বাকী দুজন, মানে অনাদিকুমার দস্তিদার ও শান্তিদেব ঘোষ ছোটবেলা থেকেই শান্তিনিকেতনে থাকার এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হবার দরুন রবীন্দ্রসংস্কৃতি এঁদের মধ্যে বর্তেছিলো স্বাভাবিক নিয়মে, যেমন মাটি ফুঁড়ে বেরোয় বৃক্ষলতা।

কিন্তু শৈলজারঞ্জন, এ দুটি সুযোগের কোনোটারই অধিকারী ছিলেন না। তিনি শান্তিনিকেতনে বিদেশী, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে আগন্তুক। তাঁর জীবনে সঙ্গীতের প্রবেশ ছিলো নিষিদ্ধ। কিন্তু ফ্যাক্টস্ আর স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। তাই রসায়নের অধ্যাপক এবং কুড-বি ল-ইয়ার পরিণত হলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত গুরুতে। ভালবাসার পরশমণিতেই এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। কিংবা বলা যায় জন্মান্তরের সংস্কার।

গুরু শৈলজারঞ্জন প্রতিদিনের জীবনে কিন্তু মোটেই গুরুগম্ভীর নন। স্নেহপ্রবণ, সেবাপরায়ণ এবং সবার বন্ধু শৈলজাদার সঙ্গে এই ত জানুয়ারীতেই একসঙ্গে গেছি জামশেদপুরে; উনি শুধু হাসিখুশিই নন। বেশ গিন্নীবান্নীও। ট্রেনে তাঁর ঝুলি থেকে খেজুর-গুড়ের সন্দেশ বার করে বিতরণ করলেন জর্জদা, মালতী ঘোষাল, বাণী, বনানী, নীহারবিন্দু সেন সবাইকে। আমি আর রাজেশ্বরীদি মিষ্টি খেতে নারাজ বলে একটি প্লাস্টিকের ফ্ল্যাপ থেকে কুচো নিমকি বার করে দিয়েছিলেন।

শৈলজাদার বাড়িতে যেদিন ইন্টারভ্যু করতে গেছি কাচের দেওয়াল-আলমারী থেকে একশিশি নারকেল নাড়ু বার করে আমার হাতে এক মুঠো ঢেলে দিয়ে বললেন, খেয়ে দেখ—আমার এক ছাত্রী দিয়ে গেছে। ভারী সরস আর অন্তরঙ্গ মানুষ।

কবিসঙ্গ বোধহয় তাঁর অন্তরে কৌতুকরসের ঝর্ণা ঝরিয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে উনি একবার রেগে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তবু মনে রেখো', 'ও আমার আঁধার ভালো' এসব অ্যাডভান্স বুকিং-এর গান লেখেন কেন? এসব গান আমি দুচোখে দেখতে পারি না—

—উনি কি বললেন?

—কি আবার বললেন? কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন ওসব আমার আগের গান—তাঁর কাঁচুমাচু মুখখানির কথা মনে করেই বোধহয় প্রাণখোলা হাসিতে শৈলজাদা ঘর ভরিয়ে দিলেন।

আর একবার ঠিক ঐভাবেই বলেছিলাম এত নেগেটিভের ঝকমারি কেন? 'আমার না বলা বাণী', 'দ্বারে এসে গেলে ফিরে', 'দুজনে দেখা হলো কোনো কথা কহিল না'; তখনও দেখেছিলাম সেই অপ্রস্তুত হওয়া শিশুর মত লাজুক হাসি। ভেতরটা ওঁর চিরদিন শিশুর মতই নরম ছিলো।

ফুটবল ম্যাচের সময় সবাই মাঠে ছুটত খেলা দেখার জন্য। সেই সময় গুরুদেবকে একলা পাওয়া যাবে বলে তাঁর কাছে বসে থাকতাম। এইরকম একদিন তাঁর কাছে বসে আছি। সামনে দিয়ে গ্রামের মেয়েরা বকবক করতে করতে যাচ্ছে। কমলা রং-এর জোববা পরা গুরুদেবের সেই মূর্তি দেখে ওদের কি মনে হলো—সার বেঁধে সামনে দাঁড়িয়ে বকবকানি থামিয়ে যেন স্তম্ভিত হয়ে গুরুদেবকে দেখতে লাগলো। কতক্ষণ পরে তাদেরই কার কোলের একটি খুকু কেঁদে উঠতে ওরা চলে গেলো।

কি হলো রে ব্যাপারটা? গুরুদেব প্রশ্ন করলেন।

বললাম, এইটেই ত স্বাভাবিক। হাঁ করে তাকিয়ে দেখার জিনিস দেখে চলে গেলো।

ওঁর রান্নার লোক রাখা হতো—আমি পছন্দ করলে তবে!...

কেমিস্ট্রির ক্লাস, সঙ্গীতভবনের কাজ এসবের চাপে অনেক সময় আমার নাওয়া-খাওয়ার অনিয়ম হয়ে যেতো। একদিন আমায় ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ভেবেছ কি? যা খুশী তাই করবে?

আপনারই আজ্ঞায় গানের মাস্টার হয়ে কুলে কালি দিয়েছি। আপনি যা বলবেন তাই-ই করব। শুধু পারব কিনা সেটা আপনিই বুঝুন।

গুরুদেব পরীক্ষায় বিশ্বাস করতেন না। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় মিউজিকে অরুন্ধতী ফার্স্ট হয়েছিলো। মোহর সেকেন্ড। উনি শুনে চোখ বড় বড় করে বলেছিলেন, বাব্বা! সব পণ্ডিত হয়ে গেলি। আমরা যাব কোথায়?

ইন্দিরা দেবী পরীক্ষা নিতেন! বিশ্বভারতীর দু-রকম কোর্স ছিলো—একটা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির কোর্স, অন্যটি বিশ্বভারতীর। বেঙ্গল গভর্নমেন্ট থেকে বিশ্বভারতীতে গান শেখবার জন্য ছ'টি স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। রাজেশ্বরী ওয়াজ ওয়ান অফ দেম। শ্রীভবনে রাজেশ্বরী ছিলো! সেখানে গুরুদেব আসবেন বলে অভ্যর্থনার আয়োজন করলাম। একক, কোরাস সবরকম গানের ব্যবস্থাই ছিলো। রাজেশ্বরীকে

বলেছিলাম ওর পছন্দমত একটা গান গাইতে। তখন শ্যামা রিহার্সাল শিখেছিলো বলে কিনা জানি না ওর কি মনে হলো গাইল, 'বুক যে ফেটে যায়'! পদ্মফুলের মত ফুটফুটে মেয়েটির মধুর কণ্ঠ ও আবেগ গুরুদেবের অন্তর স্পর্শ করেছিলো। তখন স্বাস্থ্য ভেঙেছে। ওকে হাতে করে তৈরী করতে পারলেন না বলে খুব আফসোস করতেন। একবার বর্ষামঙ্গল উৎসবে বিশেষ করে ওরই কণ্ঠের উপযোগী করে 'তোমায় আবার চাই শুনাবারে' গানটির সুর করে আমায় বললেন ওকে শেখাতে। রাজেশ্বরী সোলো গেয়েছিলো! ও কৃতি ছাত্রীও ছিলো। অনার্স নিয়ে বি.এ পাস করে শান্তিনিকেতনে এসেছিলো। তখন ওখানে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাস ছিলো না বলে ও চলে যেতে চেয়েছিলো। কিন্তু ওকে ধরে রাখার জন্যই গুরুদেব প্রথম পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাস খুললেন। সংস্কৃত নিয়ে দুটি মেয়ে সেখানে ক্লাস শুরু করলও, রাজেশ্বরী দত্ত আর একটি মেয়ের নাম জয়ন্তী কি যেন। টাইটেলটা ঠিক মনে নেই। আমাদের সকলেরই অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী ছিলো। ওর স্বভাবটি ভারী সুন্দর, তাছাড়া অবাঙালী হয়েও গুরুদেবের গানকে ও নিজের গান বলে গ্রহণ করেছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতেব গুরু হিসাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে আপনি কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর জোর দেন ?

সুর, লয়, সাহিত্য ও ভাব এই সব ক'টি বস্তু মিলে গুরুদেবের গানের একটি যে বিশেষ ভঙ্গির সৃষ্টি হয়—সারা মন-প্রাণ দিয়ে আমার ছাত্রছাত্রীদের সেইটিই চিনিয়ে দিতে চেয়েছি। কারণ গুরুদেবকে সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় তাঁর ঐ অনন্য সঙ্গীতরূপের মধ্যেই।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী ? এ সম্বন্ধেও আপনার মতটা জানতে ইচ্ছা করে।

যা শুনলেই রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে চেনা যায়। সূর্যের আলোয় যেমন সব রং মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে—রবীন্দ্রনাথের গানেও তাই। ভারতের অন্তহীন সঙ্গীতধারা এ গানের অন্তর গহনে প্রবাহিত। এই কথাটি মনে রাখলে গায়কী আপনিই তৈরী হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে হেমন্তবালা দেবীকে। তিনি একবার লিখেছিলেন, আমার মধ্যে বৈষ্ণবীকে তুমি খোঁজো। সে পালায় নি। কিন্তু তার সঙ্গেই আছেন শিব—ভিখারী এবং সন্ন্যাসী। রসরাজের বাঁশিও বাজে, নটরাজের নৃত্যও হয়। যমুনায় নৌকা ভাসান। শেষকালে পড়ে গিয়ে সেই গঙ্গায়—যেখানে গৈরিক পরে চলেছেন সমুদ্রে। অফুরন্ত যৌবনের উচ্ছল প্রাণরস ও সংযত বৈরাগ্য এই সমন্বয়ই তাঁর গানে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি করেছে।

নিজের গান সম্বন্ধেই বোধহয় ওঁর সবচেয়ে দুর্বলতা ছিলো। সবসময় বলতেন—আমার সব যাবে, কিন্তু সবচেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান।

১৯৪০ সালে ইন্দিরা দেবী ও অরুন্ধতী দেবী গীতালি খুললেন কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের গান প্রচারের উদ্দেশ্যে। তারই প্রতিষ্ঠা উৎসবে কবি বলেছিলেন, আমার গান যাতে আমার গান বলে মনে হয় এইটি তোমরা কোরো।...

বুলাবাবু, তোমার কাছে সানুনয় অনুরোধ এঁদের একটু দরদ দিয়ে, একটু রস দিয়ে গান শিখিও—এটাই আমার গানের বৈশিষ্ট্য। এর ওপর যদি তোমরা স্টিম রোলার চালিয়ে দাও আমার গান পিষ্ট হয়ে যাবে। আমার গানে যাতে একটু রস থাকে, তান থাকে দরদ থাকে ও মীড় থাকে তার চেষ্টা তোমরা কোরো।

সকলের জন্য তাঁর চিন্তা ও দরদে এই রসবোধই উদ্বেলিত। অমিতা তখন শয্যাশায়ী। উনি আমায় বললেন, খুকুর আশা নেই। একটা চকলেট কিনে ওকে খাইয়ে এস।

শৈলজাদা ওঁর গান ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি পৌঁছে দিয়েছেন এজন্য কবির কত যে আশীর্বাদ পেয়েছেন। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের নানা চিঠি থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি—

তোমার চিঠিখানি……পড়ে……বেশ বুঝতে পারছি তোমরা বেশ রীতিমত জমিয়েছিলে। যেটা আমার কাছে বিশেষ আনন্দের বিষয় মনে হয় সেটা হচ্ছে এই যে গানগুলি তোমরা ছড়িয়ে দিচ্ছ—শুধু গান নয় শান্তি-নিকেতনে যে রূপের প্রেরণা আছে সেও বাংলাদেশের অন্যত্র গিয়ে পেঁাচচ্ছে।

আর একটি চিঠিতে—

তোমাদের নেত্রকোণায় আমার জন্মদিনের উৎসব যেমন পরিপূর্ণ মাত্রায় সম্পন্ন হয়েছে এমন আর কোথাও হয়নি। পুরীতে আমাকে প্রত্যক্ষ সামনে নিয়ে সম্মান করা হয়েছিলো। কিন্তু নেত্রকোণায় আমার সৃষ্টির মধ্যে অপ্রত্যক্ষ আমাকে রূপ দিয়ে আমার স্মৃতির যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কবির পক্ষে সেই অভিনন্দন আরো অনেক বেশী সত্য। তুমি না থাকলে এত উপকরণ সংগ্রহ করত কে ?

কেশরবাঈর গান কবিকে খুশী করতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, নন্দনবনে যে অপ্সরার যোগ্যস্থান ছিলো সুন্দরবনে তার মান বাঁচানো সহজ নয়।…যথার্থর প্রতিষ্ঠা হতে লাগে। নিরাশ হবার কিছু নেই ? কবির ইচ্ছেয় নন্দলাল বসু সারেঙ্গী আনিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন তুমি আমার সঙ্গে বাজাবে।—মোহরের 'ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে'র সঙ্গে আমি বাজিয়েছিলাম। পরে বাচ্চন মিশ্র এসেছিলেন।

তাঁর কাছে শোনা 'সমুখে শান্তি পারাবারে'র কাহিনীর সঙ্গে এই নিবন্ধ সমাপ্ত করতে চাই।

গুরুদেব অসুস্থ। কোলকাতায় চলে আসবেন। আসার দিন ভোরে উঠে উনি বৈতালিকের দোতলায় জানালার ধারে বসে। নীচে আমরা বৈতালিকরা 'এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিল দ্বার' গেয়ে আমাদের মনের বেদনা ও অভিমান তাঁকে জানালাম।……যাবার আগে বাসে উঠে বসলেন। সঙ্গে যাচ্ছিলো নন্দিতা। আমি বাসের দুধারে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের নিয়ে 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গাইতে গাইতে চললাম।

অসুস্থতার জন্য অনেকদিন বেরোতে পারেন নি। রান্নাঘরগুলির সামনে

বসানো নতুন ল্যাম্প পোস্টগুলি সেই প্রথম দেখে হেসে বললেন—তোদের পুরানো আলো চলল। নতুন আসছে বুঝি—শৈলজাদার গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে যায়। পাঞ্জাবির হাতায় চোখ মুছে আবার যেন নিজের মনেই বলে চললেন—ডাকঘরের জন্য উনি লিখলেন 'সমুখে শান্তি পারাবার'। সেই প্রথম আন্ইউজুয়াল একটা গান দেখলাম। আমায় শিখিয়ে দিয়ে বললেন, এই গানটি প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম। তাই লিখে রেখে তোমায় শিখিয়ে গেলাম। অন্যান্য গানের মত এ গানটি কাউকে শিখিও না। আমার যখন 'হয়ে বয়ে' যাবে তখন এই গানটি করিও। কিন্তু তখন তুমি আমাকে কাছে পাবে না।

তাই হয়েছিলো।

নন্দিনীর বিয়েতে তিনটি গান রচনা করেছিলেন। বড়মা (হেমলতা ঠাকুর) মাঘোৎসবের জন্য তাঁর সঞ্চয় থেকে কিছু গান চাইলেন।

—আমি কেমিস্ট্রির প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নিচ্ছি। হঠাৎ বেয়ারা এসে একটি স্লিপ দিয়ে গেলো। তিনটি গান গুরুদেব কোলকাতায় পাঠাতে বলেছেন—স্বরলিপি করে ১। সমুখে শান্তি-পারাবার ২। দুজনের মিলনের জায়গায় প্রেমের মিলন ৩। তোমাদের সব কর্মে।

আমি পোস্ট করে দিয়ে ওঁকে জানাতে হঠাৎ যেন ক্ষেপে উঠলেন, তোমাকে বারেবারে বলছি না 'সমুখে শান্তি-পারাবার' এখন কাউকে না দিতে?

—আপনিই ত বলেছেন—

—শীগ্গির চিঠি লিখে বারণ করে দাও—ও গান যেন ব্যবহার না করে। সেদিন থেকে গানটি স্যুটকেসের তলায় আলাদা লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলাম।

অবশেষে কোলকাতা থেকে টেলিগ্রাম এলো সেই চরম সংবাদ নিয়ে। 'হি ইজ সিংকিং।'

আমি পাগলের মত ছুটছি স্টেশনের দিকে। পথে ক্ষিতিমোহনবাবুর সঙ্গে দেখা হলো। বলল কোথায় চলেছ? গানটার কি ব্যবস্থা করলে? যাচ্ছই বা কেন? জনতার ঢেউ-এ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাঁর কাছে কি পৌঁছতে পারবে?

সত্যিই ত গানটার দায়িত্ব ত আমরই ওপর? আমি রয়ে গেলাম। কণিকা, ইন্দুলেখা, অমলা সরকার—ওদের গানটা শেখলাম। ওদিকে কোলকাতায় গুরুদেব অগণিত জনতাবেষ্টিত হয়ে নিমতলা মহাশ্মশানের দিকে অনন্তের পথে যাত্রা করছেন—শান্তিনিকেতনের মন্দিরে আমরা ক'জন মিলে তখন গাইছি 'সমুখে শান্তি-পারাবার'—মেয়েগুলো ত কেঁদে সারা। গাইবে কি? শৈলজাদাও ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠলেন, আমার ঝাপসা চোখের সামনে।

পরে 'সমুখে শান্তি-পারাবার' তিনজন শিল্পী তিনটি বিভিন্ন কোম্পানীতে রেকর্ড করেছেন। অমিয়া ঠাকুর হিন্দুস্থান কোম্পানীতে উল্টোদিকে 'হে নূতন'—শৈলজাদার ট্রেনিংয়ে। কনক বিশ্বাস হিজ মাস্টারস্ ভয়েসে অনাদিকুমার দস্তিদারের পরিচালনায় শৈলজাদার এস্রাজ সংগতে। পাইওনিয়ারে এ গান রেকর্ড করেন শৈলদেবী।

অর্ঘ্য সেন

'আমি যখন রবীন্দ্রনাথের গান করি তখন আমার নিজের মনের কথা ভেবেই গাইবার চেষ্টা করি। ফলে কি যেন বেশী এসে যায়—যা স্বরলিপিতে থাকে না। এমন কি স্বরলিপির মাত্রাভাগেরও এদিক ওদিক হয়। ফল কি হয় জানি না। তবে গাইতে ভালো লাগে।'

কণ্ঠমাধুর্য, কল্পনা ও মননশীলতার দুর্লভ সমন্বয়—আবেগ, বে-পরোয়া বলিষ্ঠতা, সব মিলিয়ে অর্ঘ্য সেন এমনই এক চরিত্র—বহুর মধ্যেও যাকে আপন স্বরূপে অনন্য বলে চিনে নিতে ভুল হয় না। গলার আওয়াজে সন্তোষ সেনগুপ্তর ছায়া ? হ্যাঁ, আছে। কিন্তু সে ছায়া তার শিল্পীসত্তাকে গ্রাস করেনি বরং তার প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত সঙ্গীতভাবনার দোসর হয়ে গানের রূপকে রমণীয় করে তুলেছে। এইত সেদিন। গীতবিতানের উৎসবে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের এমন কোনো শিল্পী নেই যাঁর গান শোনা যায়নি। কিন্তু সেই জ্যোতিষ্ক ও তারার মিলিত সভায় সেই তারাটির আলো সবার চোখেই প্রতিবিম্বিত হয়েছে—যে আলো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে চলেছে অন্তরের অতল গভীর ধ্যানবিভায়। কণিকার অমন পাষাণ-গলানো 'বড় বিস্ময় লাগে' শুনেও অর্ঘ্যর গাওয়া 'সেই ত বসন্ত' মনের মধ্যে একটা আবেদন রাখতে পেরেছে।

অর্ঘ্য গান যশের জন্য নয় কারণ ওঁকে দেখেছি বহু সাংবাদিকের সাক্ষাৎকারের আহ্বানে চঞ্চল না হয়ে নীরব ঔদাসীন্যে মঞ্চে গাওয়া শিল্পীর গান একমনে শুনতে। অবশ্যই অহংকার-ভরে নয়, আনমনা সুরপাগল চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতার তাগিদেই। নম্রতা ওঁর যতখানি, ঠিক ততখানিই আত্মসম্মানবোধ। দেখেছি কোনো সমালোচকের সমালোচনার বিবরণে নিজের নাম এবং সেই সঙ্গে কিছু সুখ্যাতিও বাদ গেলে বয়স্ক শিল্পীকেও কাণ্ডজ্ঞানহারা হতে। কিন্তু গানে প্রেক্ষাগৃহের সবক'টি চিত্ত দুলিয়ে দিয়েও, সংবাদপত্রের পাতায় নিজের নামোল্লেখ না থাকলে অনুত্তেজিত, অভিযোগহীন এই তরুণ শিল্পীর সৌজন্যের শালীন প্রকাশকে কোনোদিন বিচলিত হতে দেখিনি। গানের আসরে দেখেছি সবাই যখন পরিচিত ও সতীর্থের সঙ্গে হাসিতে, পরিহাসে মুখর, অর্ঘ্য বসে আছেন এক কোণে, সবার দৃষ্টির আড়ালে। আবার অর্থের জন্যই গাইছেন এমন কথাও বলা যায় না। কারণ ওঁর অর্থ উপার্জনের অন্য ক্ষেত্র আছে।

অর্ঘ্য গান করেন—কারণ গানই তাঁর প্রাণ। হয়তো বা তিনি গানের

ভিতর দিয়েই ভুবনকে দেখতে চান। বয়সে তরুণ কিন্তু চিন্তায় পরিণত এবং রুচিতে পরিশীলিত। প্রতিভার সঙ্গে আছে অনুশীলন, আবেগের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে জাতশিল্পীর স্বাভাবিক সংযম।

খুলনার কাছে দৌলতপুরে কেটেছে শৈশব। হিন্দু অ্যাকাডেমী কলেজে পড়ার সময়েই নাটক, নাচ ও গানের পথ বেয়ে শিল্পের জগতে মনকে পৌঁছে দেবার মূলে সহজাত প্রতিভা ছাড়াও আরও যে দুটি মানুষের অবদান ছিলো তাঁরা ছিলেন শান্তিনিকেতনেরই এক দম্পতি শান্তিপ্রিয় বসু ও হাসি বসু।

জর্জ বিশ্বাসের কাছে দীর্ঘ বারো বছরের শিক্ষার (ম্যাট্রিক পাস করবার পর কোলকাতায় এসে) পরে কমল দাশগুপ্তের কাছে ভয়েস ট্রেনিং তার সঙ্গে ফিরোজা বেগমের কাছেও শিক্ষা নেন। এছাড়া দিলীপ রায় (রজনীকান্তর দৌহিত্র), মঞ্জু গুপ্ত, সন্তোষ সেনগুপ্ত, সুপ্রভা সরকারের কাছে রজনীকান্ত অতুলপ্রসাদ ও নজরুল গীতি শিক্ষা গ্রহণ করেন। সব মিলিয়ে খোলা আকাশের মতই উদার ব্যাপ্তি রয়েছে অর্ঘ্যর সঙ্গীতভাবনার।

অর্ঘ্যের মতে জর্জদার মত সন্তোষদারও গানের মধ্যে একটা বুদ্ধির ছাপ মেলে। আমায় মুগ্ধ করে সেটাই। গান শুনলেই বোঝা যায়, নিছক স্বরলিপির প্রতিলিপিই পরিবেশিত হচ্ছে না—রীতিমত মেহনত করে, বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু করার চেষ্টা করছেন। এই কিছু করাটাই মনে ধাক্কা দেয়। কারণ এই পরীক্ষানিরীক্ষায় নিছক টেকনিকদক্ষতার যান্ত্রিকতা নেই। আছে প্রেম এবং উপলব্ধির আলো।

অর্ঘ্যর প্রথম অনুষ্ঠান জর্জদারই অফিসে। তারপর রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে ইনডোর স্টেডিয়ামে মস্তবড় সঙ্গীতের আসরে। বড় বড় শিল্পীদের সঙ্গে। সেই অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার পরদিনই অজস্র অনুরাগী এলেন এই সম্ভাবনায় উজ্জ্বল তরুণ শিল্পীর কাছে, শিষ্য-শিষ্যা হবার আর্জি জানিয়ে। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে চাকরি হয়ে গেলো ঐ গানের দৌলতেই। তারপর রেডিও, রেকর্ড সব জায়গা থেকেই ধারাসারে আহ্বান এলো, বর্ষার আকাশের অকৃপণ দাক্ষিণ্যের মতই। প্রথম রেকর্ড মেগাফোন কোম্পানিতে শুভ গুহঠাকুরতার ট্রেনিং-এ। গান দুটি হলো 'ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী' এবং 'এই শ্রাবণের বুকের ভিতর'। শেষের গানটি সত্যিই শিহরন জাগায়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পীরূপে আজ আমার পরিচিতি হলেও অতুলপ্রসাদ, ডি. এল. রায়, রজনীকান্তের গানও আমার দারুণ ভালো লাগে। বেশ একটা অন্য স্বাদ আছে। আজকাল প্রার সকলেই বলে থাকেন রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া কিছু জানেন না। এটা আমার কাছে একটা প্রচণ্ড ভণ্ডামি বলে মনে হয়। অন্তত সেভেনটি ফাইভ পারসেন্টের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষিতদের জন্য। যত বেশী শিক্ষা এগোবে তত বেশী শিক্ষিত মানুষ রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ভালোবাসবে তত বেশী এ সঙ্গীত মানুষের অন্তরে প্রবেশ করবে। তখন যদি কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বিচার করে—শিক্ষামার্জিত মনের তাগিদেই করবে এবং সেটা ভালোই হবে।

অর্ঘ্যর মতামত, সঙ্গীত সম্পর্কে চিন্তা ওঁর গানেরই মত বেপরোয়া—সমুদ্রের অসীমে নদীর মিলনোচ্ছাসের দুর্বার বেগচাঞ্চল্য যেন।

অনেককে বলতে শুনি, রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাঙিয়ে আমরা খাই। যদি তাই হয় তার মধ্যেও এই সান্ত্বনাই আছে যাঁকে ভালোবাসি—অন্নের জন্য হাত পাতি তাঁরই কাছে, অন্য কোথাও নয়। এর মধ্যে একটা স্বর্গীয় আনন্দ আর মাধুর্য নেই কি? প্রথম প্রথম যখন শান্তিনিকেতনের অর্থ তহবিলের জন্য কোলকাতার নানা প্রেক্ষাগৃহে শো হতো, শুনেছি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং মঞ্চের এক-পাশে বসে থাকতেন। কারণ লক্ষ লক্ষ মানুষ আসবে তাঁকে দর্শন করবার দুরন্ত আকর্ষণে। অর্থসংগ্রহের জন্য এ কাজ তাঁকে করতে হয়েছে বলে তিনি ছোটো হয়ে যাননি। কারণ এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিলো মহৎ।

বাঁচার তাগিদে গানের বিনিময়ে হয়ত আমাদের অর্থগ্রহণ করতে হয় কিন্তু অর্থ উপার্জনের জন্যই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে শুরু করেছিলাম—এর চেয়ে ভুল কথা আর কিছু নেই। বরং জীবিকার সঙ্গে ভালোবাসার ধন জড়িয়ে থাকলে—তার অসহনীয় ধূসরতায় হয়ত ভাবের রং লাগে। তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী? নিশ্চয়ই আছে। তবে সেটা যে কী তার নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা দেওয়া মুশকিল। একটা আধুনিক গান শুনেও আমরা অনেক সময় বলি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে চিনিয়ে দেয়। এর মধ্যে কোনটি গায়কী বা সব মিলিয়ে গায়কী কিনা বলা কঠিন। সন্ধ্যা মুখার্জির মত অমন গলায় শুদ্ধ-ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলে আমরা বলি ঠিক রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে না। কিসের যেন অভাব থেকে যাচ্ছে। আবার কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক গাইলেও হয়ত বলব রাবীন্দ্রিক। এটা কেন মনে হয় বা কেন বলছি সেটা হয়ত বলতে পারব না। কিন্তু এটা হয়।

রবীন্দ্র কবিতায় সুর দেওয়া সম্বন্ধে তুমি কি বল?

নিশ্চয় দেওয়া উচিত, বিশেষ করে গানের কথা ও সুরের এই দৈন্যের যুগে। এটা প্রয়োজন বাংলা গানের উন্নতির জন্যেই। সে সুর যদি প্রাণে লাগে নিশ্চয়ই থাকবে। না লাগবে প্রকৃতির আপন নিয়মেই ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। 'দিনের শেষে' এমন কালজয়ী হয়ে রইলো কেমন করে? আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই অনুমতি দিলেন কেন? পংকজবাবুর দেওয়া এ সুর গানে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। সেইজন্যই ত?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব, সুরের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা না হলে সুর দেওয়া নিরর্থক—আর এই প্রসঙ্গেই বলি, বরং জর্জদার 'আমার হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি' আমি মেনে নিতে পারি কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরই সুরের নিষ্প্রাণ অনুকরণে পরিমল হোমের দেওয়া সুর আমি মানতে রাজী নই।—সন্ধ্যাদি, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া সহজ তাই সবাই গান। কিন্তু ভালো গাওয়া কঠিন। জর্জদার ভালো গানের পিছনে অনেক চিন্তা, অনেক মেহনত, অনেক এক্সপেরিমেন্ট আছে।

নৃত্যনাট্যের প্রসঙ্গে একটা কথাই বলার আছে। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য ছাড়া অন্যান্য নৃত্যনাট্য সুরের দৌলতে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে কখনও কখনও ছাপিয়ে যেতেও পারে—যদি তেমন কোনো শক্তিমান স্রষ্টার হাতে পড়ে। কিন্তু সংলাপে ? সেখানে তিনি তুলনাবিহীন। নাটকে ডায়লগের সুর উনি যেভাবে বেঁধেছেন কল্পনা করা যায় না। রেডিওতে রবীন্দ্র গীতিনাট্য শুনেছেন ? রবীন্দ্র আওতার বাইরে ? অশ্রাব্য নয় ? কিন্তু শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ প্রভাবেও চূড়ান্ত ড্রামাটিক এফেক্ট সৃষ্টি করা যায়।

প্রতিভার অধিকারী হলে এবং সত্যিকারের ধ্যানে ডুবে থাকলে—অসাধ্য সাধন করা যায়। ধরুন না কানন দেবীর কথা। উনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী আর বড় হয়েছেন শিখতে শিখতে। ওঁর শিক্ষা কখনও থেমে থাকেনি। তাই যা গেয়েছেন তাই সাংঘাতিকভাবে রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। বাইরের ডিগ্রীর চেয়ে অনেক বড় জিনিস সাধনার একাগ্রতা। সরযূ দেবী অথবা রেবা দেবী লেডি ম্যাকবেথ অথবা হেনরিয়েটার পার্ট করেছেন, ওঁদের সংলাপ যেরকমভাবে এক্সপ্রেসিভ হয়ে উঠেছে তা ভাবলেও বিস্ময় লাগে। অথচ এঁরা ইংরিজিও জানেন না অথবা মূল সেক্সপীয়রও পড়েননি।

—রবীন্দ্রসঙ্গীতের বর্তমান ধারা ? রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরুদ্ধে আজকাল দুটি অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়—এক, গানে নাটকীয়তা সৃষ্টি, দুই, রেকর্ডে বাজনার আধিক্য।

প্রথমটির বিষয়ে আমি যেটুকু ভেবেছি তা হচ্ছে এই যে, আমরা যখন একজনের উক্তি অপরকে শোনাই—যেমন উনি এই কথা বললেন তখন আমাদের বলার মধ্যে একটা নির্বিকার ভাব থাকে,—স্বরের ওঠানামা থাকে না। কিন্তু সেই কথা যখন আমার কথা হয়, তখন বলার সময় সুর আসবেই, এবং সেই সুরের ওপর আমার আন্তরিকতা, বিশ্বাস আর বক্তব্যের ওজন নির্ভর করে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান আমরা কিভাবে শোনাবো ? রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথাগুলি প্রায় সকলজনকেই এমনভাবে স্পর্শ করে যেন মনে হয় কথাগুলি শুধু রবীন্দ্রনাথেরই নয়, আমাদের নিজেদেরও। তাই আমি যখন গান করি তখন আমার নিজের মনের কথা ভেবেই গাইবার চেষ্টা করি। ফলে কি যেন একটি বেশী এসে যায় যা স্বরলিপিতে থাকে না। এমন কি স্বরলিপির মাত্রা ভাগেরও এদিক ওদিক হয়। ফল কি হয় জানি না। তবে গাইতে ভালো লাগে। এখন এই বেশীর মাত্রা কি রকম হওয়া উচিত সেটাই ভাববার কথা। অনেকে বলেন, কথার ভাবপ্রকাশে গানের সুরই যথেষ্ট। স্বরক্ষেপণের কমবেশী করাটা বাহুল্য। কিন্তু অত্যন্ত সুরেলা কণ্ঠের শিল্পীকেও ব্যর্থ হতে দেখেছি শুধু স্বরলিপি পাঠের ফলে।

মঞ্চে পাত্রপাত্রীদের মুখে রং মাখাতে হয়, দূরের দর্শকদের মুখের ভাব বোঝাতে। সেই রংও নির্ভর করে চরিত্রের ওপর। এই প্রয়োজনটা কেউ মানেন না এমন কথা মনে হয় না। সেইরকম আমার মনের কথা বোঝাতে আমি রং চড়াবোই, কম বা বেশী সেটা নির্ভর করবে আমার ভাবনা ও শিক্ষার উপর।

স্বরলিপির বাইরে কোনো পর্দা লাগালে কিংবা দুই চার ছন্দের কি বারো মাত্রার তালের গান দাদরায় অথবা ষোলো মাত্রার গান কাহারবাতে গাওয়া অপরাধ কিনা জানি না। তবে সাময়িক মজা লাগে। কখনও ভালোও লাগে। এর জন্য গেলো গেলো রব তোলবার কি আছে? অক্ষমতার দরুন কঠিন তালের গান অনেক সময় ঢালা অর্থাৎ আলাপের মত গাওয়া হয়ে থাকে। একটু আগেই বলেছি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষতদের জন্য। তাই এ বিষয়ে তাঁদের কাছে আমরা একটু মনের উদারতার আশা রাখি। আসলটা ত রইলই স্বরলিপিতে। অবশ্য স্বরলিপি যদি আসল হয়।

এবার আসি বাজনার প্রসঙ্গে। আমার মনে হয় গান ভালো-লাগা, না-লাগা নির্ভর করে অনেকটা শ্রোতাদের মুডের ওপরে। একজনের একই রেকর্ড দুদিন দুরকম লেগেছে—এরকম উদাহরণ ত প্রচুর আছে। শান্তিনিকেতনের মাঠে খোলা গলায় গান গাইতে অদ্ভুত ভালো লাগে। মনে হয় এখানে সঙ্গতসঙ্গীত হিসেবে একটা তার-যন্ত্রই যথেষ্ট। কিন্তু কোলকাতায় তা হয় না। শহুরে জীবনযাত্রার একটা আলাদা মেজাজ নেই? এতএব এখানে উগ্র কিছু চাই। চারিদিকের উগ্রতার সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে যে। আর এর মধ্যে লাউড স্পীকারের গানও আছে।

আসল কথা, লোকের কানে যে করে হোক ভালো-লাগিয়ে কিছু রেকর্ড বিক্রী করার আশা আমাদের ছোটাছুটি করাচ্ছে। কিসে ভালো লাগানো যায় সেটা বোঝা খুবই কঠিন। প্রধান গুণ যে ভালো গাইতে পারা। এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই। ভালো গাওয়া বাংলা অথবা হিন্দী গান শুধুমাত্র একটি দুটি যন্ত্রের সঙ্গতে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছে সে প্রমাণ পেশ করা বিশেষ দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু সারা ভারতে বিভিন্ন রসের গানের সঙ্গে সহযোগী নানা যন্ত্রের সুরপ্রয়োগের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সেটা করলে ক্ষতি কি? শিল্পের বিচারে নিকৃষ্ট প্রমাণিত হলে তাকে ত আপনা থেকেই পিছু হটতে হবে। এর জন্য কারো তর্জন-গর্জনের প্রয়োজন হবে না।

কালের সঙ্গে সঙ্গে গায়কী পাল্টাচ্ছে। সেটা আমরা মেনে নিয়েছি ত? রবীন্দ্রনাথের আমলের মাত্র দু একজন শিল্পীর ছাড়া বেশীর ভাগ রেকর্ডই ত গায়কীর দরুন এখন অশ্রাব্য লাগে। তখনকার সাধ্যমত যন্ত্রপ্রাচুর্যে কানন-দেবীর গানের রেকর্ড কিন্তু সাদরে গ্রহণ করা হয়েছিলো এবং এখনও শুনতে ভালোই লাগে। তবে আজ বাধা আসছে কেন?

অনেকে হয়ত বলবেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে পরীক্ষাটা করার দরকার কি? আধুনিক গান নিয়ে করলেই ত হয়। তাঁদের কথা মেনে নিয়েও বলব যে, রবীন্দ্রনাথকে যদি পৃথক পৃথকভাবে গীতিকার এবং সুরকার হিসাবে বিচার করা যায়, তাহলে দেখি গীতিকাররূপে তিনি আজ পর্যন্ত একমেবাদ্বিতীয়ম। কিন্তু সুরকার হিসাবে তাঁর মান যে কি, সে পরীক্ষা দেবার তাঁর কোনো প্রয়োজনই হয়নি। অপরের কথায় সুরারোপ করার সার্থকতার মানদণ্ডেই সুরকারের সত্যিকারের পরীক্ষা। কিন্তু তাঁরই রচিত কথা ও সুর একসঙ্গে

মিলে তাঁর গান হয়ে উঠলো মনোরমা প্রিয়া। এই প্রিয়াকে মাঝে মাঝে মনের মত করে সাজাতে ইচ্ছে করে। সেই সাজ অপরের যদি ভালো না লাগে নিন্দা প্রশংসা নিশ্চয়ই করতে পারেন। কিন্তু বাধা দেবেন কেন?

প্রিয়াকে কেউ যদি রক্ষিতা বানাবার চেষ্টা না করে তার সঙ্গে প্রেম করেন—ক্ষতি কি? আর রবীন্দ্রনাথ চিরকালের শ্রেষ্ঠ গীতিকার বলেই ইচ্ছে করে গীতবিতানের পাতা ছিঁড়ে বিলিয়ে দিই এখনকার প্রতিভাবান সুরকারদের হাতে। তাঁদের সুরে ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলুক বাংলা গান।

এই হলেন আজকের চিন্তাশীল তরুণ শিল্পী অর্ঘ্য সেন। তিনি তরুণ—তাঁর মনের নির্ভেজাল তারুণ্যের জোরেই। স্বল্পভাষী শিল্পী—সহজে কথা বলেন না। কিন্তু বলেন যখন তাতে তাঁর তরুণ মনের সবুজ বাগানের কচি পুষ্পপল্লবের সুরভি মেলে। ঠিক তাঁর গানের মতই, মুক্ত মনের নির্মল প্রবাহে। অর্ঘ্যর প্রতিটি গান যেন তাজা ফুলের অর্ঘ্যের মতই সুরলক্ষ্মীর চরণে গিয়ে পড়ে।

অরবিন্দ বিশ্বাস

'রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পঙ্কজ মল্লিক একটা বিরাট আলোকস্তম্ভের মত। উনি আমাদের সকলেরই প্রেরণাপুরুষ। আজ এতখানি অসম্মান ও বেদনার ভেতর দিয়ে তাঁকে বিদায় নিতে হলো এটা আমাদেরই অযোগ্যতা।'

নিজেকে জানান দেবার কোনো তাগিদ নেই, অথচ আপন সাধনায়স্থিতধী,—ঠিক উদাসীন বলা চলে না, কিন্তু নম্রতায় সংকুচিত স্বভাবকে উদাসী হাওয়ার পথে পথে ঘোরা আনমনা মনে হওয়া বিচিত্র নয়—এইরকমই একটি চরিত্র হলেন অরবিন্দ বিশ্বাস। ধ্যান, মননশীলতা, সুকণ্ঠ, অনুশীলন সব কিছু থেকেও ওঁর যে বস্তুটির অভাব সে হলো তাঁর আত্মবিজ্ঞপ্তির ঢাক পেটানোর কুশলতা। সেইজন্যই গুণী হয়েও যথার্থ প্রাপ্য মূল্য ইনি আজও পাননি।

কোনো কাজভোলা উদাস দুপুরে আশেপাশের বাড়ির রেডিও থেকে ভেসেআসা 'কোথা হতে বাজে প্রেমবেদনা', 'কতবার ভেবেছিনু', 'আসা যাওয়ার পথের ধারে', 'বঁধু তোমায় করব রাজা'—শুনে নাড়া খেতেই বাড়ির রেডিও সেট খুললেই যখন গম্ভীর মধুর কণ্ঠের সুরে ঘর ভরে যায়—সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে ওঠে অরবিন্দবাবুর শান্ত গম্ভীর বলিষ্ঠ চেহারাটি। বলিষ্ঠ দেহের মত মনটিও বলিষ্ঠ বলেই কি ছোটোখাটো অপ্রাপ্তির বেদনা ঝেড়ে ফেলে দেবার শক্তি রাখেন ?—হয়ত বা তাই। কিন্তু বলিষ্ঠতার অন্তরালে অরবিন্দ বিশ্বাসের অসতর্ক মুহূর্তের করুণ মুখচ্ছবি আমার চোখে পড়েছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশিষ্ট শিল্পী হলেও অরবিন্দবাবুর মার্জিত কণ্ঠের মূলে আছে রাগসঙ্গীতের বিরাট পটভূমিকা।

ভারতীয় সঙ্গীতের অন্যতম পীঠস্থান বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা ইনি। বাবার প্রচণ্ড সঙ্গীতানুরাগ ছেলের মধ্যে বর্তেছিলো জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই।

বাবা সবসময় পঙ্কজ মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, জ্ঞান গোস্বামী, সায়গল, শচীন দেববর্মণের রেকর্ড এনে বাজাতেন আর আমায় সেই সব গান তুলে শোনাতে বলতেন। ঠিক শিক্ষা যাকে বলে তখনও তার সঙ্গে পরিচয় হয়নি। কিন্তু যে কোনো গান, তা যত কঠিনই হোক শুনতে না শুনতেই হুবহু তুলে নিতে পারতাম। এঁদের গান সবসময় গাইতাম বলেই কিনা জানি না এঁরাই অজান্তে আমার প্রাণের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। আর মজা এই এঁদের গান গেয়ে গেয়ে গলাটা আপনা থেকেই এমন তৈরী হয়ে গিয়েছিলো যে অন্য যে

কোনো গানই খুব সহজ মনে হতো—একটু থেমে আত্মবিশ্লেষণের আলোয় যেন অন্তরটা দেখে নিয়ে বলতে লাগলেন, কিন্তু এই সহজ ভাবটা যে কত বড় ভুল সেকথা বুঝতে পারলাম যখন সত্যি করে শিক্ষার সুযোগ এলো জ্ঞান গোস্বামীর কাছে।

জ্ঞান গোস্বামী? মানে 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর', 'মেঘে মেঘে অন্ধ' যিনি গেয়েছেন তাঁর কাছে আপনি গান শিখেছেন? রীতিমত রোমাঞ্চিত হয়ে প্রশ্ন করি।

তাঁরই কাছে—বিনীত গাম্ভীর্যে বললেন অরবিন্দ বিশ্বাস। বিষ্ণুপুর ত গানের দেশ জানেনই। ওখানে নিত্য গানের আসরে সন্ধ্যারাত মুখর হয়ে উঠতো। এইরকমই নানা আসরে শুনেছি জ্ঞান গোস্বামীর গান। দূর থেকে মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। কাছে যাবার সাহস ছিলো না। খুব মেজাজী মানুষ ছিলেন বলে অনেকেই ওঁকে দাম্ভিক মনে করতো। তায় চড়া মেজাজের অনেক গল্প শোনার দরুনই বোধহয় কাছে যেতে সাহস করিনি। একবার ভয়ে ভয়ে অ্যাপ্রোচ করেছিলাম আমাদের মেডিকেল কলেজের একটা অনুষ্ঠানে গাইবার জন্য। উনি ২৫ টাকায় গাইতে রাজী হয়েছিলেন। তখনকার দিনে ঐ অঙ্ক একটা অভিজাত দক্ষিণা ছিলো।

জ্ঞানবাবু সিমলিপালের রাজার কুলগুরু ছিলেন। ঐখানে উনি মাঝে মাঝে আসতেন গানও গাইতেন। রাজা আমার বাবাকে খুব খাতির করতেন। একদিন সন্ধ্যায় রাজবাড়ির আটচালায় ওঁর গানের আসর বসেছে। আমি শুনতে যেতে রাজা সসম্মানে নিয়ে গেলেন—একেবারে শিল্পীর কাছে। গানের শেষে পরিচয় করিয়ে দিলেন। উনি কিন্তু বিশেষ আমল দিলেন না। বেশ একটু তাচ্ছিল্যভরেই যেন বললেন—কি? গানটান হয়? বললাম, একটু আধটু গাই।

কি গান গাও? ভালোবাসার?

—আজ্ঞে না।—আমি আপনারই গান গাই। আপনার রেকর্ড থেকে তুলে।

—তাই নাকি? কই গাও ত? শুনি কেমন গাও!

গাইলাম। ওঁরই গান—'আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে' এবং 'মন বলে তুমি আছ ভগবান—চোখ বলে তুমি নাই'।

গান শোনার পর খুশী হলেন মনে হলো।

আমি সসংকোচে বললাম, রেকর্ড থেকে তুলেছি কিনা। তালে বোধহয় ভুল আছে।

উনি বললেন, আগে সুরের দিকে মন দাও। তাল আপনিই এসে যাবে। সুরের হাত ধরেই ত তাল আসে। না-কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বেশ। আমি তোমায় তালিম দেব। যখন যেখানে থাকব এসো।

যেতাম। ওঁর দিক থেকে কোনোদিন কার্পণ্য ছিলো না। গানের

মেলোডির ওপর উনি জোর দিতেন বেশী। আর সব সময় বলতেন, শুনে শেখো। এই প্রথম শিক্ষা কাকে বলে জানলাম। যখনই রেওয়াজ করতাম—মনে হতো গুরুজী যেন সামনে বসে শুনছেন আর বলছেন সুরের দিকে লক্ষ্য রাখ। এতদিন শুধু হুবহু নকল করে গাওয়ার দিকে ঝোঁক ছিলো। এখন একটা নতুন উপলব্ধির মধ্যে যেন চেতনা জেগে উঠলো। মনে হলো আমায় বাইরে কোথাও সূত্র খুঁজে বেড়াতে হবে না, আমার নিজেরই মধ্যে সুর আছে। তাকে অন্তর থেকে খুঁজে নিয়ে কণ্ঠে আনতে হবে। এই খোঁজার নেশা আমায় এমনভাবে পেয়ে বসলো যে এক একদিন রেওয়াজ করতে করতে কখন যে রাত ভোর হয়ে যেতো বুঝতেই পারতাম না।

এইভাবে কয়েক বছর কাটলো। তারপর শান্তিনিকেতন গেলাম মেডিকেল কলেজ ছেড়ে দিয়ে।

—হঠাৎ শান্তিনিকেতন গেলেন কেন?

মনে হলো গানটাই আমার জীবনে প্রধান। আর সব অবান্তর। পড়াশোনাতে মন বসতো না। শুধু গান গাইতে ইচ্ছে করতো। আমার মেজভাই শান্তিনিকেতনে পড়তো, সেই সূত্রেই মাঝে মাঝে ওখানে যেতাম। ওখানের পরিবেশটাও খুব ভালো লেগে গেলো।

—গুরুজীর দিক থেকে কোনো আপত্তি ছিলো না?

না। ওঁর দিক থেকে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম অথবা বাধ্যবাধকতা ছিলো না। উনি সব সময় বলতেন—গুরু আছেন তোমার অন্তরে। যেখানেই থাক যেমন ভাবেই শেখো সেই গুরুকে চেনবার চেষ্টা কোরো। দেখবে আপনা থেকেই তোমার সামনে পথ খুলে গেছে।

—তারপর?

শান্তিনিকেতনে অশোক আর আমি একসঙ্গে গেলাম বোধহয় ১৯৪৫ সালের প্রথমে। শৈলজাদা অ্যাডমিশন টেস্ট নিলেন। আর বললেন, একান্তই যদি শিখতে চাও ত লেগে থাক।

ওখানে ক্ল্যাসিক্যাল এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত—দুই-ই শিখতে হতো। রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানামুখী ধারাকে সত্যিকারের বুঝতে হলে অথবা গ্রহণ করতে হলে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের ভিত্তি থাকা দরকার। ক্ল্যাসিক্যাল গান ভালো করে না শিখলে মীড়, অলংকার, সুর গলায় আসে না। ওখানে ক্ল্যাসিক্যাল শিখতাম ওয়াজেলওয়ার, অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পি. এন. চিনচোয়ের কাছে। সেকেণ্ড ইয়ার অবধি এস্রাজ এবং ফার্স্ট ইয়ার অবধি তবলা শেখা বাধ্যতামূলক ছিলো। চার বছর এইভাবে কাটলো। মোহরদি, সুচিত্রাদি, বাচ্চু (নীলিমা সেন) তখন ওখানের সিনিয়ার স্টুডেন্ট।

চার বছর বাদে কোলকাতা এলাম। ১৯৪৯ থেকে রেডিও প্রোগ্রাম শুরু হলো। ১৯৫২তে আবার শান্তিনিকেতন গেলাম রবীন্দ্রলাল রায়ের কাছে ভালো করে রাগসঙ্গীত শেখার জন্য। ওঁর শিক্ষা পদ্ধতি এত সুন্দর ছিলো যে ওঁর কাছে শেখাটাই ছিলো একটা আনন্দের ব্যাপার।

—আপনার জীবনে যেভাবে গান এসেছে তাতে আপনার ক্ল্যাসিক্যাল গাইয়ে হওয়ারই কথা, কিন্তু হলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পী। এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগছে।

অরবিন্দবাবু হাসলেন, আমারই কি সময়ে সময়ে লাগে না ? আমি ক্ল্যাসিক্যাল গানের দিকে যাই এইটেই বাবার একান্ত ইচ্ছে ছিলো। আমি কিছু স্থির না করলেও ক্ল্যাসিক্যাল গানেই মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলাম এবং এ গানকে ভালোও বেসেছিলাম। কিন্তু শান্তিনিকেতনে গিয়ে সব ওলোট-পালোট হয়ে গেলো।

—কেন ?

প্রথমত একটু আগে যা বললাম ওখানে খানিকটা গলার বেস তৈরী করার জন্য ক্ল্যাসিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। পরে ওটা সেকেন্ডারী হয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতটাই প্রধান হয়ে উঠত। এইরকম পর্যায়বিভাগ মনের পরিবর্তনের জন্য অনেকখানি দায়ী। তার ওপর ছিলো পরিবেশের প্রভাব। প্রকৃতির সঙ্গে মনের ছন্দ মিলিয়ে ঋতু উৎসব, চাঁদের আলোয় গান, এতদিনের দেখা চাঁদ ও সূর্যের রূপ পাল্টে দিলো। নতুন দৃষ্টিতে তাদের দেখতে শিখলাম কবির গানের দাক্ষিণ্যে। এইভাবে, এমনভাবে টেম্পারমেন্ট তৈরী হয়ে গেলো যে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে শুধু ভালোই লাগলো না। অজান্তেই এই গানের সঙ্গে মনের গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেলো।

…রবীন্দ্রলাল রায়ের কাছে শেখবার জন্য যখন গেলাম সেই সময় শ্রীনিকেতনে একটা কাজও হয়ে গেলো। ওখানের সব দায়িত্ব যখন আমারই ওপর এসে পড়লো এত আনন্দ হয়েছিলো বলতে পারব না। ওখানের কাব্যময় পরিবেশ, রবীনবাবুর কাছে শেখা, শ্রীনিকেতনে শেখানো—সব মিলিয়ে এই সময়টা জীবনের একটা স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে আছে।

এতদিন শিক্ষার কথাটাই ভেবে এসেছিলাম। কিন্তু এখন শেখাতে গিয়ে অনেক অস্পষ্ট আইডিয়া আমার নিজের কাছেও স্পষ্ট হয়ে এলো। ভাবনাটা যেন পথ খুঁজে পেলো।

…এরপর কোলকাতার অধ্যায়। ১৯৫৭তে গোল পার্কে—সরকারের আনুকূল্যে মিউজিক ইনস্টিটিউট ফর দি ট্রেনিং অফ মিউজিক টিচার প্রতিষ্ঠানটি খোলা হলো। এখানে মাস ছয়েক লেকচারার থাকার পর হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট হয়ে গেলাম। নানা কারণে ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে গেলো।

তখন আমার নিজের ইনস্টিটিউশন ভানুতীর্থের প্রতিষ্ঠা হলো। ভানুতীর্থ নামটি বিবিদির দেওয়া। সংস্থাটি দু'এক বছরের মধ্যেই খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। এখনও ভালোই চলছে। আর এমন সুনামের সঙ্গে এত বছর ধরে প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব হতো না যদি না আমার স্ত্রী দীপ্তি নিষ্ঠার সঙ্গে এ কাজে এগিয়ে আসতেন।

—আপনি কিভাবে শেখান ?

শুধু রবীন্দ্রনাথের গানই শেখাই। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ও থিওরির দিকও। কানে কোন স্বরটা কিভাবে এসে মীড়কে স্পর্শ করলো— তার সঙ্গে গানের সম্পর্ক কোথায়—এই কথাটাই আমি সব সময় বোঝাবার চেষ্টা করি। শৈলজাদা, বিবিদি, শান্তিদা এঁদের মত শিক্ষক বিরল। এঁদের কাছে পাওয়া শিক্ষার ছাপটা মনে নিয়েই আমি শেখাই।

—নিজের প্রতিষ্ঠান ভানুতীর্থ ছাড়া অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপনি যুক্ত নেই?

এখন রবীন্দ্রভারতীতে আছি। সৌরভেও আমি রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্লাশ নিয়ে থাকি।

—রেকর্ড করবার সুযোগ পেলেন কেমন করে? শুনেছি প্রথমে একখানা রেকর্ড প্রকাশ করার জন্য শিল্পীদের অর্ধেক জীবনীশক্তি বেরিয়ে যায়।

কথাটা হয়তো সত্যি, অরবিন্দবাবু হেসে বললেন, তবে সৌভাগ্যক্রমে আমার ক্ষেত্রে সেটা ঘটেনি। রেকর্ড করার জন্য আমায় কোনো চেষ্টাই করতে হয়নি। ভগবানের আশীর্বাদের মতন এ সুযোগ আপনিই এসেছিল আমার কাছে। একবার নিউ এম্পায়ারে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে শেষ বর্ষণ। খুব সম্ভব ১৯৫৮ সাল সেটা। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলাম আমি। নৃত্য-পরিচালনায় সন্ধ্যা ঠাকুর। চণ্ডীবাবুর (চণ্ডীচরণ সাহা) বাড়ির সবাই দেখতে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে চণ্ডীবাবু নিজে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করে রেকর্ড করার আমন্ত্রণ জানালেন। পরে একদিন নিজে আমার বাড়িতে এসে ওঁর গাড়িতে করে স্টুডিওতে নিয়ে গেলেন। বললেন, আপনি নিজেই সিলেক্ট করুন—কোন ধরনের গান গাইবেন। আপনার গলায় সবরকমই গানই মানাবে।

আমি বেছে নিলাম রবীন্দ্রনাথের গান। আমায় প্রথম ৭৮ স্পীডের রেকর্ডের গান দুটি হলো 'গানের ঝর্ণাতলায়' ও 'চৈত্র-পবনে'। খুব হিট হলো। তারপর নিয়মিতভাবে রেকর্ড করে এসেছি—'সখি ভাবনা কাহারে বলে', 'কোথা হতে বাজে প্রেমবেদনা', 'আসা-যাওয়ার পথের ধারে', 'কতবার ভেবেছিনু', 'পারিনে সঁপিতে প্রাণ', 'ভালোবাসিলে যদি সে ভালো না বাসে', 'আমি চিনিগো চিনি তোমারে', 'বঁধু তোমায় করব রাজা', 'ও কেন চুরি করে চায়', 'কেনগো সে মোরে করে না বিশ্বাস', 'সখা সাধিতে সাধাতে কত সুখ', 'শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে', 'ওরা অকারণে চঞ্চল',। এবারে রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে একটু অন্য ধরনের গান রেকর্ড করেছি—'অনিমেষ আঁখি'—যৎ-এর ওপর। আর একটি ধ্রুপদাঙ্গের গান 'সুধাসাগর তীরে' পূরবী দত্ত, বীথিন, দীপ্তি—এদের সবাইকে দিয়ে গুরু বাগচির সৃষ্টিছাড়া ছবির ডিস্ক হয়েছে আমার পরিচালনায়। বহুদিন ধরে আমি হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টসের ট্রেনার ছিলাম। অশোককে এখানে আমিই এনেছিলাম। শিক্ষিত ট্যালেন্টেড ছেলে হিসেবে আমি ওর প্রতি চণ্ডীবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। উনি অশোকের গান শুনে খুব খুশী হলেন। আমি নিজে দাঁড়িয়ে ওর প্রথম

রেকর্ড করলাম 'সহে না যাতনা' ও 'আমার পরাণ যাহা চায়'। প্রথম রেকর্ডটা যখন খুব বিক্রী হতে লাগল মনে হলো এ যেন আমারই জিত। অশোক শুধু আমার সতীর্থই নয়। ওর মধুর স্বভাবের জন্য প্রথম দিন থেকেই ওকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

বাচ্চু, পূর্ণদাস বাউল, পূরবী দত্ত এঁদেরও আমি এনেছিলাম। এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের যোগ্যতায় ও প্রতিভায় প্রতিষ্ঠিত।

আর আমি সাহস করে এতসব পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জোর পেয়েছি চণ্ডীবাবুর কাছে। উনি যেমন সঙ্গীতপ্রেমিক, তেমনই উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বাংলা গানের সমৃদ্ধ ধারাকে যে ক'জন শিল্পী প্রতিষ্ঠিত করেছেন—তাঁরা সবাই চণ্ডীবাবুরই অবদান। পঙ্কজ মল্লিক, শচীন দেববর্মণ, সায়গল, সুধীরলাল, অনুপম ঘটক সবাই হিন্দুস্থানের আর্টিস্ট। এমন গুণগ্রাহী মানুষের সংস্পর্শে আসাটাও সৌভাগ্যের কথা। আজকের এই অনুদার জগতে এমন মানুষ কল্পনা করা যায় না। কিছুদিন আগে তাঁকে হারানোর ব্যথাটা আমার বড় বেজেছিলো। আমার যখন নাম প্রতিষ্ঠা কিছুই ছিলো না—তিনি আমায় এতবড় কোম্পানিতে নিয়ে গিয়ে কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তাঁর এতবড় বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পেরেছি কিনা জানি না—তবে এতবড় দায়িত্ব আমায় দিয়ে আমার মধ্যে তিনি আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন।

ডিস্কে রবীন্দ্রনাথের কিছু স্বদেশী গানের কোরাসও করেছি, 'দেশ দেশ নন্দিত করি', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ'। 'প্রথম যদি তব শক্তি'-ও করিয়েছিলাম। সব সময় চিন্তা করতাম নতুন কি করা যায়? মনকে কখনও সংকুচিত হতে দিইনি।

—রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোন বৈশিষ্ট্য আপনার মন টানে?

প্রথমত এ গানের বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা। যে কোনো প্রকৃতির মানুষ তার মনের মত গান এখানে বেছে নিতে পারে। সারা জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের অনুভূতিকে পাব একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই গানে। শুধু তাই নয়। সাহিত্য, সুরবৈচিত্র্য, ছন্দের রকমারী দোল, সার্বজনীন আবেদন সব মিলিয়ে এমন ঐশ্বর্যের পূর্ণতা আর কোন গানে নেই। যত দিন যাচ্ছে সঙ্গীতজীবনের নানান অভিজ্ঞতা এই কথাটিই নতুন করে যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

এইত সেইদিনই একটি ছাত্রকে শেখাচ্ছিলাম 'বিদায় করেছ যারে' এ গান আগেও ত কতবারই গেয়েছি। কিন্তু সেদিন শেখাতে শেখাতে নতুন করে লক্ষ্য করলাম—কানাড়া রাগাশ্রিত এই গানে জৌনপুরীর শ্রুতি বাঁচিয়ে কেমন আশ্চর্য ভঙ্গিতে কোমল ধা লাগানো হয়েছে।

কত সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করে মানুষের মন কি বিরাট উপলব্ধির মধ্যে জেগে ওঠে ধারণা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য বা রূপলাবণ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে কোনো বিশেষ রাগের প্রকৃতিটি মেলে ধরার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমায় কে সচেতন করেছিলেন জানেন? শান্তিনিকেতনের ঐ

মহারাষ্ট্রীয় গায়ক পি. এন. চিনচো। কি ভাবে? সে কথা শুনলে আরো আশ্চর্য হবে। উনি একদিন গানের সময় স র গ ম করতে গিয়ে গাইলেন মাপুধাপু গরুমুগারে—মোপাধাপা গামাগারে। লক্ষ্য করলাম ওঁর পাণ্ডিত্য, সুর-শুদ্ধতা সব কিছু থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র উচ্চারণের কারণে তানগুলো যেন কৌতুকের বস্তু হয়ে উঠছিলো। তখনই তুলনাটা মনে এলো। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে গাইতে গিয়ে কেউ যদি কথা ভাব এসবের কথা না ভেবে শুধুমাত্র রাগ ও তালের ওপর জোর দেয় তাহলে তারও ত তেমনই রূপবিকৃতি ঘটবে? এইসব দিকগুলো চিন্তা করতে শিখেছি গান গেয়ে নয়, শুনে। ওস্তাদদের গান শোনাটা আমি শিক্ষার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ বলে মনে করি।

'কার বাঁশী নিশি ভোরে' গানটিতে মোর কথাটি মপদনসাতে আছে। ১ মাত্রায়। অধিকাংশ শিল্পীই ভেঙে ভেঙে গান। একবার ভীমসেন যোশীর গান শুনতে গিয়ে ওঁর জৌনপুরীতে ঠিক ঐ ক'টি পর্দার ১ মাত্রার দোল আমায় যেন নতুন পথ দেখালে। আমি ঐ স্টাইলেই গেয়ে দেখলাম—গানের চেহারাই যেন পাল্টে গেলো।

তাই বলছিলাম বড়, ছোটো সবার গানই সব শিল্পীরই শোনা উচিত। এতে অনেক কাজ হয়।

রবীন্দ্রনাথের গানে টপ্পার একটি বিশেষ স্থান আছে। আমার মনে হয় এইসব গান গাওয়ার আগে ভালো গুরুর কাছে কিছুটা টপ্পার তালিম নিয়ে নেওয়া উচিত। কারণ টপ্পার স্ট্রাকচারটা কিরকম সেটা আগে বোঝা দরকার। গলা কাঁপালেই টপ্পা হয় না।

আর একটা বড় জিনিস হলো উচ্চারণ। আমরা কেউই পারফেকট নয়, এই কথাটা যদি মনে রাখা যায় একদিন না একদিন পথ খুঁজে পাওয়া যাবেই। শৈলজাদার শেখাবার সুচিন্তিত পদ্ধতি, শান্তিদার স্বতঃস্ফূর্ত গাওয়ার ভঙ্গি—এই দুই-এর সমন্বয় যেন আমার চোখের সামনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রকৃতিকে মেলে ধরেছে। এটা যে ঠিক কি তা বলতে পারব না। তবে এই রূপ আমায় মুগ্ধ করেছে বলেই আমি এমন করে এই গানে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছি।

আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী? এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

ওটা যার যার নিজের। চেহারা দিয়ে যেমন মানুষের তফাৎ করা যায়, গাইবার ভঙ্গি ঠিক তেমন করেই শিল্পীকে চিনিয়ে দেয়। তবে মোটামুটি টপ্পার যথাযথ প্রয়োগ ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ—এই দুটি বস্তুর দিকে নজর দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কথা ও সুরের মধুর মিলন—রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য।

যে কোনো কাব্যসঙ্গীতের ধর্মই ত কথা ও সুরের মিলন ঘটানো—তবে একে বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত করতে চাইছেন কেন?

আপনি ঠিকই বলেছেন, কাব্যসঙ্গীত মানেই কথা ও সুরের যথার্থ মিলন। কিন্তু যে রূপ কবি বা সুরকাররা ফোটাতে চান—আর যেটা ফুটে ওঠে—তার

মধ্যে একটা তফাৎ থেকে যায় না কি ? বাণী ও সঙ্গীতের এই মিলনের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের গানে। আমি সেই কথাটাই বলতে চেয়েছি।

এই প্রসঙ্গে বারবার পঙকজবাবুর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। গানের মধ্যে এই মিলনের মহিমাকে তিনি যেন সারাজীবন ধরে তাঁর সৌন্দর্য চেতনার দীপারতি দিয়ে পুজো করেছেন—প্রতিটি কথার সঙ্গে সুরের নিবিড় অন্তরঙ্গতাকে তাঁর তুলনাবিহীন ভঙ্গিতে সহস্র সহস্র শিক্ষার্থীর মনে সঞ্চারিত করতেন। আজ তাঁর বেদনার মুহূর্তে সেই মন্দ্রিত কণ্ঠের প্রশ্ন ও তার সঙ্গে সুর করে গাওয়া গানের চরণগুলি মনে পড়ে যাচ্ছে। মনে আছে উনি 'আনমনা আনমনা' গানটি কত দরদ দিয়ে শেখাতেন ? 'ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়বে তোমার মনে'— বলেই প্রশ্ন করতেন 'কেমন করে' ? না, 'মন্দ-মৃদুল তানে'—'কিসের মত' ? 'ঝিল্লী যেমন শালের বনে নিদ্রানীরব রাতে অন্ধকারের রূপের মালায় একটানা সুর সাধে' ইত্যাদি। উনি শুধু গুরু নন। কতবড় সাধক ধারণা করা যায় না।' আমি বলি।

নিশ্চয়ই। রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই* জনপ্রিয়তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পঙকজ মল্লিক একটা আলোকস্তম্ভের মত। উনি আমাদের সকলের প্রেরণাপুরুষ। সারাজীবন ধরে সঙ্গীতের সেবা করেছেন। উনিই শৈশব থেকে পূর্ণ যৌবনে সঙ্গীত শিক্ষার আসরকে পৌঁছে দিয়েছেন। শুধু কি রবীন্দ্রসঙ্গীত ? শিবরাত্রি, অকালবোধন, বারমাসের পুজোপার্বণ এবং তার আনুষ্ঠানিক গান এক কথায় অধ্যাত্মবোধের সঙ্গে আমাদের উৎসবের যোগ—গানের সুরে হৃদয়ে পৌঁছে দিয়েছেন বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। কিন্তু যাঁর কাছে এত পেলাম তাঁকে কি দিতে পারলাম ? কতখানি অসম্মান ও বেদনার ভেতর দিয়ে তাঁকে বিদায় নিতে হলো ? এ কথা যখন চিন্তা করি নিজের ওপর ধিক্কার আসে। আমরা তাঁর অযোগ্য উত্তরসূরী। তাই এতবড় অপমানের প্রতিবাদও করতে পারলাম না। কারণ আমরা শিল্পীরা আজও সংগঠিত নই। তারচেয়ে বড় কথা আমরা বড় আত্মকেন্দ্রিক। নিজের ভালোমন্দের বাইরে অন্য কিছু ভাবতে পারি না।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই উচ্ছ্বসিত গতি ? এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আপনার কি মত ?

এটা কতকটা হুজুগ! আবার কতকটা তাড়াতাড়ি নাম করবার তাগিদে অনেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের দিকে ঝুঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথকে এবং তাঁর গানকে সত্যিকারের ভালোবেসে, বুঝে গাইছেন ক'জন ? এদিকে যাঁরা নজর দেন না শ্রোতাদের চিত্তে তাঁদের আসন স্থায়ী হবে না। যাঁরা নজর দেবেন তাঁরাই চিরকাল থেকে যাবেন।

আপনার মনে কখনও কোনো ক্ষোভ জাগে না ? কখনও মনে হয় না আপনার চেয়েও কম যোগ্য শিল্পী যা পেয়েছে আপনি তা পাননি ?

দেখুন সন্ধ্যাদি, যার যতটুকু প্রাপ্য সে ততটুকুই পায়। অভিযোগ অথবা ক্ষোভ প্রকাশ করে জোর করে কোনো কিছু আদায় করা যায় না। আর করলেও সেটা বেশীদিন থাকে না।

অরুন্ধতী দেবী

'একদিন রবীন্দ্রনাথের বিপুল ব্যক্তিত্বের টানে অজস্র দুঃখবরণ করে নামমাত্র দক্ষিণায় শান্তিনিকেতনে কাজ নিয়ে কত মানুষ আনন্দে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। আজ সেই ব্যক্তিত্ব নেই। কিন্তু তার শক্তি মাধুর্য সবই রয়েছে তাঁর গানকে ঘিরে। সেই গানকে অবলম্বন করে বাঁচতে চেয়ে যদি কেউ একটু-আধটু ভুল করেন তবে সেই একটু ভুলের জন্য তাঁদের নিরুৎসাহ করাটা সুবিচারের কাজ নয়।'

গান রয়েছে মর্মে, কিন্তু প্রকাশভঙ্গির রূপ স্বতন্ত্র হয়েছে কর্মে এমনই এক শিল্পীব্যক্তিত্ব হলেন অরুন্ধতী দেবী। শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগ থেকেই যে ক'টি পরিবার রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভারতীয় পদ্ধতির আশ্রমজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত—অরুন্ধতী দেবী সেই পরিবারেরই মেয়ে।

যে যুগে রবীন্দ্রসঙ্গীত জনসাধারণের কাছাকাছি এসে পৌঁছয়নি, সেই যুগেই সঙ্গীতচেতনা ভালো করে গড়ে ওঠার আগেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের তীর্থনীরে স্নান করার দুর্লভ সৌভাগ্য এঁর জীবনে ঘটেছে।

প্রথম জীবনে কেটেছে ঢাকায়। সেখানেরই এক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'ডাকঘর' নাটকে মাত্র ৬ বছর বয়সে 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ' গেয়ে যে ছোট্ট মেয়েটি বিদগ্ধ সমাজের অকুণ্ঠ অভিনন্দন পেয়েছিলো, পেয়েছিলো অজস্র পদক, মালা আরও অন্যান্য উপহার তিনিই আজকের স্বনাম-গৌরবী শিল্পী অরুন্ধতী দেবী: সেলুলয়েডের বুকেই শুধুই নয় সুধীমহলের অন্তরঙ্গ আসরে, শিল্পী ও সাহিত্যিকের মিলনসভায় অরুন্ধতী দেবী এক ঝলমলে ব্যক্তিত্ব। শুধু রূপ নয়, প্রতিভা ও মননশীলতার দীপ্তিতেও ইনি যেন খাপখোলাতলোয়ার। শুধু প্রাণধর্মী নন। মনোধর্মীও।

'গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ' গানটি যখন গেয়েছিলাম তার কাব্যসৌন্দর্য কিংবা অন্য কোনো অর্থ বোঝার মত বয়স অথবা বুদ্ধি কোনোটাই হয়নি। কিন্তু ভাটিয়ালীর উদাসীসুরে রাঙামাটি, গ্রামছাড়া—এই দুটি কথা চেনামহলের গণ্ডী ছাড়িয়ে মনটাকে যে কোন সুদূরে পৌঁছে দিতো তার ঠিকানা পেতাম না। আর সেজন্যই সেই হারিয়ে-যাওয়া পথের প্রতি একটা রহস্যময় আকর্ষণ অনুভব করতাম। গ্রামের শেষপ্রান্ত ছাড়িয়ে ঐ রাঙামাটির পথ কোথায় গিয়ে মিশেছে? সেখানে কি পাহাড় আছে? না আকাশ নেমে এসেছে মাটির বুকে? এইরকম সব বিচিত্র ভাবনায় হারিয়ে যেতাম। আর নিজেকে এমনভাবে হারিয়ে

ফেলার মধ্যেও যেন কেমন একটা মুগ্ধ আবেশ অনুভব করতাম।

গান গেয়ে মেডেল পেয়ে আনন্দ হয়েছিলো নিশ্চয়ই। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড় আনন্দে মনটা ভরে ওঠে এখন, যখন ভাবি ছোটোবেলায় ঐসব গান গেয়েছিলাম বলেই ত কল্পনার ছোঁয়ায় মনটা এমন রঙিন হয়ে উঠতে পেরেছিলো! কল্পনার পটভূমি না থাকলে জীবনে কোনো বড় উপলব্ধির অধিকারী হওয়া যায় না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাছে এসব গানের মূল্য অপরিসীম—

এসব গানের মধ্যে একটা ত বললেন 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ', অরুন্ধতী দেবীর কথায় বাধা দিয়ে বলি, বাকীগুলি? রবীন্দ্রনাথের বাউল, রাগপ্রধান গান। ঢাকায় থাকতে গান শিখতাম নিত্যগোপাল বর্মণের কাছে। সুরের ঐশ্বর্যে, ভাবগৌরবে এইসব গানের সমৃদ্ধ ধারা কণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরকেও গড়ে তুলতো। আর আমাদের বাড়িতে এই ধরনের গান সকলের মুখে মুখে ঘুরতো আমার বাবারই উৎসাহে। বাবা (বিভুচরণ গুহঠাকুরতা) ছিলেন দার্শনিক প্রকৃতির মানুষ। সমাজসেবকও। তিনি হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সকল শাস্ত্র মন দিয়ে পড়েছিলেন বলেই সকল ধর্মের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মন্দিরে দাঁড়িয়ে তিনি যতখানি নিবিষ্ট-চিত্তে আরতি দেখতেন, ঠিক ততখানি আগ্রহ নিয়েই ব্রাহ্মসমাজে তখনকার মনীষীদের বক্তৃতা শুনতে যেতেন, চার্চে যেতেন আবার মসজিদেও যেতেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্মের উদার ব্যাপ্তিতে। বাবার এই ধরনের প্রগেসিভ দৃষ্টি-ভঙ্গির জন্য অনেকেই আমাদের ব্রাহ্ম ভাবতেন।

আমাদের সব ভাইবোনদের সঙ্গীতবোধ গড়ে ওঠার মূলে অনেকখানিই ছিলো বাবার এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব। সেইজন্যই সবরকম গানকেই আমরা ভালোবাসতাম, সকল সুরকারদের সুর থেকেই রস গ্রহণ করতে পারতাম।

ঢাকায় থাকতে নিত্যগোপাল বর্মণের কাছে গান শিখতাম, একটু আগেই বলেছি। কোলকাতার আসার পর সুরসাগরের কাছে শিখেছিলাম নজরুল অতুলপ্রসাদ এবং অন্যান্য বাংলা গান। সব গানই সমান অনুরাগে গাইতাম এবং শিখতাম।

তারপর একান্তভাবে না হলেও (কারণ সকল গানের সম্বন্ধে আমার এখনও যথেষ্ট আগ্রহ আছে) বিশেষভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হলাম শান্তিনিকেতনে থাকার সময়। আমার ছাত্রজীবন কেটেছে ওখানেই। ছোটো পিসেমশায় অজিত চক্রবর্তী শান্তিনিকেতনে শুরু থেকেই ছিলেন। গুরু-পল্লীর প্রথম বাড়িটি ছিলো তাঁরই। ছোটো পিসেমশাই এবং পিসিমার (লাবণ্যলেখা চক্রবর্তী) দাক্ষিণ্যেই আমাদের বাড়িতে রবীন্দ্রসঙ্গীত এলো ধারাসারে।

শান্তিনিকেতনে তখন শিক্ষাজীবন সম্পূর্ণ করতে যাঁরা আসতেন তাঁরা অধিকাংশই অবাঙালি। আমরা সেই মুষ্টিমেয় বাঙালি পরিবারের অন্যতম যারা শান্তিনিকেতনে পাঠ নিতে গিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সৃষ্ট

আদর্শলোকের প্রতি ভালবাসার তাগিদে। অন্য কোনো প্রয়োজনের চাপে নয়।

অন্য প্রয়োজনটা কি?

জাপানী বোমার যুগের কথাই ধরা যাক। সেই সময়ে অনেকেই গিয়েছিলেন প্রাণের দায়ে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার কারণে নয়।

যে কজন রবীন্দ্র অনুগামী পৃথিবীর সকল স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু-মাত্র তাঁর ব্যক্তিত্বের টানে, অজস্র দুঃখবরণ করে সেখানে সামান্য দক্ষিণায় আনন্দে জীবন কাটাতেন, তাঁদের ভালবাসার কথা মনে হলে চোখে জল আসে। কতবড় স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকলে মানুষ প্রতিদিনের বাস্তব জীবনের দুঃখ-কণ্টকে তুচ্ছ করতে পারে? যে দিব্য প্রেরণা তাঁদের এই শক্তি যুগিয়েছে সেইটিই হয়ত রবীন্দ্রনাথের প্রভাব।

কোলকাতায় তখনও রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার কোনো প্রতিষ্ঠান ছিলো না। রবীন্দ্রনাথের গান (তখনও রবীন্দ্র-সঙ্গীত নামে কোনো স্বতন্ত্র ঘরানা গড়ে ওঠেনি।) শেখবার পীঠস্থান ছিলো শান্তিনিকেতন।

সৌভাগ্যক্রমে আমার শিক্ষার ভার পড়লো শৈলজাদার ওপর, যাঁর মত গুরু দুর্লভ। উনি বললেন, গুরুদেবের কি গান জানো গাও। কারণ তাঁকে তোমার গান শোনাবার আগে যদি কিছু ভুলচুক থাকে ঠিক করে নিতে হবে। আমি একটাই রবীন্দ্রনাথের গান জানতাম 'উজাড় করে লহ হে আমার যা কিছু সম্বল।' গানটি ছিলো দেশ রাগের ওপর। শৈলজাদা একেবারে নতুন ছাঁদে ঢেলে সাজিয়ে দিলেন। মাত্র একটা দুপুর সময়। তারই মধ্যে অন্য ঢংয়ে গাওয়াটা সহজ নয়। কিন্তু এই কঠিন কাজও সহজ হয়ে উঠেছিলো যখন ভাবছিলাম স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সামনে এ গান গাইব। শৈলজাদা গান শুনে খুশি হলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিখিয়ে দিলেন আর একটি গান। যদি তিনি আরো শুনতে চান? গানটি হলো 'আমার কি বেদনা সে কি জানো।'

এলো সেই পরমলগ্ন। নাট্যঘরে তাঁর সামনে 'উজাড় করে লহ হে আমার' শুরু করবার কয়েক মুহূর্ত বাদেই তিনিও আমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গুন গুন করে গাইতে লাগলেন। এখন ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তখন ত বুঝিনি কি বিরাট মানুষ আমার সুরে সুর মিলিয়ে গাইছেন? ভাগ্যিস বুঝিনি! তাহলে। বোধহয় গলা দিয়ে একটি স্বরও বেরোতো না। গান শেষ হলো। উনি চুপ করে রইলেন। আমি একটু দমে গেলাম। কই আর তো শুনতে চাইলেন না? তাহলে কি আমার গান ওঁর ভালো লাগে নি? অন্তরযামী ছিলেন ত! সেইজন্যই হয়ত আমার মনের কথা এক মুহূর্তে বুঝে নিয়ে বললেন, আমার আর কি গান জানো? শোনাও। তখন গাইলাম 'আমার কি বেদনা।'

এ গান শেষ হবার পর উল্টে যখন তৃতীয় গান গাইতে বললেন, আমি বললাম, আর ত জানি না? এই গানটি আজই দুপুরে শৈলজাদা শিখিয়ে দিলেন তাই গাইতে পারলাম।

আজই শিখেছ? ওঁর আশ্চর্য দুটি চোখে বিস্ময়ের ছোঁয়া দেখে আমি

রীতিমত রোমাঞ্চিত।

তারপর বললেন, আশ্রমে থাকবে ত? কত মেয়ে আসে। গান শেখে। কি সুন্দর গায়। তারপর একদিন পাখীর মত ফুড়ুত করে উড়ে চলে যায়। তুমি যেওনা।...

এরপর শৈলজাদা কণিকার সঙ্গে আমারও একসঙ্গে গান শেখার ব্যবস্থা করলেন, নিজেও অবশ্য আলাদা করে শেখাতেন। কিন্তু তিনি কতবড় উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন আর আমার ভাগ্যটাও কত সুপ্রসন্ন ছিল ভাবা যায় না। না হলে কণিকার মত অমন গুণী প্রতিভাময়ী শিল্পীর সঙ্গে আমি এক-সঙ্গে গাইবার অধিকার পাই?

নানাদিক থেকে যেন গানের শতধারার জোয়ার নেমে এসে আমার মন-প্রাণকে এমনভাবে ভাসিয়ে যাবে এ কথা কি কোনোদিন কল্পনাও করতে পেরেছি?

শান্তিনিকেতনে সারা বছর ধরেই ছিলো অন্তহীন উৎসব। সে উৎসবে আসতেন পৃথিবীবিখ্যাত মানুষেরা। অনিল চন্দ, রানীদি (চন্দ) এঁরা ত ছিলেনই? এই উৎসবের সময় কত গান যে শেখা হয়ে যেতো। প্রতিটি শিল্পীর জন্য কি পরিশ্রম যে শৈলজাদা করতেন ভাবা যায় না। উনি এমন করে না শেখালে মাত্র দু-তিন বছরে কি ছশো গান শেখা হতো? কণিকার সঙ্গে শিখতাম সে ত একটু আগে বললামই। তাছাড়া রাজেশ্বরীদি যখন গান শিখতেন তাঁর কাছে বসেও অনেক গান শেখা হয়ে যেতো। এই রাজেশ্বরীদি এক আশ্চর্য চরিত্র। পঞ্চনদের মেয়ে অমন রূপ, প্রতিভা, বৈদগ্ধ্য কণ্ঠ কিন্তু সে সম্বন্ধে কি এতটুকুও উগ্রতা বা সচেতনতা আছে না কোনোদিন ছিলো? প্রকৃতিতে উনি কি কোমল, কি মধুর! সবচেয়ে বড় কথা—যে কথা শৈলজাদা বলেছেন এবং আপনিও বার বার উল্লেখ করেছেন, অ-বাঙালী হয়েও রবীন্দ্র-সঙ্গীত তথা বাঙালী সংস্কৃতিকে এমন করে আপনার করে নিয়েছেন যেন এইটেই ওঁর ধর্ম। উনি ত ইচ্ছে করলে খেয়াল, ভজন প্লেব্যাকে গজল বা যা ইচ্ছে গেয়ে ফ্যানট্যাসটিক নাম করতে পারতেন! কিন্তু উনি রবীন্দ্রসঙ্গীতকেই আপনার গান হিসেবে বেছে নিয়েছেন এবং সেখানেও একটি অনন্য স্থান করে নিয়েছেন। রাজুদি ইজ এ গ্রেট, গেট আর্টিস্ট।

কথার খেই হারিয়ে ফেলছি বুঝি? ক্ষমা করে নেবেন। প্লিজ! রাজুদির সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমি বড্ড ইমোশ্যনাল হয়ে পড়ি।

কি বলছিলাম? বি. এ পরীক্ষার আগে অবধি আমি শান্তিনিকেতনে ছিলাম। সঙ্গীতভবন তখন গড়ে উঠছে। কিন্তু কলাভবন রীতিমত জমজমাট। নন্দলাল বসুর সারাক্ষণের ধ্যানপীঠ ছিলো ঐ কলাভবন। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতজীবনও চলেছে সমান গতিতে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী মন দিয়েছিলাম বোধহয় ছবি আঁকতে। হয়ত বা মনের মধ্যে অস্ফুট বাসনা ছিলো ছবি আঁকাকেই জীবিকারূপে গ্রহণ করবার। কিন্তু এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোনো ধারণায় পৌঁছতে পারেনি।

গান গাওয়া আর ছবি আঁকার মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করতাম নতুন আত্মপরিচয়ের চমক বিভোলতা। এ আকর্ষণের মাধুর্য অবর্ণনীয়।

হঠাৎই একদিন রেডিওতে গাইবার আমন্ত্রণ এলো। মার খুব ইচ্ছে ছিলো না। কারণ রেডিওতে গাইলে সামান্য সম্মান-দক্ষিণা নেবার রেওয়াজ তখন চালু হয়ে গেছে। সেটা জীবিকার পর্যায়ে পড়ে বলেই মা আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু শৈলজাদা প্রতিযুক্তি দিলেন, আমরা ত সব সমসময় নেপথ্যেই রয়েছি। গুরুদেবের গানের অতবড় ঐশ্বর্যলোকের খবর ক'টা মানুষই বা জানে? তোমরা শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা যদি মাঝে মাঝে গাও তাঁর গানের সঙ্গে সবারই পরিচয় হবে। সুরেশ চক্রবর্তী তখন রেডিওর কর্ণধার। তিনি সব ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি, সুবিনয়বাবু একটা ফিচার প্রোগ্রামে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলাম। এভাবে ফিচার প্রোগ্রামে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া সেই প্রথম। ১৯৪০ সাল (যতদূর মনে পড়ে) সকাল সাতটা থেকে সাতটা পনের এবং সন্ধ্যাবেলা সাড়ে সাতটা থেকে আটটা অবধি রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারিত হতো। মাসে দুবার করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রোগ্রাম করতাম আমি, সুচিত্রা, কণিকা, নীলিমা ও হেমন্তবাবু।

১৯৪২ সাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিবিদি (ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী) ও প্রমথ চৌধুরীমহাশয় স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে থেকে গেলেন। সেই সময় সুযোগ হয়েছিলো তাঁর কাছে ভানুসিংহের পদাবলী, মায়ার খেলা এবং আরো অজস্র গান শেখার। সঙ্গীতশিক্ষার মধ্যে একটা সুবিন্যস্ত ধারার শুরু তখন থেকেই।

আমি আর কণিকা শিখতাম। কণিকা শিখতো ইন হার ওন রাইট। কিন্তু আমাকেও এ সুযোগ দেওয়া হয়েছিলো। কলেজের অফ পিরিয়ডে আমি দৌড়ে উত্তরায়ণে চলে যেতাম। মাথার ওপর ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, পথও অনেকটা। এখনকার শান্তিনিকেতন আর তখনকার শান্তিনিকেতনে অনেক তফাৎ। কিন্তু গানের নেশা এমনভাবে পেয়ে বসেছিলো যে, ওসব অসুবিধা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতাম না।

বিবিদি হয়তো খেতে বসেছেন, কি রান্না করছেন। আমাকে দেখলেই বলতেন ঐ টিপয়ের ওপর খাতা-পেনসিল আছে। নোটেশন করে নাও। আমি সুর তোলার সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপি করে নিতাম।

ওদিকে শৈলজাদা অধীর আগ্রহে বসে থাকতেন। বিবিদির কাছে তোলা গানগুলি তিনি আবার নতুন করে নোটেশন করতেন। পরে বিবিদি সেগুলি দেখে আবার গান গেয়ে গেয়ে সংস্কার করতেন। এইভাবে কত গান যে পাওয়া গিয়েছিলো কি বলবো? শৈলজাদা আমাদের কেবল উস্কে দিতেন— উনি হলেন গুরুদেবের গানের খনি। ওঁর কাছ থেকে যত পার আদায় করে নাও।

এই আদায় করার ব্যাপারে আমাদের যতখানি উৎসাহ ছিলো, বোধহয় তার চেয়েও বেশী তাগিদ ছিলো ওঁর পর্যাপ্ত গান উজাড় করে ঢেলে আমাদের

প্রাপ্তির অঞ্জলি, পূর্ণ করে দেওয়ার। এমন উদার অমায়িক মহীয়সী মহিলার সংস্পর্শে আসাটাও জীবনের এক রমণীয় অভিজ্ঞতা। তাঁর মধ্যে পাণ্ডিত্যের অন্ত ছিলো না। কিন্তু কখনও কোনো ব্যবহারে এতটুকুও দাম্ভিকতা দেখিনি। গানে যে স্বাধীনতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিতেন এবং তিনি নিতেন ঠিক সেই স্বাধীনতাই তিনি আমাদের দিয়েছিলেন।

প্রায়ই আমি, সুবিনয়বাবু, ইন্দুলেখাদেবী, নীলিমা, কণিকা, সুচিত্রা— সবাই একসঙ্গে শিখতাম। সেসব দিনগুলো ছিলো যেন আনন্দ পাথারে সাঁতার কাটার দিন।

শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের অধ্যায়ে নাট্যঘরেই নাচ, গান সবই শেখানো হতো। আমি আর কণিকা বেশীর ভাগ গানই শিখেছিলাম ঐখানেই।

কোলকাতায়, গীতবিতান প্রতিষ্ঠার সময় আমাদের প্রথম নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হোলো। আমি হয়েছিলাম শান্তা, কণিকা প্রমদা আর নীলিমা অমর। তারও আগে মায়ার খেলা সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিলো জোড়াসাঁকো প্রাঙ্গণে। রিহার্সালে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম 'মায়ার খেলা'-র গানগুলি গেয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে পিয়ানো বাজিয়েছিলেন বিবিদি। বিবিদির কণ্ঠে মায়ার খেলার অন্তরকমের গান শুনে আমি একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। আমার আগ্রহের আতিশয্য দেখেই কোলকাতায় মায়ার খেলা মঞ্চস্থ হবার অনেক আগেই তিনি সব গানগুলি আমায় শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৪৬ সালে পারিবারিক কারণে আমায় গান বন্ধ রাখতে হয়েছিলো। সেইসময় কিছু কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত আমি অনুবাদ করেছি। দিল্লীতে এবং বোম্বেতেও শিক্ষিত সমাজ এ গানের নতুন স্বাদে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এই যুগেই একবার মহাত্মাজির অনশন ভঙ্গ উপলক্ষে আমার আমন্ত্রণ এসেছিলো তাঁর প্রিয় গান শোনাবার 'আমায় ক্ষম হে ক্ষম' ও 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে।' মহাত্মাজির সেই মর্মান্তিক মৃত্যুর পর রেডিওতে সারাদিন ধরে তাঁরই উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে অনেকক্ষণ ধরে আমিও রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছিলাম। পরে যখন বিদেশে গেছি সেখানেও অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমার গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত খুব সমাদৃত হয়েছিলো।

এ গানের জনপ্রিয়তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কার অবদান বেশী এ প্রশ্নের উত্তরে এই কথাই বলবো—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে এ গানের প্রতি আগ্রহ জাগানো এবং শিল্পী গড়ে তোলার কাজে সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিলেন শুভদা (শুভ গুহঠাকুরতা)। গীতবিতান প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তাঁরই। তারপর অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রসঙ্গীতের গতিবেগকে দ্রুতলয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

কিন্তু তার আগে যদি ব্যক্তির মাধ্যমে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা সূচনার কথা উল্লেখ করতে হয়, সবচেয়ে আগে আসে পংকজ মল্লিকের নাম। তিনি একাই একটা প্রতিষ্ঠান যিনি এ গান গেয়ে, সঙ্গীতশিক্ষার আসরে শিক্ষা দিয়ে

এবং ছায়াছবিতে স্ব-কণ্ঠে ও সায়গল ও কানন দেবীর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করিয়ে জনসাধারণের মধ্যে এ গানের প্রতি তৃষ্ণা জাগিয়ে তোলেন এবং তাঁদের রুচিও গড়ে তুলেছেন। এ কথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই।

সঙ্গীতের জগতে কি কণ্ঠ, কি একস্‌প্রেশনের ক্ষেত্রে কানন দেবী ও সায়গল যেন দুটি ফেনোমেনন্‌। এঁদের কণ্ঠে যখন রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতি-ধ্বনিত হলো ('আজ সবার রংয়ে' ও 'আমি তোমায় যত')—সকল শ্রেণীর সঙ্গীতরসিক চমকে উঠলেন, অবহিত হলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরাট পরিধি, ভাবগভীরতা, সুরমাধুরী সম্বন্ধে। কথারও যে সুরের মতই একটা নিজস্ব আবেদন আছে 'সেই রাতের স্বপনভাঙা আমার হৃদয় হোকনা রাঙা'র উচ্ছল আবেগ অথবা 'উঠবে যখন তারা সন্ধ্যাসাগর কূলে'র স্তব্ধ বেদনার ছবিখানি যেন সেই খবরটি জানিয়ে দিলো।

প্রথম যুগে রবীন্দ্রসঙ্গীত 'মেয়েদের গান' বলে অনেকের কাছে উপহসিত হতো। সে অপবাদ থেকে তাকে মুক্তি দিলো পঙ্কজ মল্লিকের পৌরুষদৃপ্ত কণ্ঠ ও উচ্চারণ। 'বাজলো তূর্য আকাশপথে সূর্য আসেন অগ্নিরথে' সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সেই প্রথম সূর্যের (রবীন্দ্রসঙ্গীতের) আগমন ঘোষিত হলো। 'তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ কর' এখানে মিনতির মধ্যেও কি ওজস! বীরচিত্তের আহ্বান, অভিমান সব মিলে একটা প্রবল প্রচণ্ড অনুভূতির যে মর্যাদাগম্ভীর প্রকাশ ঘটেছে, পঙ্কজবাবু ছাড়া সে রূপ সৃষ্টি করা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হতো না।

মনে আছে গীতবিতানের উৎসবে আমি বলেছিলাম যে ছায়াছবির মাধ্যম ছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীত এত তাড়াতাড়ি জনমানসে পৌঁছত না। এধার দিয়ে আমাদের ঋণ সবচেয়ে বেশী নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারের সঙ্গীত পরিচালক পঙ্কজ মল্লিক ও রাইচাঁদ বড়ালের কাছে। এবং শিল্পী হিসাবে পঙ্কজ মল্লিক, সায়গল, কানন দেবীর কাছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতে জনপ্রিয়তার অধ্যায় শুরু করেছেন এঁরাই। এঁদের পরের যুগে জর্জ বিশ্বাস, হেমন্তবাবু। বিভিন্নভাবে ও ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের প্রেরণায় শৈলজাদা, শান্তিদা এঁরা যে সাধনা করেছেন তারই ফলশ্রুতি আজকের এই রবীন্দ্রসঙ্গীতের দিকভাসানো প্লাবন। এলেন রাজেশ্বরী দত্ত, কণিকা, সুচিত্রা, নীলিমা—কোলকাতার হাজার শিল্পী, শুভদা, নীহারবিন্দু সেন অন্যান্য গুরুদের প্রতিষ্ঠান। সবগুলি স্রোত মিলে মিলে এক শক্তিশালী ধারা যেন মহাসমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে আপনহারা আনন্দে। প্রতিদিনই হাজারটা আসরে শুনি সেই মহাসঙ্গীতেরই কলতান।

কনট্রোভার্সি ? সে তো থাকবেই। অনেকগুলি ব্যক্তিত্ব একত্র হলে মিলের সঙ্গে সঙ্গে অমিলের সংঘাতও মাঝে মাঝে এসে বিরোধিতার সৃষ্টি করে। তাকে অস্বীকার করা মানে জীবনকেও অস্বীকার করা। কনকর্ড, ডিসকর্ড সব

মিলিয়েই তো হার্মনির সৃষ্টি। এটাকে এতবড় করে দেখার দরকার কি ?

আর আমার কথা যদি বলেন, সঙ্গীত আমার প্রফেশন নয়, আনন্দের আকাশ। আর এজন্য আমি আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ, আর্ট যখন জীবিকা হয়ে ওঠে তখন স্বাভাবিক নিয়মেই তার সঙ্গে এমন কতকগুলি বেসুরো ব্যাপার জড়িয়ে পড়ে যে, শিল্পীকেও অশিল্পীজনক আচরণ করতে হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত যদি আমার জীবিকা হয়ে উঠত হয়ত নানান ঘটনা ও পরিস্থিতির চাপে এমন কাজ করে বসতাম সেটা হতো অরাবীন্দ্রিক।

আজ যে এমন স্বচ্ছদৃষ্টিতে সব বিষয়কে দেখতে পারছি কারো ওপর কোনো রাগ দ্বেষ না রেখে, তার কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার প্রফেশন নয়। এবং সেই কারণেই কোনো শিল্পীই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নন। সবাই আমার বন্ধু। এঁদের গান শুনে আমি প্রথম জীবনের সেই আনন্দমুখর দিনগুলিতে ফিরে যাই।

আমার প্রথম রেকর্ড 'পথে যেতে যেতে' তারপর 'আকাশতলে দলে দলে', 'ওগো আমার অচেনা।' তারপর ছবির জগতে আসার পর আমার সঙ্গীত পরিচালনায় 'ছুটি', 'মেঘ ও রৌদ্র'তে রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহার করেছি এবং এ প্রয়োগ সমাদৃতও হয়েছে। হবেই। শুধু আমি নয়। যে কোনো সঙ্গীত পরিচালকই এ সঙ্গীতকে ছবির কাজে সুষ্ঠুভাবে লাগাতে পারেন। কারণ, আমাদের প্রতিটি অনুভূতির, জীবনের প্রতি মুহূর্তের সংখ্যাতীত গান রয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাণ্ডারে। যখন যে কোনো গানই শুনি মনে হয় এ যেন আমার গান। এই বিরাট স্কোপ সবার জন্যই খোলা।

আর শিল্পী নির্বাচনের ব্যাপারেও আমি কোনো বাঁধাধরা কোড বা ডগমায় বিশ্বাসী নই। অমুক, অমুক শিল্পী গাইলেই এ গানের প্রকাশভঙ্গি রাবীন্দ্রিক হবে, অমুক গাইলে হবে না এই মনোভাবের চেয়ে অরাবীন্দ্রিক মনোভাব আর কিছু হতে পারে না। যে কেউ সুকণ্ঠের অধিকারী হলেই রবীন্দ্রনাথ নিজের গান তাকে গাইবার অধিকার দিতেন। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় তথাকথিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী নন। তবু ওঁকে দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়েছি এবং সে গান যথেষ্ট জনপ্রিয়ও হয়েছে। কণ্ঠ, অনুভূতি এবং পরিশীলিত স্বর—এই তিনটি বস্তু থাকলেই যথেষ্ট।

এখনকার এই আবেগ? থাকবে নিশ্চয়। তবে সব জিনিসেরই জোয়ার ভাঁটা আছে। উচ্ছলতা মাঝে মাঝে মন্দীভূত হয়। আবার বিপুল গৌরবে জেগে ওঠে, এইটেই পৃথিবীর নিয়ম।

এই প্রসঙ্গেই একটা কথা বলি। মাঝে মাঝে আমার কানে আসে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে শুদ্ধতা, অশুদ্ধতা, মর্ডানাইজেশনের অভিযোগ। এসব আমার কাছে অর্থহীন এবং অবান্তর বলেই মনে হয়। সকলের মিলিত চেষ্টা ও অনুরাগে এমন যে সমৃদ্ধ গানের ধারাটির সৃষ্টি হলো, এইসব তুচ্ছ জিনিসকে বড় করে তুলে—এতদিনের এত মানুষের পরিশ্রমকে পণ্ড করে দেওয়া উচিত নয়। সকলে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করে, তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত

হয়ে যথাসাধ্য সুন্দর করে গাইতে চান। একটু খারাপ হবার জন্য তাঁদের বাতিল করে দেওয়াটা আমি সমর্থন করি না। প্রত্যেক গানের মতো রবীন্দ্র-সঙ্গীতও ভাল করে গাইতে হলে গলার একটা ক্লাসিক্যাল বেসিস থাকা দরকার। এই শিক্ষার অভাবেই ভাল মন্দর তারতম্য ঘটে থাকে। এঁদের বাধা না দিয়ে গাইতে দিলে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ভুলত্রুটি সম্বন্ধে এঁরা নিজেরাই সচেতন হয়ে শুধরে নেবেন। শেষ পর্যন্ত কে থাকবেন এবং কে থাকবেন না সে বিচারের ভার সময়ের হাতে। Time is the greatest judge. শিক্ষিত কণ্ঠের গান চিরকাল থেকে যাবেই।

প্রথমেই বলেছি, এমন একদিন ছিলো যেদিন সেই বিপুল ব্যক্তিত্বের টানে সকল দুঃখ-দারিদ্রকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে ২০ টাকা ৩০ টাকা মাইনেয় শান্তিনিকেতনে কাজ নিয়ে কত মানুষ আনন্দে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। আজ সেই ব্যক্তিত্ব নেই। শুধু তার শক্তি ও মাধুর্য রয়েছে তাঁর গানকে ঘিরে। সেই গানকে অবলম্বন করে বাঁচতে চেয়ে কেউ যদি একটু আধটু ভুল করেন তবে সেই একটু ভুলের জন্য তাঁকে নিরুৎসাহ করাটা সুবিচারের কাজ নয়। মনে রাখতে হবে যোগ্যতা অযোগ্যতা, ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা সবকিছু নিয়ে তাঁরা হাত পেতেছেন রবিতীর্থেরই দাক্ষিণ্যদ্বারে। তাঁদের প্রতি অকরুণ নাই বা হলাম ?

অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাবগম্ভীরতা ও সুরের বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ক্লাসিক আর্টের পর্যায়ে ফেলা যায় বলে আমি মনে করি ।

অশোকতরুবাবুর আজকের দিনের এই আকাশছোঁওয়া জনপ্রিয়তার পটভূমিকায় চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রায় অনেক বছর আগের একটা ছবি ।

তখন কলেজে পড়ি। এক সহপাঠিনীর সঙ্গে গেছি খ্যাতির মধ্যগগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতই দীপ্যমান এক শিল্পীর ঘরোয়া আসরে। চারিদিকে অগণিত ভক্তের ভীড়। নানান ভক্তের স্তবস্তুতিতে বিগলিত শিল্পীর এক আকস্মিক বিদ্রুপবাণ নিক্ষিপ্ত হলো এ অধমের দিকে—তারপর ? ওস্তাদ কি মনে করে ?

অপরাধ আমার উচ্চাঙ্গসঙ্গীত ও শিল্পীপ্রীতি আর তাঁর ভক্তদের মত তাঁকে দেখে গদগদ না হওয়া ।

আমায় দেখলেই অমুক অমুক ওস্তাদ ও পণ্ডিত কিছুই নয়—এটা প্রমাণ করবার জন্য উঠেপড়ে লাগতেন। আর সঙ্গে সঙ্গে চলত আমার রবীন্দ্রসঙ্গীত জ্ঞানের পরীক্ষা ।

সেই অভ্যাসমতই যথারীতি আক্রমণ করেই বললেন, আপনাকে একটি গান শোনাই। বলেই ধরলেন 'কে যাবি পারে ওগো তোরা কে?' শেষ হতে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগলো ?

—বলাই বাহুল্য ।

—এ গান আগে কোনোদিন শুনেছেন ?

—শুনেছি ।

—কোথায় ? কার কাছে ?

—বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে (তখনও অশোকবাবু শিল্পীখ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত হননি) ।

ভুরু কুঁচকে ঠোঁট উল্টে শিল্পী জিজ্ঞেস করলেন, সে আবার কে ?

—আমায় আর কষ্ট করে উত্তর দিতে হলো না। উত্তর দিলেন তাঁরই এক ভক্ত, ওঃ! আমি চিনি তাকে। শান্তিনিকেতনের ছাপ আছে। এখানে ওখানে গেয়ে নাম করবারও চেষ্টা করছেন। তিনি আবার তালতলা দিয়ে হাঁটেন না (অর্থাৎ একেবারেই বেতালা)। অথচ শিল্পী হবার সখ আছে।

সকলের অট্টহাসির অট্টরোলে আসর সমাপ্ত হলো। আমার সঙ্গে তখন অশোকবাবুর আলাপ পরিচয় ছিলো না। আমি তাঁর ভক্ত অভক্ত কিছুই ছিলাম না। অতএব এ-পরিহাস আমায় বিঁধলো না।

এ ঘটনার প্রায় ১২ বছর বাদে যবনিকা উঠলো অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে। সাংবাদিক হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম 'কৌশিকী' নিবেদিত অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি একক সঙ্গীতের আসরে। অশোকবাবু তখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম সারির শিল্পী হয়ে উঠছেন। এর আগেরও একটি একক আসরে (আমার সেখানে যাওয়া হয়নি)—গান গেয়ে তিনি নাকি সবাইকে চমকে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়। এ ধরনের একক আসরের উদ্গাতা তিনিই। অনুরোধ এলো বিশ্বজিৎ রায়ের (অমৃতবাজার পত্রিকার) তরফ থেকে। খুব সম্ভব তাঁরই নির্দেশে শিল্পীর তরফ থেকেও টেলিফোন যোগে আমন্ত্রণ এলো। অনেকটা ভদ্রতার খাতিরেই যেন গুটি গুটি হাজির হলাম অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে।

একুশে ফেব্রুয়ারির সেই সন্ধ্যা মনে থাকবে অনেকদিন। কারণ সেইদিনই অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর যথার্থ স্বরূপে জেনেছিলাম।

সেই সন্ধ্যায় পূজা প্রাঙ্গণের মত শুচিশান্ত পরিবেশ, শিল্পীশ্রীসমৃদ্ধ পশ্চাৎপট, পরিবেশিত প্রতিটি গানের আগে তার পটভূমিকা বিশ্লেষণ, সর্বোপরি আপনভোলা শিল্পীর প্রাণের আকৃতি ও আবেগ যেন বিবাহসভার পুরোহিতের মন্ত্রের মত শ্রোতাদের অন্তরের সঙ্গে কবির গানের মিলন মহোৎসব সম্পন্ন করলো। গায়কের কণ্ঠ কতটা পরিশীলিত, কোন শ্রুতির অনুকরণ কতটা শুদ্ধ, সে বিচার মনে জাগেনি। সকল বিশ্লেষণী বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে মনে জেগেছিলো একটি অনুভূতি—শিল্পী সকল বাধাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে যেন এক বিরাট চেতনার সঙ্গে মিলতে চাইছেন, মাঝে মাঝে তাকে স্পর্শও করছেন—আর সেই চকিত ছোঁয়ার আনন্দকে শ্রোতাদের অন্তরে ছড়িয়ে দেবার আকুলতায় যেন মেতে উঠছেন।

অশোকতরুবাবু সেদিন অনেক গানই গেয়েছিলেন। রকমারি তালের নানান ছন্দের দোলায় দলিয়ে দিয়েছেন চিত্ত ('তালতলা দিয়ে হাঁটেন না' মন্তব্যের বক্তা সেদিন আসরে ছিলেন কি?) কিন্তু 'আঁধার রাতে একলা পাগল' (যার মধ্যে রবীন্দ্রভাবনার বিশেষ রঙের 'কানাড়া'র বিশেষ এক ঝলকে-ওঠা রূপমনকে অভিভূত করে দেয়) সে গান শুনে একটি উপমার কথাই মনে এসেছিলো। আকাশের আর একটা নাম 'ক্রন্দসী'—পূর্ণতার জন্য মহাশূন্যের হাহাকার বা কান্না। সেই কান্নাই যেন শোনা গেলো শিল্পীর উচ্চগ্রামে কণ্ঠ উত্তরণের পরই আবার মন্দ্রসপ্তকে সহজ, স্বচ্ছন্দে নেমে আসায় এবং একই পর্দায় অটল স্থায়িত্বে। ক্রমবিলীয়মান রেশের আলোছায়ায়ভরা বেদনার আভাসে।

ঠিক এইভাবে একক রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে পর পর কবিগুরু নানা ভাবের, মানস-চেতনার নানা অধ্যায়ের গান সাধারণ প্রেক্ষা-গৃহে এর আগে শুনেছি বলে মনে পড়ে না এবং এই ধরনের আসর উপস্থাপনার কৃতিত্ব একান্তভাবে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়েরই প্রাপ্য—এ সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই। শুধু তাই নয়। এইরকম ভাষ্যসহ রবীন্দ্র-

সঙ্গীত পরিবেশনা দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি শ্রোতাদের অবহিত করেছেন এবং রসজ্ঞ শ্রোতা তৈরী করার ক্ষেত্রে শিল্পীদের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁর সচেতন-প্রয়াস রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে নূতন উদ্দীপনার জোয়ার এনেছে। ইদানীংকালে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় কোনো শিল্পীর একক আসর যে মনোরম আকর্ষণ সৃষ্টি করে সেটা অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনারই ফলশ্রুতি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের অধ্যায়ে পৌঁছবার আগে অশোকবাবুর প্রথম সঙ্গীতশিক্ষা শুরু হয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীত দিয়ে এ হতেই হবে জানতাম।

অশোকবাবুর প্রথম শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রলাল রায়। রবীনবাবুর শিক্ষাপদ্ধতি এত সুন্দর ছিলো যে সরগমের মত শুষ্ক জিনিসও সরস হয়ে উঠত।

উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে এলেন কেমন করে?

প্রশ্নের উত্তরে অশোকতরুবাবু বললেন—সেও এক মজার ব্যাপার। খেয়ালিয়া হবার আকাঙ্ক্ষাতেই রবীনবাবুর কাছে তালিম নিতে শুরু করেছিলাম। আমি ম্যাট্রিক পাস করবার পর লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজে ভর্তি হবার কথা চলছিলো। কিন্তু মার ইচ্ছাতেই শান্তিনিকেতন গেলাম। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক যোগাযোগও ছিলো।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচুর পুরোনো রেকর্ড বাড়িতে ছিলো। ছোটবেলা থেকে সেইসব শুনতে শুনতে অজ্ঞাতেই যেন মনের অতলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা সংস্কার গড়ে উঠেছিলো।

'রাগসঙ্গীতের ধ্যাননিবিষ্ট চিত্তকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দিকে মোড় ঘোরানোয় কোনো দ্বন্দ্ব আসেনি? বিরাট ব্যাপ্তিতে যে মন বিহঙ্গের মত উড়ে বেড়াত তাকে একটা সীমিত পরিসরে সঙ্কুচিত করায় স্বাধীন মন বিদ্রোহ নিশ্চয় করেছে?'

করেছে। তবে, পরে। শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপর্বের প্রথমে মহারাষ্ট্রীয় অধ্যাপক পণ্ডিত বিদ্যাধরজীর কাছে মার্গসঙ্গীতে তালিম নেওয়ার রীতি ছিলো। তাঁরও ইচ্ছে ছিলো আমায় খেয়ালী তৈরী করার।

এর পরই এলো রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার অধ্যায়। দ্বন্দ্বের শুরু তখন থেকেই। কোনদিকে যাব? রাগসঙ্গীতের ধারায় চললে আমার সঙ্গীতধর্মের প্রতি সুবিচার করা হবে? না, আমার সঙ্গীত মানসের সার্থকতা রবীন্দ্রসঙ্গীতের পথেই? দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ। একটায় সুরের সীমাহীন বিস্তার আপনাকে প্রকাশের পথ খুঁজছে তান ও বিস্তারের বর্ণবৈচিত্র্যে, অন্যটায় ভাষা যেন ভাষাতীতের সঙ্গে মিলনতৃষ্ণায় আত্মহারা। দুটি দিকই আমায় সমানভাবে টানতো। তবু রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বেছে নিয়েছিলাম যতটা তার নিজস্ব সম্পদের আকর্ষণে তার চেয়ে বেশী বাণিজ্যিক সাফল্যের অব্যর্থ পথ হিসেবে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষাগুরুদের সম্বন্ধে কিছু বলবেন না?

ইন্দিরা দেবী এবং শৈলজাদা উভয়ের কাছেই আমি নিয়মিতভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিখেছি—

এখানেও আমার একটি প্রশ্ন আছে। বিভিন্ন শিল্পীর প্রকাশভঙ্গি ও সঙ্গীতব্যক্তিত্বে তফাৎ থাকাটাই ত স্বাভাবিক। এ নিয়ে কোনো সমস্যা বা দ্বন্দ্ব?

একেবারেই না। আত্মিক এবং স্নেহের সম্বন্ধ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গেও বিবিদির, ইন্দিরা দেবীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো শান্তিনিকেতনের আগের যুগে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-মানসের প্রথমদিকের হুবহু ছবিটি পাওয়া যেতো এঁর গাইবার ঢঙে।

আবার শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরিভাবেই পেয়েছিলেন শৈলজাবাবু। কাজেই এ ক্ষেত্রে কবির গানের বিভিন্ন যুগের দুটি ধারার স্বতন্ত্র রূপ সংঘাতসৃষ্টি করেনি। বরং উভয়েই উভয়ের পরিপূরক হয়ে উঠতে পেরেছে।

এইভাবে শিখতে শিখতে হঠাৎ কখন কোন ফাঁকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কাছে মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে বসে আছি বুঝতেই পারিনি। অন্তর-গহনের এই রূপান্তর সম্বন্ধে অবহিত হলাম কোলকাতায় এসে স্বর্গত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে তালিম নেওয়ার সময়। এঁর কাছে আমি ঋণী একাধিক কারণে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে অনুপম কথা দিয়ে তৈরী রূপলোকের অন্তরালে সুরেরও একটা বিরাট অনুভব লোক আছে—এ-উপলব্ধির দীক্ষা পেলাম তাঁরই কাছে। দ্বিতীয়ত তাঁর কাছে রাগসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধুর মিতালীর খবরটি জেনে মনটা খুব স্বস্তি পেয়েছিলো।

—কিভাবে?—কৌতূহলে উদ্বেল হয়ে উঠি।

—সুরেশবাবু যতবড় সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন ঠিক ততখানিই নিরভিমানী ছিলেন। বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে মনকে সীমাবদ্ধ রাখেননি বলেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নানাদিক সম্বন্ধে এঁর একটা স্বচ্ছ, মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো। অনেক উন্নাসিক ওস্তাদের মত রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সঙ্গীত-নয় বলে কখনও উড়িয়ে দিতেন না। আমার মানসিকপ্রবণতা লক্ষ্য করেই বোধহয় তিনি আমায় ধ্রুপদের তালিম দিতেন। আর থিওরী সম্বন্ধে শিক্ষা ত নিতেনই।

সুরেশবাবু আমায় একটা রাগের তালিম দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেই রাগের ছোঁওয়ালাগা নানারকমের রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে চাইতেন। গান শোনার পর উনি সুরবিন্যাস বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতেন কোন রাগের পর্দা কেমন করে এবং কোথায় কখনও আলতোভাবে কখনও স্পষ্ট করে গানের সঙ্গে মিশে এক আশ্চর্য পরিণতিতে কথা ও সুরকে পৌঁছে দিয়েছে। আমার চোখের সামনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের যেন একটা নূতন দিক খুলে গেলো। এতদিন শুধু গাইবার আনন্দে গেয়ে যেতাম। এখন থেকে গাইবার সঙ্গে সঙ্গে মনটাও যেন ভাবতে শুরু করে দিলো।

শিল্পীর ভাবনার যাঁতাতেই রাখলাম পরের প্রশ্ন—রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বর-

লিপির বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তাই সৃষ্টিধর্মী শিল্পীর পক্ষে এ সঙ্গীতকে আত্মপ্রকাশের বাহনরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয় বলেই অনেকে মনে কারন। এ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্যটা জানতে ইচ্ছে করে।

দেখো, স্বরলিপিকে প্রাধান্য দেওয়াটা আধুনিককালের প্রথা। আমি বিশ্বাস করি গুরুমুখী বিদ্যায়। আগেকার দিনের পুরানো রেকর্ডের চেয়ে আজকালকার রেকর্ডে ধরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর অনেক বেশী স্বরলিপি অনুসারী। কিন্তু রবীন্দ্রনাকে বেশী করে পাওয়া যায় যেন পুরানো দিনের রেকর্ডেই। রবীন্দ্রনাথের কাছে সাক্ষাৎভাবে যাঁরা গান শিখেছেন তাঁদের সুরের মধ্যেও কিছু পার্থক্য হয়তো দেখা যাবে। কিন্তু সেটা বাইরের আবরণ মাত্র। অন্তর্লীন ভাবের ঐক্যে সকলে এক পরিবারেরই। শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পীব্যক্তিত্বের একটি স্থান চিরদিনই আছে বা থাকবে।

এ থেকেই প্রমাণিত হয় স্বরলিপির চেয়ে গায়কী অনেক বেশী জীবন্ত। রাবীন্দ্রিক ভঙ্গিমাকে অনাহত রেখে শিল্পীর আত্মপ্রকাশই হলো রবীন্দ্রসঙ্গীতে বড় কথা। স্বরলিপির সামান্য তফাতে কিছু যায় আসে না। এই গায়কী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের কাছে শিক্ষা না নিয়ে শুধুমাত্র স্বরবিতানের বিদ্যাটুকু সম্বল করেই রেকর্ডে বা রেডিওতে অথবা সাধারণ সভায় রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করতে ছোটাটা আমি অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরুদ্ধে একঘেয়েমির অভিযোগের উত্তরে আপনার কিছু বলার নেই ?

—নিশ্চয়ই আছে। বহুল প্রচার অথবা বাঞ্ছিত পরিণতিতে পোঁছনোটা এ সঙ্গীতের অবশ্যই এক উজ্জ্বল দিক। কিন্তু এই বহুলপ্রচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো পরিবেশনায় সহজীকরণের প্রবণতা।

রবীন্দ্রসঙ্গীত যাঁরা গান এবং যাঁরা শোনেন তাঁদের উভয় পক্ষকেই মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যবিরোধী কোনো উদ্ভট কাজ করেননি। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ঐতিহ্যকেই তিনি আপন ভাব ও কল্পনা অনুযায়ী গড়ে নিয়ে অকল্পিত রসলোক সৃষ্টি করেছেন।

ঠিক এই কারণেই সাধারণভাবে কণ্ঠচর্চা ও শিক্ষা নিয়ে গাইবার উপযুক্ত গলা তৈরী এবং রাগরাগিণী সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট করে নিয়ে তারপর রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখলে কোন রাগ কবিকে কোন ধ্যানে কিভাবে পোঁছে দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে কোন পথে নিয়ে গেছে তাকে উপলব্ধি করা সহজ হয়। এরপর গায়ক বা গায়িকার আপন আবেগ ও অনুভূতির রং ঢেলে কবির গানকে স্বকীয় করে নেবার পালা।

এতগুলি বস্তুর সমন্বয় না ঘটলে শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত কেন, কোনো সঙ্গীত পরিবেশনাই সার্থক হয় না। একথা ভুলে শুধুমাত্র সুকণ্ঠকে সম্বল করে কোনোরকমে সুরটি ওপর ওপর আয়ত্ত করে গাইতে গেলেই রসসৃষ্টির পরিবর্তে কৃত্রিমতা এবং একঘেয়েমি এসে পড়ে।

এটা হলো একঘেয়েমির একটা কারণ। আর একটা কারণ হলো শিল্পীর

দিক থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার বিচিত্র অধ্যায়ে বক্তব্যকে উপলব্ধি করবার অভাব।

কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের পটভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত না করে শুধুমাত্র স্বরলিপি অনুসরণ করে গাইতে গেলে এই বৈচিত্র্য উপভোগের আনন্দ থেকে নিজেকে ও শ্রোতাদের বঞ্চিতই করা হয়। যেমন ধর 'স্বপন যদি ভাঙিলে রজনী প্রভাতে'—এখানে মপমা মা, সগমপারে সা-র-রে-সা-রে-র মীড়ে যে ছবি ফুটে উঠলো—রবীন্দ্রনাথ কি বলতে চেয়েছেন সে কথা না বুঝে শুধুমাত্র স্বরলিপি অনুসরণ করে গাইলে সে ছবি ফোটা সম্ভব? কিংবা 'দিবস-রজনী আমি যেন তার আসার আশায় থাকি'—এভাবে গাইতে গেলে গাওয়া হয়ত একরকম হলো কিন্তু কোনো প্রাণস্পর্শী ইমেজ পাওয়া গেল কি? মাঝে মাঝে একটা 'ব্লাইন্ড এসথেটিক সেন্স'-এর তাগিদে এক-আধবার হয়ত ভালো হয়ে গেলো, কিন্তু পরমুহূর্তেই সেই নিবিড় ভাবটির যেন অন্তর্ধান ঘটলো।

—এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে। আপনি যাকে 'ব্লাইন্ড এসথেটিক সেন্স' বলছেন, ধরুন আমি তাকে ইমোশন বা ইন্সপিরেশন বলছি। ছোটবড় যে কোনো শিল্পীই হোন না কেন, তিনি জীবনে যতবার গান গাইবেন তার মধ্যে ততবারই গাইবার সমান আবেগ বা প্রেরণা সমানভাবে কাজ করবে এটা তো হতে পারে না। এবং হতে পারে না বলেই কোনো শিল্পী বা কবির (তাঁরা যত বড়ই হোন না কেন) সকল শিল্প বা কাব্যগুলি কখনও মাস্টারপিস হতে পারে না। মাস্টারপিস-এর পর্যায়ে শিল্পীজীবনের কিছু সৃষ্টি পড়ে। অতএব ফলটা সমানই হলো। ঐ ইন্সপিরেশন বা ব্লাইন্ড এসথেটিক সেন্স-এর তাগিদে এক-আধবারই উতরে যায়। তাই নয় কি?

—তোমার কথার সত্যতা আছে মানি। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আমার কিছু বক্তব্য আছে। ফোক আর্ট এবং ক্লাসিক্যাল আর্ট—দুয়ের মধ্যে একটা তফাৎ চিরদিনই আছে এবং থাকবেও। লোকসঙ্গীত বা লোকনৃত্যের শিল্পীদের একটা মোটা আবেগেই কাজ চলে যায়। শ্রোতাদের দিক থেকেও তাই। এই জন্য দেখবে লোকসঙ্গীত বা লোকনৃত্য বেশীক্ষণ ভালো লাগে না।

কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাবগভীরতা ও সুরের অন্তহীন বৈচিত্র্যে—যাকে ক্ল্যাসিক আর্টের পর্যায়ে ফেলা যায় বলে আমি মনে করি, তার মধ্যে একটা টেকনিক্যাল আসপেকট্ থাকবেই। এটা টেকনিক সম্বন্ধে ধারণা থাকা শিল্পীর পক্ষে একান্ত দরকার। এটা না থাকলে শিল্পীর প্রকাশভঙ্গীতে পূর্ণতা আসে না। ঠিক এই কারণেই রবীন্দ্রসঙ্গীত অথবা ক্লাসিক্যাল গান অনেকটা শ্রোতাদেরও বৈদগ্ধ্যের অপেক্ষা রাখে। এবং ঠিক এই কারণেই এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল শিল্পীর গানে আবেগের তারতম্যের কারণে ভাল-লাগার ডিগ্রীর তফাৎ হতে পারে। কিন্তু তাঁর গানের সম্বন্ধে ইম্প্রেশনটা মোটামুটি একই থাকবে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার সময় বিশেষভাবে কোন দিকটি আপনি নিজস্ব ভাবকল্পনার রেখা দিয়ে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন?

—পুরুষ মানুষের পুরুষালী ঢং-এ গায়নশৈলীর দিকটি—দৃপ্তকণ্ঠে বললেন আত্মভোলা শিল্পী।

—আর একটু বিশদভাবে বলুন—

—গান শুরু করবার সময় থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরুদ্ধে মেয়েলীপনার অভিযোগ অনেকের কাছেই শুনে আসছি।

—কারণ কী?

চিন্তা করে দেখলাম আগেকার দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীতে মূলত মহিলা শিল্পীরই প্রাধান্য ছিল। কবি গা' লিখলেই আশ-পাশের স্নেহের পাত্রীদের শিখিয়ে নিতেন, আর তাঁরাই হয়ে উঠতেন কবির গানের জীবন্ত স্বরলিপি। তারই ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম যুগে এক মহিলা শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে ওঠে এবং তাঁদের গাওয়া গানগুলিই সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে। (দিনেন্দ্রনাথ ছাড়া আর পুরুষকণ্ঠী গাইয়ে কে ছিলেন?)

—এর পর পুরুষরা যখন গাইতে শুরু করলেন—অজান্তেই এই পদ্ধতি অনুসরণের ফলে তাঁদের পরিবেশনায় ওজসবর্জিত এক মেয়েলী গায়ন রীতি চালু হয়ে গেল। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গিয়ে একটা পুরুষালী গায়কীর অভাব আমাকে বড় পীড়া দিত।

—কিন্তু জর্জদার গান? তাঁর গানের পৌরুষদীপ্ত ওজস তো তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনাকে ছাপিয়েও নিজের স্থান করে নিয়েছিল। আর তিনি আপনার পূর্বসূরী। তাহলে পুরুষালী গায়কী ছিল না বলেছেন কেন? শিল্পীর আবেগে বাধা দিয়েই প্রশ্ন করি।

জর্জদার গানে masculinity নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তখন কোলকাতার রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা অনুসরণ করলেই দেখা যেত জর্জদার ছাত্ররা জর্জদার মত আর সুচিত্রাদির ছাত্রছাত্রীরা সুচিত্রাদির মত করে গাইবার চেষ্টা করেছেন। আর জর্জদা তাঁর কণ্ঠ ও মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী বেছে নিতেন এমনই গান যা তাঁর তেজী কণ্ঠে মানায়। কিন্তু 'রূপে তোমায় ভোলাব না' অথবা 'সার্থক জনম আমার' ধরনের গান জর্জদা গাইতেন না। আমার প্রশ্ন হলো—তা কেন হবে? পুরুষ শিল্পীকেও সব গান নিশ্চই গাইতে হবে কোনো গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে সীমিত না রেখে। তবে তার অ্যাপ্রোচ হবে আলাদা ধরনের। পুরুষ মানুষরাও কি ভালবাসতে অথবা সেন্টিমেন্টাল হতে পারেন না? তবে তাঁদের আবেগের প্রকাশ নিশ্চয় মহিলাদের চেয়ে স্বতন্ত্রধর্মী।

—কিন্তু জর্জদার 'দ্বারে কেন দিলে নাড়া'?

—সে অনেক পরের ঘটনা।

—আপনার সব রেকর্ডই ত হিন্দুস্থান কোম্পানির, না?

—মেগাফোনের ফাল্গুনী গীতিনাট্যে অন্ধ বাউলের ভূমিকাতেও গান ছিল। ঐ কোম্পানিতেই ছিল 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা', 'তোমরা যা বল তাই বল' ও 'বল গোলাপ মোরে'—বাদ বাকী সবই হিন্দুস্থানের।

—কত রেকর্ড? আন্দাজ?

—একক সঙ্গীত ৭৮ আর পি এম এ মাত্র চারখানি—'সহে না যাতনা', 'আমার পরাণ যাহা চায়', 'আপনহারা মাতোয়ারা', 'আমরা দূরে আকাশের', 'তোমার-শেষের গানের' ও 'আহা আজি এ বসন্তে', 'আমার সকল রসের ধারা' ও 'অসীম ধন ত আছে।' এম এল এইচ-এ 'ঐ মধুর মুখ জাগে' ও 'তুমি কোন কাননের ফুল', ৪৫ আর পি এম এ 'কথা কোসনে' ও 'ভুল করেছিনু ভুল ভেঙেছে', 'আজ তোমায় দেখতে এলেম' ও 'বল গোলাপ মোরে বল।' এ ছাড়া সাহানা দেবী, অমিতা সেন, অরবিন্দ বিশ্বাসের সঙ্গে এবং অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুশীল মল্লিকের সঙ্গে কোরাস গানের রেকর্ড আছে। প্রথমের দিকে অবশ্য গ্রামফোন কোম্পানিতে জর্জদা ও হেমন্তবাবুর সঙ্গে কণ্ঠদান করেছি।

আর একটি কথা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোন দিকটি আপনাকে টানে ?

দেখো রবীন্দ্রসঙ্গীতের যুগ সত্যি করে শুরু হলো রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর। তাঁর ভাবসঙ্গীত, প্রেমসঙ্গীত, ভক্তিগীতি অন্যান্য সকলের মত আমাকেও টানে। তবে বলব—তাঁর শেষের দিকের গানের অ্যাবসট্রাকট রূপের ওপরই আমি আকর্ষণ বোধ করি বেশী। যেমন 'এসেছিলে তবু আস নাই' গানটি। এখানে শব্দগুলো যেন রং হয়ে উঠে একটা ছবির সৃষ্টি করেছে। এই ব্যঞ্জনার দূরাভাসই যেন আমায় পাগল করে দেয়।

—রবীন্দ্রসঙ্গীত ও শিল্পী সম্বন্ধে আপনার অভিমত ?

—যথার্থ জনগণের গান বলতে যা হওয়া উচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতে সে গুণ কতটা আছে তা সন্দেহাতীত নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ শুধু গীতিকার অথবা সুরকারই নন। অনেক কিছু জড়িয়েই তিনি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ব্যক্তিত্বও তাঁর গানের বহুল প্রচারের সহায়ক।

আপন চাহিদায় শিল্পী হয়ত শ্রোতা তৈরী করে নিতে পারেন, আবার শিল্পীর কাছে বড় কিছু আদায় করে নিতে শ্রোতার দিক থেকেও বিদগ্ধ সংস্কৃতি ও জাগ্রত চিন্তাশক্তি দরকার। সব সময়ই আমাদের কাব্যসঙ্গীতের ধারাকে কোনো-না-কোনো রচয়িতা প্রবহমান রেখেছেন যাঁদের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য ঐতিহ্যানুসরণ প্রয়োজনীয় হলেও শিল্পের ক্ষেত্রে গতিহীনতা মানেই মৃত্যু। রবীন্দ্রনাথ পরম ও চরম সত্য, একথা আপাতত সত্য হলেও মোটেই আশ্বাসের নয়।

সুতরাং বর্তমান ও অনাগত রচয়িতারা আবার পথ কেটে আমাদের আবহমান সঙ্গীতের ধারাকে নবীন ও সমৃদ্ধতর করে এগিয়ে নিয়ে চলুন রসের মহাসমুদ্রের দিকে—আমার এই একমাত্র প্রার্থনা। এই প্রসঙ্গেই বলি, শুধুমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতকে আশ্রয় করে আজকের দিনে এতগুলো শিল্পী কত স্বচ্ছলভাবে বেঁচে আছে সেদিকটাও ভাববার মত। পৃথিবীর আর কোনো দেশে একটি মাত্র কম্পোজারকে অবলম্বন করে এত সংখ্যক শিল্পীর এমন স্বচ্ছলতার নজীর নেই।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে এখনকার মহিলা শিল্পীদের মধ্যে কাকে আপনি শ্রেষ্ঠ স্থান দেবেন ? রাগাশ্রয়ী গানের স্বরশুদ্ধতা ও আকুল দ্যোতনায় রাজেশ্বরীদি ।

সুরের সূক্ষ্মকার্যে মোহরদি (কণিকা), ঋজু বলিষ্ঠতার পরিপ্রেক্ষিতে সুচিত্রাদি । আপন কণ্ঠের প্রকাশভঙ্গীর ছন্দেই এঁদের ব্যক্তিত্বচিহ্নিত গায়কী গড়ে উঠেছে ।

---এই হলেন আজকের জনপ্রিয় প্রধানদের অন্যতম শিল্পী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ।

অশোকবাবুর মতো রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে হলে যেমন প্রতিটি গানের অন্তরালে লুকোন কবিমানসটিকে জানা দরকার, ঠিক তেমনই অশোকবাবুর শিল্পকৃতীর সঙ্গে শিল্পী মনটির প্রতি যথাযোগ্য আলোকপাত না করলে এ অধ্যায় অসম্পূর্ণ থেকে যায় ।

এই প্রসঙ্গে একটা অপ্রিয় সত্য না বলে পারছি না । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় শিল্পীরা তাঁদের শিল্পের ক্ষেত্রে যতখানি শিল্পী সেই পরিসরের বাইরে এলে ঠিক ততখানিই অশিল্পী । সেখানে অতিহিসেবী বৈষয়িক এবং অতিসংকীর্ণ রাজনীতিকদের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ তফাৎ নেই ।

কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রমী শিল্পী যে ক'জন আছেন অশোকবাবু তাঁদেরই একজন । জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই তিনি শিল্পী এবং আত্মভোলা ।

ঋতু গুহঠাকুরতা

সৌন্দর্যচেতনা রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যেকার সবচেয়ে বড় কথা। এ বোধটা জন্মালে গায়কী আপনা থেকেই গড়ে ওঠে।

তরুণ শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে ঋতু গুহঠাকুরতা শুধু নাম নন, নিঃসন্দেহে এক ফেনোমেনান। অলস অন্যমনে গানের আসরে বসে থাকলেও ঋতুর গানের সময় চমকে উঠতে হবেই। এক মহান শিল্পীর ভাষায়, ঋতুর কণ্ঠ 'সর্বালংকার-ভূষিতা'। উচ্চগামী, মুক্তকণ্ঠ, প্রতিটি মীড়ের ঝলমলে বাহার, উচ্চারণ—সবার ওপর ভাব। এই ত কিছুদিন আগেই রবীন্দ্রসদনে ওঁদের ভাইবোনের একক ও দ্বৈত আসরে ঋতুর কণ্ঠে শোনা গেল কতরকমের গান—'সংশয়-তিমির-মাঝে', 'দেখা যদি দিলে', 'দিন ফুরালো', 'যা হারিয়ে চায়', 'খেলার সাথী', 'মোর কি বেদনা' এমনই আরও কত গানে, ভাব থেকে ভাবান্তরের শ্রোতাদের মনকে নিয়ে গেছে কি অনায়াস দক্ষতায়। 'সংশয়-তিমির মাঝে', (১৮৮৪) থেকে 'বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী'র (১৯৩১) দূরত্ব অনেক সময়, ভাব উভয় বিচারেই। কিন্তু যাঁরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলেন তাদের মুগ্ধতায় এতটুকুও ছেদ পড়েনি, লাগেনি কোনো হেঁচকা টানের চমক। এর মূলে রয়েছে শিল্পীর যথার্থ শিল্পবোধ, পরিণত মনের নিবিড় অনুভব। জন্মগত শিল্পীসম্পদ এবং পরিবেশগত শিক্ষার বিস্তৃত পটভূমিকা—এই দুয়েরই আশ্চর্য যোগাযোগ ঋতুর জীবনে ঘটেছে। ঋতুর জীবনবিধাতা যেন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসেছিলেন ওঁকে শিল্পী বানিয়ে তবে ছাড়বেন।

অসাধারণ কণ্ঠ নিয়েই তিনি জন্মেছেন। সে না হয় অনেকেই জন্মান। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশের নির্মম আঘাতে অনেক সময় কণ্ঠ প্রতিভা সবেরই ভরাডুবি হয়। স্বপ্ন দেখা মনের গঙ্গাযাত্রা হতে সময় লাগে না এমন উদাহরণও বিরল নয়। সৌভাগ্যক্রমে ঋতুর জীবনে তার উল্টোটাই ঘটেছে এবং তারই ফলশ্রুতি আজকের ঋতু গুহঠাকুরতা।

বলতে গেলে গানের ঘরেই তাঁর জন্ম, চেতনা ও চিত্তবিকাশ। বাবা নির্মল গুহঠাকুরতা ও কাকা শুভ গুহঠাকুরতা সঙ্গীতপ্রাণ, গুণগ্রাহী। বাড়িতে হরদম যাওয়া-আসা ছিলো সঙ্গীতরসিক ও শিল্পীদের। সঙ্গীতমহলের জনপ্রিয় শচীনকর্তা, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, অনুপম ঘটক, সায়গল—সকলেরই একটা প্রিয় আড্ডা ছিলো নির্মল গুহঠাকুরতার বাড়ি। সেখানে আচমকাই গানের আসর বসে যেতো। বড় শিল্পীরা ত গাইতেনই, ছোটর দলও বাদ যেতো না। গানের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে নানারকম রান্নারও হুল্লোড় লেগে যেতো।

আমাদের বাড়ি ভর্তি ঠাসা রেকর্ড—ক্ল্যাসিক্যাল ওস্তাদী থেকে শুরু করে, কনক বিশ্বাস, পঙ্কজ মল্লিক, রামপ্রসাদী, অতুলপ্রসাদ, নজরুল আরও কত গান। সব সময়ই দেখতাম হয় কাকা শৈলজাদার কাছে গান তুলছেন নয় ত কাউকে শেখাচ্ছেন। যার খেয়াল হলো কোনো রেকর্ডের ডালা খুলে রেকর্ড বাজাতে শুরু করলো। কোনো রেকর্ডের গান শেষ হয়ে যাবার পর বাবা হয়ত হঠাৎ বললেন—গা ত গানটা। দেখি কেমন শুনেছিস! গাইতাম। ভালো হলে উচ্ছ্বসিত বাহবায় বাড়ি মাথায় করে তুলতেন। আবার ঠিকমত না হলে বলতেন, আবার শোন, শুনে ঠিকমত শোনা—সে যে কোনো গানই হোক, ক্ল্যাসিক্যাল, মডার্ন বলে কোনো বাছবিচার নেই। একবার এইরকম করেই শুনিয়েছিলাম 'এবার আমি ভালো ভেবেছি'। শুনে বাবা এত খুশী হয়েছিলেন যে সেইদিন সন্ধ্যাবেলাতেই শচীনকর্তা, ভীষ্মবাবু আরও কে কে মনে নেই আসতে না আসতেই বললেন, শুনুন আমার মেয়ে কি সুন্দর গাইছে—বলে সেই রামপ্রসাদী গানটিই গাইতে বললেন।

বাবা সকলকে খাওয়াতে খুব ভালোবাসতেন। হঠাৎ সোরগোল তুললেন—আজ ডাকরোস্ট হবে, সবাইকে ডাকা হোক। সন্ধ্যে থেকে সবার আসা শুরু হলো। আসর জম জমাট। অভ্যাগতদের মধ্যে কেউ হয়ত বললেন, এত তাড়াতাড়ি খাওয়া হবে নাকি? সবে ত সন্ধ্যে।

তাহলে একটু গানবাজনা হোক? বাবার চোখে যেন আলো জ্বলে উঠতো।

তারপর গানবাজনার আসর চলতে চলতে সন্ধ্যে কখন রাতদুপুরে গড়াতো সে হুঁশ কারো থাকতো না। আমাদের বাড়িতে তখন শৈলজাদা খুব আসতেন। তিনি ছিলেন আমাদের ছোটদের খেলার সাথী। দুপুরে হয়তো ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না শৈলজাদা বলতেন, চলো আমরা খেলিগে। শৈলজাদা রোগী, আমি ডাক্তার, স্নিগ্ধা (ঘোষ) কম্পাউন্ডার। স্নিগ্ধা আমার পিসতুতো বোন জানো ত? শৈলজাদা রোগী সেজেই গান গাইতে শুরু করতেন। আমাদের বলতেন, ডাক্তারবাবু কম্পাউন্ডারবাবু আপনারাও যদি আমার সঙ্গে গান তাহলে আমার অসুখ এক্ষুনি সেরে যায়।

শুরু হতো আমাদের কোরাস। এমনি করে কত গান যে শিখেছি।

আমরা হয়তো রাত্রে শুতে যাচ্ছি দেখলাম মোহরদি ছাদে শুয়ে গুনগুন করে কাকিমাকে গান তোলাচ্ছেন। আর ঘুমানো হলো না। ঐখানে বসে মুগ্ধ হয়ে শুনতে বসে যেতাম মোহরদির সেই গুনগুন করে গাওয়া গান। চাঁদের আলো, নিঝুম রাত, মোহরদির মধুর কণ্ঠ, সব মিলিয়ে সেই মায়াময় পরিবেশ আজও ভুলতে পারি নি।

তাছাড়া বড় হয়ে গান শেখার সঙ্গে সঙ্গে বাবা ও কাকার—শুভ গুহঠাকুরতার সঙ্গে রাত জেগে কনফারেন্স শোনাও শুরু হয়ে গিয়েছিলো। যতখানি শিখেছি তারচেয়ে অনেক বেশি শুনেছি, যে-সে লোকের গান নয়। সেরা শিল্পীদের গানবাজনা। বিলায়েত খাঁ সাহেবও আমাদের বাড়িতে বাজিয়েছেন। অবিরাম

ভালো গানবাজনা শুনে শুনে কান তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। আর কানের চেয়ে বেশী তৈরি হয়েছিলো বোধহয় মন। নিজেই নিজের সমালোচক হয়ে বসেছিলাম ভালো করে গান শেখবার আগেই। গাইতে গেলে অজ্ঞাতেই ঝোঁক চাপতো কি করে প্রতিটি শ্রুতি, তান ঠিক ঐভাবেই স্পষ্ট সুন্দর হয়ে উঠবে। কিছুতেই যেন মনের মত হতো না। সব সময় মনটা খুঁতখুঁত করতো।

শিক্ষা শুরু হয়েছিলো কি রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়েই ?

ঠিক তা হয়নি। সবচেয়ে মজার কথা কি জানো? আমি গীতবিতানে (তখন কাকাও ওখানে ছিলেন) প্রথম শিখতে আরম্ভ করেছিলাম নাচ। গান নয় কিন্তু। অজিতদার কাছে শিখতাম। সেদিন অজিতদার সঙ্গে দেখা হতে হেসে বললেন, ঋতু, নাচটা একেবারেই ছেড়ে দিলে ? ভাবতে এত মজা লাগে! ঋতু একটু থামেন।

এটা নিছক মজার ব্যাপার নাও হতে পারে। হয়তো নাচ দিয়ে সঙ্গীত শিক্ষা শুরু হয়েছিলো বলেই তোমার লয়টা এত ভালো আর তোমার গানে নাচের মতই একটা প্রত্যক্ষ আবেদন শুরু হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিক্ষা শুরু হলো কবে থেকে ?

কোনোরকম শিক্ষা শুরু হবার আগেই সব গান শুনে শুনে গাওয়ার এবং সকলকে শোনানার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো সে কথা ত আগেই বলেছি। মনে আছে ১৯৫২তেই বোধহয় কাকা ছাদে বসে 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' গানটি শিখিয়েছিলেন। কাকা পিয়ানো বাজাতেন, আমি গাইতাম। তখনও ঐ গানটির খবর কেউ জানতেন না। মোহরদির রেকর্ডও তখন হয়নি। কাকাই শান্তিনিকেতনে গিয়ে ধুলোমাখা, রোল করে পড়ে থাকা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও আনন্দসঙ্গীত থেকে 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' ও 'জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে' গান দুটি আবিষ্কার করেছিলেন। পরে মোহরদি ঐ গান দুটি রেকর্ড করে কি দারুণ হিটসং করে তুলেছেন সে ত জানই ?

যাইহোক, দক্ষিণীর একটা ফাংশনে আমি ঐ গানটি গেয়েছিলাম। এত অ্যাপ্রিসিয়েশন পাব ভাবিনি। মনে আছে কাগজে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলো। বাবা সেই কাটিং রেখে দিয়েছিলেন।

শিক্ষার পর্ব শুরু দক্ষিণীতেই। ওখানে তখন রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাতেন সুনীল রায়, কমলা বসু, সুচিত্রাদি। ছাদে স্টেজ ছিলো। সেখানে বাল্মীকি প্রতিভা অভিনয় হয়েছিলো। দাদা (অরূপ গুহঠাকুরতা) বাল্মীকি হয়েছিলেন। কাকা দাদাকে বাল্মীকির গান শেখাতেন। শুনে শুনে সেইসব গান আমাদেরও শেখা হয়ে যেতো। পাশ্চাত্য সুরের গান, রামপ্রসাদী, ভক্তিগীতি, গানে গানে সংলাপ—এতগুলি বস্তু মিশে গানের মধ্যের নাটকীয় রস সম্বন্ধে মনকে যেন সচেতন করে তুলেছিলো। যখন তখন আপনমনে 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি' গাইতে গাইতে মনের মধ্যে কেমন একটা বিচিত্র ভাব জেগে উঠতো। এ গানে প্রাণকে মাতিয়ে তোলার ছন্দ আছে অথচ তার মধ্যে একটা বেশ গাম্ভীর্যও আছে। ঠিক যেন রণদামামা বাজার ছন্দ। বুকের রক্ত নেচে ওঠে।

কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতাম বলে শুধু তারই মধ্যে কেন্দ্রীভূত থাকতাম না। এক সঙ্গে গীতভানুতেও (দক্ষিণীর ক্ল্যাসিক্যাল গানের ডিপার্টমেন্ট) রাগ সঙ্গীতের ক্লাশ করতাম। গীতভানুতে তখন শেখাতেন গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণামোহন ঠাকুর, সুনীলবাবু। পরীক্ষা নিতেন সুরেশ চক্রবর্তী। গোপালদা বারবার বলতেন, ঋতু তোমার গলা ক্ল্যাসিক্যাল গানের। তুমি এতেই মন দাও।

ও কথাটা ত আমিও সব সময় বলে থাকি আর আমার মনে হয় সবাই আপনার সম্বন্ধে সেই কথাই ভাবেন। না হলে আসরে আপনি গাইতে বসলেই 'দিন ফুরালো', 'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে', 'কে বসিলে আজি' গাইবার অনুরোধ আসে কেন ?

হয়ত রেকর্ডে আমার ঐ গানগুলির সঙ্গেই তাঁরা পরিচিত বলে।

রেকর্ড করবার সময় ঐ গানগুলির কথাইবা আপনার মনে এলো কেমন করে ?

ঐ ধরনের গান আসরে গেয়ে অ্যাপ্রিসিয়েশন পেয়েছি বলে।

তাহলে ঘুরেফিরে কথাটা দাঁড়াচ্ছে ঐ একটি জায়গাতেই—সবরকম গান জানলেও আপনার কাছে সবাই ক্ল্যাসিক্যাল ঢঙের গানই শুনতে চান কারণ আপনার গলায় ঐ ধরনের গানের বাহারই খোলে ভালো।

সত্যি। ক্ল্যাসিকাল গান আমার খুব ভালো লাগে। কি অফুরন্ত সম্ভার ! ছোটোবেলায় কথা হয়েছিলো ভীষ্মদেববাবুর কাছে আমি গান শিখব ! উনিও সাগ্রহেই রাজী হয়েছিলেন। অসুস্থ হয়ে না পড়লে কি হতো বলা যায় না।

আর রবীন্দ্রসঙ্গীত ?

ভালো নিশ্চয়ই। নাহলে ঐ নিয়ে আছি কি করে ?

কোনটা বেশী আপনার মনে হয় ? ক্ল্যাসিক্যাল না রবীন্দ্রসঙ্গীত ?

কি জানি ! ঠিক বলতে পারব না। দুটোর আকর্ষণ দু রকমের—

বাইরে গান গাওয়া শুরু হলো কিভাবে ?

প্রথমে বাড়িতে কোনো বড় শিল্পী বা আত্মীয়স্বজন, কেউ এলেই বাবা গান গাইতে বলতেন সে ত আগেই বলেছি। এমনই করে সকলের সামনে গাইতে গাইতে অপরিচিত লোকের সামনে গাইবার জড়তা, কুণ্ঠা একেবারেই কেটে গিয়েছিলো। সে সময়টাকে স্টেজ ফ্রি হওয়ার রেওয়াজ বলা যায়।

এছাড়া ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৯ সাল অবধি দক্ষিণীর প্রতিটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান রেডিওতে রিলে করা হতো। মনে আছে আমার তখন তের বছর বয়স। দক্ষিণীরই কনফারেন্সে গেয়েছিলাম 'আমরা চাষ করি আনন্দে'। অনেকেই মন্তব্য করেছিলেন সে গান নাকি খুব প্রাণবন্ত হয়েছিলো।

দক্ষিণীর প্রথম কনফারেন্সে আমি নেচেছিলাম। 'কালমৃগয়া' নৃত্যনাট্য হয়েছিলো। স্নিগ্ধা হয়েছিলো বালক আমি বালিকা। দাদা (অরূপ গুহঠাকুরতা) দশরথ সেজেছিলেন।

১৯৫৭তে প্রথম রেডিওতে গেয়েছিলাম 'এ মোহ আবরণ', 'ভুল কোরোনা

গো।' দুপুরবেলার অধিবেশনে।

এখন গ্রামোফোন কোম্পানির আর্টিস্ট হলেও আমার প্রথম রেকর্ড বেরিয়েছিলো মেগাফোনের লেবেলে, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে। কাকার ট্রেনিং-এ সেই প্রথম রেকর্ডের গান দুটি ছিলো 'বাজেরে বাঁশরী' ও 'আজি এ নিরালা কুঞ্জে।'

ফাল্গুনী নাটকেও গেয়েছি বেশ কয়েকটি গান।

পি. কে. সেনের আমলেই গ্রামোফোন কোম্পানিতে এলাম। ভালো ভালো সব গানের রেকর্ড হয়েছে এখানেই। বর্ষামঙ্গল এল-পিতে—'আজ তোমায় আবার চাই শুনাবারে' ও 'বাজে করুণ সুরে' 'টুয়েলভ্ জেমস্ ফ্রম টেগোর'-এ (এল-পি) 'কাল রাতের বেলা গান এলো মোর' বাকিগুলোর নাম সব মনে পড়ছে না। কয়েকটার কথা বলতে পারি। যেমন 'এ কি লাবণ্যে পূর্ণ', 'মম দুঃখের সাধন', 'মোর পথিকেরে বুঝি', 'তোমার প্রেমে ধন্য করো যারে', 'কে বসিলে আজি', 'চরণধ্বনি শুনি', 'তুমি কোন কাননের ফুল', 'ওলো সই ওলো সই', 'আমারেও করো মার্জনা', 'আমার নিখিল ভুবন', 'শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ', 'রাতে রাতে আলোর শিখা'। এবারের চারটি গানের কথা তো জানোই।

আর কি? আদর্শ শিক্ষক? এদিক থেকে কাকার (শুভ গুহঠাকুরতা) জোড়া নেই। যেমন উদার দৃষ্টিভঙ্গি তেমনি শিক্ষাপদ্ধতি। রবীন্দ্রসঙ্গীতেরই শুধু নয় সকল সঙ্গীতেরই গভীরে প্রবেশ করেছেন যেন আপন অধিকারেই। ক্লাসিক্যাল কিংবা অন্যান্য সঙ্গীতের ধারা সম্বন্ধেও তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা আছে বলেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বতন্ত্র স্বরূপটি তিনি এমন করে নিজে হৃদয়ঙ্গম করেছেন এবং শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে পেঁৗছে দিতে পেরেছেন। শুধু আমি নয়, কাকার কাছে একবারই যে শিখেছে এই শিক্ষাকেই সে মনপ্রাণ দিয়ে ভালো বেসেছে। যে পরিচ্ছন্ন পরিবেশনার জন্য দক্ষিণীর অনুষ্ঠান বিদগ্ধ সমাজে এমন জনপ্রিয়, তার মূলেও আছে কাকার অন্তর্দৃষ্টি। অনুষ্ঠানগুলি এমন করে সাজানো হয় যাতে সমবেত কণ্ঠের গানেও ধ্বনিবৈশিষ্ট্য, শ্রুতিমাধুর্য এবং গানের বিষয়বস্তুর স্বচ্ছতা অনাহত থাকে। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো প্রতিটি অনুষ্ঠানেই একজন দু'জন করে নতুন শিল্পীর গান দেওয়া হয় যাতে সত্যিকারের প্রতিভা থাকলে রসিক সমাজের তাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

এইভাবেই আমরা বর্তমান বক্তা এবং রণোকেও পেয়েছি।

হাসি-ঝলমল মুখে ঋতু বলে চলেন—দক্ষিণীতে শিখেছি দশ কি বারো বছর। কিন্তু সে শিক্ষার চর্চা সাধনা আজও শেষ হয়নি। বোধহয় সারা-জীবনেও হবে না। শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত কেন, যে কোনো সঙ্গীতবিদ্যাই বোধহয় তাই। চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তার নতুন নতুন রূপ আবিষ্কার করবার রোমাঞ্চ লাগে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে সতেরোটি ধারার প্রবাহ এবং রবীন্দ্র-ক্রমবিকাশের তিনটি যুগকে কাকাই প্রথম অনুভব করেছিলেন। এবং এই অনুভূতিটি

আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করাতে চেয়েছিলেন। ঐ উপলব্ধির আলোতেই কবির গানকে চেনবার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি।

শিশুকাল থেকে আজ অবধি সঙ্গীত সাধনায় কোনো ছেদ পড়েনি?

বিয়ের পর চার পাঁচ বছর আমার নিজের দিক থেকেই একটা শৈথিল্য এসে পড়েছিলো। রেডিওতে গাইবার তাগিদ না থাকলে বোধহয় গান গাওয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই থাকতো না!

কেন? শ্বশুরবাড়ির এ বিষয়ে কোনো উৎসাহ ছিলো না?

বরং ঠিক তার উল্টো। গানকে ওঁরা সত্যি করে ভালোবাসেন বলেই গান আমার জীবনের সঙ্গে আজও এমন করে জড়িয়ে আছে।

সেইটেই স্বাভাবিক। কারণ, বুদ্ধদেববাবু (গুহ) বুদ্ধিজীবী, সাহিত্য-সেবী। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অস্বীকার করবার মত বে-দরদী মানুষ তিনি নন।

বুদ্ধদেববাবু গানও ভালো গাইতেন এবং এখনও ভালো গান। উনিও দক্ষিণীতে অনেকদিন শিখেছেন। তবে নিয়মিতভাবে চর্চা করবার ধাত ওঁর নয়।

দক্ষিণীতে কি দুজনেই সতীর্থরূপে শিখেছিলেন?

হ্যাঁ, ১৯৬২ সালে দক্ষিণীর ছাত্র ছিলেন। আমিও তখন শিখতাম।

তারপরের অধ্যায় সহজেই অনুমেয়। অতএব এ পর্বের বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

ঋতুর গানে আবেগ ছাড়াও যে বুদ্ধিমার্জিত বৈদগ্ধ্যের স্বাক্ষর মেলে, আমার ধারণা তার মূলে শুভদার শিক্ষা, পারিবারিক ঐতিহ্য ছাড়াও বুদ্ধদেববাবুর দৃষ্টিভঙ্গিরও বেশ বড় একটা অংশ আছে।

এখনকার রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিপুল উচ্ছ্বাস? একি বুদ্বুদ না সাগরের নিচের অতল গভীরতার সমধর্মী?

এককথায় এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। দেখো, ভারতীয় বিদ্যা গুরুমুখী। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, যথার্থ গুরুর শিক্ষা পেয়ে গানের ডিটেইলসে যাবার চেষ্টাটা আপনা থেকেই জন্মেছে। ভালো ভালো শিল্পীর অজস্র গান শুনে এ সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে নেবার সুযোগ পেয়েছি। তবু আমার গানে আমি খুশী নই। মনে পড়ে প্রথম যখন দক্ষিণীর ফাংশনে অথবা রেডিওতে গাইতাম, অনেক জায়গা থেকে চিঠিপত্র আসতো, অভিনন্দন জানিয়ে গানের তালিকা দিয়ে সেইসব গান গাইবার অনুরোধ জানিয়েও। সেসব চিঠি কাকা বা বাবাকে দেখাতাম। কিন্তু দেখাবার আগে ভয় করতো। ওঁরা যদি মনে করেন এইসব প্রশংসায় বিশ্বাস করে নিয়ে নিজের সম্বন্ধে মস্তবড় কোনো ধারণা নিয়ে বসে আছি? কিন্তু ঠিক এইভাবেই একদিন অনাদিদার (অনাদি দস্তিদার) চিঠি এসেছিলো, তাঁর আশীর্বাদ বয়ে নিয়ে। সে মুহূর্তটি আজও অবসর সময়ে মধুর আশ্বাসের মতই মনের নিভৃত-লোককে সরস করে তোলে।

আর আজ? প্রোগ্রামের পর বহু লোকের অকৃপণ অভিনন্দনে আনন্দ

নিশ্চয়ই হয়—নইলে গাইবই বা কেন? কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই মনে হয়, এঁদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ভদ্রতার খাতিরে ভালো বলতে হয় বলেই ভালো বলে গেলেন। কই, তেমন কিছু ভালো তো গাইনি! প্রথমেই তোমায় বলেছি, কান ও রুচি তৈরি হবার দরুন শুধু নিজেই নিজের সমালোচক বনে যাইনি। আমরা ভাইবোনেরা পরস্পর পরস্পরের ক্রিটিক। অনেক সময় গান গেয়ে মনে হয়েছে, সুর-তাল সবই ঠিক হয়েছে কিন্তু কিসের যেন একটা অভাব থেকে গেছে। যে একস্প্রেশনটি হওয়া উচিত ছিলো—হয়নি। হতে না পারার কারণ ঐ সময়ে মনটা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো। গানের পর বাড়িতে এসে আশিসদা (ডকুমেন্টারি ফিল্মের সুবিখ্যাত আশিস মুখোপাধ্যায়), রণো কিংবা বাপি যেই বলতে এলো আজ তোর গানটা—আমি ওদের বাধা দিয়েই বলে উঠি—থাক, আর বলতে হবে না। আমি জানি তোরা কি বলবি? এই এই কারণে গানটা তেমন উতরোয়নি। এই তো? সে-কথা আমি গাইবার সময়ই বুঝতে পেরেছি।

নিজের সম্বন্ধে এই বলিষ্ঠ, গঠনমূলক সমালোচনাও শিক্ষার একটা অংশ বলে আমি মনে করি। বাবা, কাকা, কাকিমা (রুবি গুহঠাকুরতা) সবাই-এর গান গাওয়ার এবং সকলের গান সম্বন্ধে মন্তব্য করবার অভ্যাস থাকার দরুন এ-শিক্ষাটা এতো সহজে আমাদের মধ্যে বর্তেছে।

কিন্তু এখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে দেখছি একটু শিখতে না শিখতেই জাহিরপনা ও হাততালি নেবার উৎসাহে নকল নাটকীয়তা সৃষ্টির নেশা অনেক অল্পবয়সী গাইয়েদেরও এমন করে পেয়ে বসেছে যে এ মোহ-আবরণ ছিন্ন করে মুক্ত দৃষ্টিতে নিজের যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। আর এ মূল্যায়ন করার যোগ্যতা অর্জন না করলে রবীন্দ্রসঙ্গীত কেন, কোনো সঙ্গীতেই স্থায়ী কোনো আবেদন সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। অথচ এঁরা অনেকেই সুকণ্ঠের অধিকারী। কাজেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের এ উচ্ছ্বাস স্থায়ী হবে কিনা সেটা নির্ভর করে এঁদের দায়িত্ব-জ্ঞানের ওপর।

বাইরে গাইবার জন্য ব্যস্ত না হয়ে নিজেকে তৈরি করার দিকে মন দিলে এঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই প্রবাহকে (১৯৬২-৬৭ অবধি যার গতি উত্তাল) অব্যাহত রাখতে পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

আপনি কোনোদিন বাইরে গাইবার জন্য ব্যস্ত হননি?

কোনোদিনও না। কারণ আমাদের কানের কাছে সবসময় মন্ত্র পড়ার মতই শেখানো হতো—আগে নিজেকে তৈরি করতে হবে, তারপর অপরকে শোনাবার প্রশ্ন। গাছের ঘন-পাতার আড়ালেই কুঁড়ির সাধনা চলে ফুলে ফোটার মহৎ পরিণতিতে পৌঁছবার। তারপর ফুলটির যখন পূর্ণ বিকাশ ঘটে, কাউকে খবর দিতে হয় না। গন্ধই তার ফোটার বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দেয়।

বাইরে গাওয়ার ব্যাপারে আমাদের অভিভাবকেরা বড়ই রক্ষণশীল ছিলেন। চট করে সব জায়গায় গাইতে দিতেন না। এবং তাঁদের এ শাসন আমরা শুধু

মেনেই নিইনি। ভালোবেসে মেনেছি। আর তার ফলে দেখেছি ভালোই হয়েছে। নিজের সম্বন্ধে সব দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজেকে না ঠকিয়ে, নিজের যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্বন্ধে ধারণা গড়ে নিতে হয়। নিজেকে যদি নিজে না ঠকাই, তাহলে পৃথিবীতে কঠোরতম সমালোচকও আমাদের দুঃখ দিতে পারবেন না। এইভাবে ভাবাটাই আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে আপনার আদর্শ কে ?

অফকোর্স মোহরদি। কণ্ঠ, মাধুর্য, গায়কী, গাইবার তন্ময়তা—সব দিক বিচার করেই।

আপনার গানে মোহরদির আদলটা বেশ পাওয়া যায়—কিন্তু তার সঙ্গে আপনার মৌলিকতাও আছে বলেই নকলনবীশ বলে মনে হয় না। যেমন হেমন্তদা কিংবা জর্জদার নকলনবীশরা অনেকদিন ধরে গাওয়া সত্ত্বেও মনে কোনো দাগ কাটতে পারছেন না, যদিও প্রথম দিকে এঁদের ওপর সকলের আশা ছিলো অনেক।

এটা আমাদের পরিবারগত সমালোচনার সম্মার্জনীর অবদান। মোহরদির গান খুব ভালো লেগেছে বলে অলক্ষ্যেই তাঁর প্রভাব গানে এসে পড়েছে। কিন্তু সচেতন মন নিয়ে যখন বিচার করে দেখেছি—কি কি কারণে মোহরদির গায়কী ওঁকেই মানায় এবং তার কতটা গ্রহণ করলে আমার স্ব-বিকাশের অনুকূল হবে, কতটা নয়—তখনই বুঝেছি ভালো লাগলেও কোথায় সীমারেখা টানা প্রয়োজন।

আপনার বৈশিষ্ট্য আপনার মতে কোথায় ?

প্রথমত আমি খোলা গলায় গাইবার পক্ষপাতী—তারপর স্কেলেরও একটা ব্যাপার আছে। এইগুলিকে বজায় না রাখলে আমার গান বলে চেনা যাবে না।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী নামে যে গোলমেলে কথাটা আছে সে সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য ?

গায়কী তৈরি হয় প্রতিটি শিল্পীর প্রকাশভঙ্গির নকশা অনুযায়ী। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার আগে বুঝে নিতে হবে তাঁর টেম্পারামেন্ট বা মেজাজ। আর সেই মেজাজ অনুযায়ী কোন শ্রুতিতে কতটা দাঁড়াতে হবে, কোন পর্দা ছুঁয়েই চলে যেতে হবে—এসব খুঁটিনাটি জিনিস নিয়ন্ত্রণ, এই দু'টি বস্তুর সমন্বয়েই গায়কী গড়ে ওঠে। অন্যভাবে বলা যায়, সৌন্দর্য চেতনাটাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যেকার সবচেয়ে বড় কথা। এই বোধ জন্মালে গায়কী আপনা থেকেই গড়ে ওঠে।

এই বোধটা যার সহজাত অবশ্যই পারে সে ফুল ফোটাতে।

কিন্তু সহজাত সৌন্দর্যচেতনা নিয়ে যারা জন্মায় না তাদের ক্ষেত্রে ?

ডিটেইলসে যাবার চেষ্টা করতে হবে গুরুর নির্দেশে। তখন মন্ত্রসিদ্ধর মতই গায়কী আপনা থেকে গড়ে ওঠে।

আজকাল অনেক সময় একটা অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়—অমুকের গান রাবীন্দ্রিক নয়, অতএব রবীন্দ্রসঙ্গীত তার গাওয়া উচিত নয়। এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত ?

এরকম কোনো গোঁড়া এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে আমার মন কোনোদিনও সায় দেয় না। যে ভালোবেসে কবির গান গাইবে তারই এ-গান গাইবার অধিকার আছে বলে আমি মনে করি। আন্তরিকতার একটা মূল্য নিশ্চয়ই আছে। একনিষ্ঠতার সঙ্গে গাইতে গাইতে একদিন-না-একদিন আপনা থেকেই উপলব্ধির দ্বার খুলে যায়।

উদার দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষপাতী হলেও একটি বিষয়ে আমি খুব স্পর্শকাতর। কিছু গান, কয়েকটি শিল্পী যা গেয়েছেন এবং গানের বক্তব্যকে এমন করে মরমে পৌঁছে দিয়েছেন যে, যতদিন তাঁদের গাইবার শক্তি থাকবে, এসব গান আর কারো গাওয়া উচিত নয় বলেই আমি মনে করি।

আশিসবাবু উপস্থিত ছিলেন এ আলোচনা-সভায়। তিনি ও ঋতু প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলেন, সেটা অনেকটা নির্ভর করে মনের কোন অবস্থায় কোন বিশেষ মুহূর্তে আপনি কোন শিল্পীর কণ্ঠে কোন গান শুনেছেন তার ওপরে। একবার কোনো এক শিশু সম্মেলনে 'মা' চিত্রটি রিলিজ হবার আগে পঙ্কজবাবু উদ্বোধনী ভাষণের বদলে একটি গান শুনিয়েছিলেন—'অয়ি ভুবনমনমোহিনী'। প্রথমেই এমন করে মা-আ-আ তানটি দিয়ে গান শুরু করলেন—প্রত্যেকটি শ্রোতার শরীর মন যেন আবেগে কেঁপে উঠেছিলো। সেই মুহূর্তের মহিমায় ঐ গানটার সঙ্গে পঙ্কজবাবুর নাম আমাদের মনে এমন করে একাকার হয়ে গেছে।

আর একবার বাবুলেরই একটা ফাংশানে হেমন্তবাবু ও মোহরদির দ্বৈত আসরের আগে মোহরদি একা গাইলেন 'দিনান্ত বেলায়'। খুব সহজ সুর। সোজা গান।—আশিসবাবু বিভোর হয়ে বলে চলেন, কিন্তু মোহরদি এমন করে গেয়েছিলেন যে, আমাদের সকলের চোখে জল এসে গিয়েছিলো। পাশে শুভ বসেছিলেন। দেখলাম উনিও ঢোক গিলছেন। কাজেই ওটা খানিকটা অ্যাসোসিয়েশনের ওপর নির্ভর করে না কি ?

যারই ওপর নির্ভর করুক আমার মত অনড়—

সবরকম গানকে ভালোবাসলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সবচেয়ে ভালোবাসলেন কি কারণে ?

রবীন্দ্রসঙ্গীতকেই সবচেয়ে ভালোবাসি এমন কথা ত বলিনি? রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কথা, সুর এবং তাদেরও অতিক্রম করা ভাবের জন্য মন টানে সত্যি। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল গানে ভাবের অন্তহীন বিস্তার ? এরই বা তুলনা কোথায় ? কি জানি, কোন গান যে সবচেয়ে ভালোবাসি ঠিক বুঝতে পারি না। ভীষ্মবাবু অসুস্থ হয়ে না পড়লে আমার গানের জীবন কোনদিকে মোড় নিতো বলা শক্ত।

এই অকপট স্বীকারোক্তিতে শিল্পীর মুক্ত ঋজু মনটি যেন নির্বোধ সরলতায়

গানেরই মত মন কেড়ে নিল।

মনে পড়ে গেলো দিলীপদার (রায়) একটি ইংরেজি কবিতার সুন্দর অনুবাদ। একটি মেয়ে ভালোবেসেছিলো পাহাড়, নদী, আকাশ, ফুল— সকলকেই। তাকে একদিন বলা হলো সবার মধ্যে থেকে একজনকেই বেছে নিতে। কিন্তু সে পারলো না। কারণ?

'স্বৈরাচারিণী হোতো চিতে,
যদি দিতো মালা
শুধু একটি গলে।'

ট্রুথফুলনেস টু ওয়ানস সেলফ—ঋতুর গানে এ কথা সত্যি হয়ে উঠেছে বলেই তাঁর গানকে জানার আনন্দ কোনোদিন ফুরাবে না।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার সব সময়ই মনে হয় আমায় আরো অনেক,
অনেক ভালো গাইতে হবে। অনেক দিতে হবে।
এখনও কিছুই দিতে পারিনি।

আধফোটা ফুলের মত তন্বী কিশোরীর দুই চোখে বিস্ময়ের আলো জ্বলে ওঠে যখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একমুঠো বাদাম-লজেন্সের সঙ্গে কুড়িটি টাকা তার হাতে দিয়ে বললেন, বুঝলি মোহর, আজ থেকে তুই গানের জন্য প্রতি মাসে কুড়ি টাকা করে জলপানি পাবি।

গানের জন্য? আমি? প্রতি মাসে কু-উ-ড়ি টাকা? সে যে অনেক? ওমা সো···ওর্তাতি? সো···ওর্তাতিতে যেন গানের মীড় বাজিয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করেই মা বাবাকে খবরটা দেবার জন্য উত্তরার দিকে নদীতরঙ্গের মত উচ্ছল ছন্দে ছুটে গিয়েছিল যে বিস্মিতা, তিনিই আজকের দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতিভাময়ী গায়িকা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি আজকের দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রধানা নায়িকাদের অন্যতম। জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির মধ্যগগনে উত্তীর্ণা; সঙ্গীতব্যক্তিত্বের পরিণত লগ্নে আত্মলীনা। কণ্ঠসৌন্দর্যের সঙ্গে স্বভাব ও রূপলাবণ্য যেন কবিতার ছন্দের মতই মিলেমিশে একাকার। কিন্তু শান্তিনিকেতনের নীল আকাশের নিচে উন্মুক্ত প্রান্তরে ছুটে-যাওয়া কলোচ্ছলার প্রতি মুহূর্তের বিস্ময়চকিত চমক-বিহ্বলতা? জীবনের পরিবর্তনের স্রোত তাকে বুঝি স্পর্শও করতে পারেনি।

সেদিনের সেই চঞ্চল সৌন্দর্য আজ স্থির, সংহত। স্বপ্নভরা দুটি চোখের গভীরতায় নীলাঞ্জন ছায়া। খোঁপার দুলে-ওঠা রজনীগন্ধার গুচ্ছ দেখে প্রশ্ন জাগে সৌন্দর্যময়ীর রূপকে অলঙ্কৃত করেছে ঐ রজনীগন্ধার গুচ্ছ, না রজনীগন্ধা সার্থক ঐ মুখকে সাজাতে পেরে?

সেবার রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে অলঙ্কারশিঞ্জিত কণ্ঠে 'নীলাঞ্জন ছায়া'র অপরূপ মায়ায় রবীন্দ্রসদন ভর্তি শ্রোতাদের বিবশ করে দিয়ে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বাইরে আসতেই সকলে যেই সমস্বরে বলে উঠলো কি অপূর্ব গানই না গাইলেন মোহরদি! সত্যিই ভোলা যায় না। একমুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে বিস্ময়-বিহ্বলা বলে ওঠেন, সো···ওর্তাতি? স্বপ্নছায়া বিছানো চোখের শ্যামল আলো, আর খোঁপায় দোলানো রজনীগন্ধাও যেন দুলে ওঠে ঐ কথারই নীরব প্রতিধ্বনির সঙ্গতে।

আসরে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান যতবার শুনেছি মন দুলে উঠেছে তাঁর কাশ্মীরী কাজের মত সূক্ষ্ম কারুকলাসমৃদ্ধ কণ্ঠের দ্যুতিময় ব্যঞ্জনায়।

মুগ্ধ হয়েছি তাঁর প্রকাশভঙ্গির ললিতমাধুর্যে, তারিফ করেছি শিক্ষামার্জিত কণ্ঠের ত্রি-সপ্তকে স্বচ্ছবিহার ও ধ্বনিমাধুর্যের। কিন্তু সে যেন টুকরো আলোর দ্যুতি। তারপর দুটি অনুষ্ঠানে (একটি অদ্রিজা মুখোপাধ্যায় আয়োজিত আসর, অন্যটি গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ডিং-এ)। হঠাৎ জ্বলে-ওঠা আন্তর সম্পদের দীপ্ত আলোয় শিল্পীকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম। প্রত্যক্ষ করলাম তাঁর কল্পনার মহত্ত্ব, অনুভবগাঢ়তার অন্তর্দৃষ্টি যার প্রাসাদে শিল্পীর সঙ্গে শ্রোতারাও প্রবেশাধিকার প্রায় এক আশ্চর্য উপলব্ধির রাজ্যে। নতুন করে দীক্ষালাভ করলাম যে সত্যে সেটি হচ্ছে এই যে, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিস্তীর্ণ পটভূমিকা থাকলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের মহিমা নির্ভর করে তার ভাবের ওপর।

টপ্পা অঙ্গের গানে কণিকা খ্যাতিনামা। কিন্তু সেদিনের নির্বাচিত গান-গুলি শুনে মনে হলো শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও কর্ণাটকী স্বরকম্পনের সঙ্গে কীর্তন বাউলের দুর্লভ সমন্বয়ই তাঁর গায়কীকে এমন সমৃদ্ধ করে তুলতে পেরেছে। 'হৃদয়-নন্দন বনে'-তে ধ্রুপদের অবিচল শান্তি ও অতি কোমল শ্রুতিতে তাঁর নিষ্পলক স্থায়িত্ব, 'বন্ধু রহো সাথে'-তে টপ্পার দানা ও ঢেউখেলানো রং-বাহারী মীড়, আবার 'হে মোর দেবতা'তে খেয়ালের ঢঙের তানের জমকালো আবেদনের পথ বেয়ে যখন 'বড় বিস্ময় লাগে'-তে থামলেন—শিল্পীর সঙ্গে শ্রোতাদের মনও যেন অতল প্রশান্তিতে সমাহিত হয়ে গেলো। আঙ্গিক ও সাহিত্যের মিলন-সুষমা, বিশুদ্ধ, সুর, মীড়, গমক ও মূর্ছনার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রগত সুরের যে মায়াপুরী সৃষ্টি হয়েছিলো—তা শুধু প্রতিভাময়ীরই অবদান নয়, সৃষ্টিময়ীর স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠ স্বাক্ষরদীপ্তি। গানের পর সমাগত গুণী শিল্পী সকলের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন কল্লোলের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন একরাশ বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে। সে দৃষ্টি যেন অবাক হয়ে বলছে, সো…ওতাতি? তাঁর গান স্বভাবের নারী-লাবণ্য (যাকে বলে উওমেনলি গ্রেস) থেকেই এই মাধুর্যঘন রূপ অজান্তেই আহরণ করে বসে আছে।

এ হেন শিল্পীসান্নিধ্যে একদিন সারাদিনের ছুটির আনন্দ যাপন করার একফাঁকে বললাম, এবার কিন্তু আমার প্রশ্ন করার পালা—ওমা সো…ওতাতি? যদিও ঐ কণ্ঠের মীড়ের ঝঙ্কার এই শ্রীহীন স্বরে ফুটবে না।

—কি সত্যি সন্ধ্যা? শিল্পীর তরফ থেকে প্রতি প্রশ্ন আসে।

—সেদিনের গানে সকলের চিত্তে এমন আলোড়ন তুলে দিলেন। আজ এতবড় একটা কাণ্ড করেও সবারই মুখর অভিনন্দনে আপনি অবাক? সত্যিই কি বোঝেন না রসিকচিত্তকে আপনি কিভাবে দুলিয়ে দিতে পারেন?

—সন্ধ্যা, গুরুদেবের নামে শপথ করে বলছি, জীবনে কোনো বড় পাওয়াকেই আমি কখনও প্রাপ্য বলে ভাবি না। ভাবি এ যেন মহাপ্রাপ্তি। যে কোনো শ্রোতার অ্যাপ্রিসিয়েসনে আমার মনে বিস্ময়ের দোলা লাগে। মনে হয় [illegible] আমি [illegible] পারি না। আমার পাবার যোগ্যতা নেই। এ আমার প্রতি [illegible]। আমার গান তোমাদের হৃদয়ে যদি পেঁছে থাকে

আমি ধন্য—সার্থক। বারবার তাঁকে প্রণাম জানিয়ে প্রশ্ন করি—সত্যিই কি আমি এত ভালো গেয়েছি? অশ্রু আভাসে ঝিকিয়ে ওঠে দুটি চোখ।

—সেদিন আপনার গান শুনে মনে হলো শিল্পী কৃতার্থ হয়ে ওঠেন তখনই যখন সে সঙ্গীত আমাদের প্রাণ-মন-অন্তরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাঁর পানে—যিনি গানের ও প্রাণের পরম প্রিয়তম। সৌন্দর্যবোধের পথ বেয়ে আত্মপ্রকাশ করলেও এ বোধের গভীরায়মান লগ্নে শিল্পীর অন্তর অজান্তেই অনুভব করে 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।'

একমুহূর্ত দ্বিধা করেই সংশয়মুক্ত কণ্ঠে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, আমার ভাবের প্রতিধ্বনি তোমার কথায় শুনতে পাচ্ছি বলেই স্বীকার করছি মাঝে মাঝে গান শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি যেন কোন অতলে তলিয়ে যাই…যার সঙ্গে প্রতিদিনের অতিচেনা জগৎটার কোনো সম্পর্ক নেই। তখন আমার সামনে কে বা কারা বসে আছেন সে খেয়াল থাকে না। মনে হয় আমার সকল বেদনা, দৈন্য, আনন্দ, গ্লানি তাঁরই চরণে নিবেদন করছি—যাঁর কাছে অযোগ্যতার জন্য লজ্জাবোধ নেই। মালিন্যের জন্য কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই।

—আজকের এই উদ্ধত অবিশ্বাসের যুগেও এমন ভক্তিছলছল ভাবে ডুবে আছেন কেমন করে?

—আমি গোঁড়া ব্রাহ্মণবংশের মেয়ে। আমার মা বাবা অথবা পরিবারের কেউ অর্থকে কোনোদিন বড় করে দেখেননি। ঈশ্বরে আত্মনিবেদনই ছিলো জীবনবেদ। এর সঙ্গে মিলেছিলো গুরুদেবের সান্নিধ্য ও আশ্রমের অনাড়ম্বর পরিবেশ।

—আমি অতি ক্ষুদ্র সন্ধ্যা। কিন্তু গুরুদেবের স্নেহ, আদর আমায় যেভাবে ঘিরে রেখেছিলো ঈশ্বরের করুণা ছাড়া তা পাওয়া সম্ভব নয়। গুরুদেব মহাকবি, মনীষী কি মহামানব এসব কথা ভাববার বোঝবার অথবা উপলব্ধি করবার মত বয়স তখন হয়নি। তাঁকে দেখতাম সঙ্গীর মত। সব সময় তিনি কাছে ডাকতেন। মজার মজার কথা বলতেন। বড়দের গান শেখাবার সময় এই ক্ষুদেটিকেও সঙ্গে নিয়ে বলতেন, তুইও গা। আমার নাম ছিলো অনিমা। সে নাম পাল্টে গুরুদেবই নাম দিলেন কণিকা।

—মনে আছে কারো কাছে এতটুকু বকুনি অথবা কড়া কথা শুনলেই গুরুদেবের কাছে কুটকুট করে নালিশ করতাম। নালিশের তালিকা থেকে রথীদাও বাদ যেতেন না। সামান্যতম অভিযোগও উনি অপরিসীম ধৈর্য সহকারে শুনতেন।

—কি নাটক, কি গীতিনাট্য সবেতেই বড়দের সঙ্গে আমাকেও উনি নেবেনই। শারদোৎসবে ওঁর সঙ্গে একসঙ্গে অভিনয় করেছি। উনি হয়েছিলেন ঠাকুর্দা। 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্য করাবার সময় আমায় দিয়ে গাওয়াবার জন্যই বিশেষ করে 'কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়' গানটি জুড়ে দিয়েছিলেন। ও গানটা 'তাসের দেশ'-এ ছিলো না।

—ওঁর সঙ্গে কোলকাতায় জোড়াসাঁকোতে যখন আসি সেই আমার প্রথম বাইরে আসা। কতজন কবির কাছে আসতেন। অবাক হয়ে দেখতাম।

—একবার 'ছায়া' সিনেমাতে শো হয়েছিলো। মঞ্চে গুরুদেব বসে। আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে গেয়েছিলাম 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে।' খুব ছোটো তখন। সেই প্রথম বাইরে গাওয়া। কিন্তু একটুও ভয় করিনি। গুরুদেব যে পাশে ছিলেন! আমার দিকে সব সময় ওঁর দৃষ্টি থাকত। প্রথম হিন্দুস্থানে যে রেকর্ড করেছিলাম, কি কারণে মনে নেই সেটা রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়। তার জন্য গুরুদেবের কি দুঃখ! পরেরবার নিয়ে গিয়ে বেশ কয়েকটি রেকর্ড করালেন। তারপর হেম সোমের আমলে গ্রামোফোন কোম্পানির আর্টিস্ট হলাম। জনপ্রিয় সকল গানেরই রেকর্ড হয়েছে এখানেই। পি. কে সেন ও এ. সি সেন রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও নাটকে রবীন্দ্র অনুরাগীদের ডালি ভরে দিয়েছেন।

—বোম্বেতেও গুরুদেব আমার সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা সরোজিনী নাইডুর বাড়িতে ছিলাম। খাবার টেবিলে ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, আরও বড় বড় নেতা। তারই ফাঁকে গুরুদেব আমায় পাশে নিয়ে বসেছেন। কাঁটা-চামঁচের দৌরাত্ম্যে খেতে পারছি না লক্ষ্য করে উনি বললেন, হাত দিয়েই খা।

—এমনই করে ঠিক মায়ের মতই সদাসজাগ স্নেহে আমায় আড়াল করে রাখতেন সকল ঝড়ঝাপটা থেকে। শেষের দিকে যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন আমায় সব সময় গান শোনাতে বলতেন। আমি ওঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গাইতাম। ১৯৪১ সালে আমি ও অরুন্ধতী (দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিলো) একসঙ্গেই ম্যাট্রিক পাশ করি। পাশের খবর দিতেই উনি হেসে বললেন, তবে আর কি, তুই ত আমার চেয়েও পণ্ডিত হয়ে গেলি।

—এমনই নিশ্চিন্ত নির্ভরতার পাল তুলে দিন কেটে যাচ্ছিলো। কোনো-দিন এর ব্যতিক্রম হবে ভাবতেই পারিনি। গুরুদেব থাকবেন না? এ-ও কি হতে পারে? কিন্তু তা-ও হলো। সে খবর যখন এলো মনে হলো পৃথিবীর সব আলো যেন এক ফুঁয়ে নিভে গেলো। শান্তিনিকেতনের আকাশ বাতাস প্রকৃতির বুকেও যেন এক বুকফাটা শূন্যতা কেঁদে উঠে বলেছিলো, সে নেই। উপচেপড়া চোখের জল মুছতে মুছতে কণিকা যেন আত্মগতভাবেই বলে ওঠেন, এই দুঃখ আজ কিছুতেই ভুলতে পারি না, আমি বড় হয়ে কেন তাঁকে পেলাম না? সেই বয়সে যে তাঁর ভাবনাকে উপলব্ধি করবার ক্ষমতাই হয়নি। বড় বলে ত তাঁকে কোনোদিন ভাবিনি? সব্বাই ওঁর কাছে হাতে-লেখা কবিতা, গান আদায় করে নিয়ে যেতো। আমি উঁকিঝুকি দিয়ে দেখতাম কখন একলা থাকেন। লোভ থাকত ওঁর কাছে রাখা বাদাম ভাজা, লজেন্স ভর্তি শিশির প্রতি। অন্তর্যামী সবই বুঝতেন। লিখতে লিখতে হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়লেই 'আয়' বলে দু'হাত বাদাম ও লজেন্সে ভরে দিতেন।

বেদনাভরা স্মৃতির রাজ্যে যেন থমকে দাঁড়ান স্মৃতিচারিণী।

আর অন্তর ভরে দিতেন যে অপার্থিব রসে তাই-ই বুঝি গহন-সঞ্চারী হয়ে

আপনার গানকে এমন সরস মাধুর্যে ভিজিয়ে দিয়েছে।

একটু ভেবে বললেন হতেও পারে। গানটা যেন খেলার মতই সহজ আনন্দের বস্তু হয়ে উঠেছিল। গুরুদেবের কাছে যখন-তখন গান শেখা ত ছিলই। তাছাড়া শান্তিনিকেতনে ছিল তখন পুরোপুরি আশ্রমের পরিবেশ। সকাল-বিকেল বর্ষা-গ্রীষ্মে প্রকৃতির মেজাজের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে গান শেখা আর গাওয়া। উন্মুক্ত প্রান্তরের এক দিকে আমরা গাইছি। অন্য দিক থেকে গানে গানে সাড়া দিয়ে উঠল আর এক দল। গানের ভাষাকে চেষ্টা করে বুঝতে হত না। স্বতঃস্ফূর্ত বর্ষাধারার মত, প্রকৃতির কোল আলো করে ফুটে ওঠা অজস্র ফুলের মতই সহজ ছন্দে গান নেচে উঠত কণ্ঠে, মনে প্রাণে।

এ তো গেলো গানের ভাবের দিক। কিন্তু কণ্ঠের ঈশ্বরদত্ত আওয়াজ ছাড়াও যে বস্তু আপনার গানকে বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করেছে তার মধ্যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিক্ষা ও অনুশীলনীর সুস্পষ্ট ছাপও রয়েছে।

—থাকা উচিত। কারণ ক্ল্যাসিক্যাল গান শেখাটা আমাদের কমপালসারি ছিল। হেমেন্দ্রলাল রায়, বি. ভি ওয়াজেলওয়ার, ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের কাছে ক্ল্যাসিক্যালের তালিম পেয়েছি। আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, সারা ভারতের বড় বড় গুণী, বীণকার, যন্ত্রী, ওস্তাদ, ভীমরাও শাস্ত্রী এঁরা ছিলেন শান্তি-নিকেতনে নিত্য অতিথি। এঁদের গান-বাজনা শুনেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে নিজের ভাবতে শিখেছিলাম! আমি আর অরুন্ধতী ম্যাট্রিক পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীত ভবনের কোর্স শেষ করি।

এ-আলোচনার কিছু দিন বাদেই রবীন্দ্রসদনেই একটি অনুষ্ঠানে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান বোধহয় কোনোদিনই ভুলতে পারব না।

বিধাতার দেওয়া সনদ নিয়ে আসেন যে শিল্পী তাঁর গান শোনবার সুযোগ পাওয়াটা ভাগ্যের কথা নিশ্চয়ই। কিন্তু এই সৌভাগ্য একটা সুখ ও বিস্ময়ের স্মৃতি হয়ে ওঠে যদি শিল্পীকে শোনা যায় ঠিক সেই মুহূর্তে যখন তিনি নিজেই আপন স্মৃতিতে বিভোর হয়ে যান।

ঠিক এই রকমই এক দুর্লভ মুহূর্তেই কণিকা সেদিন সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর গানে।

উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন, অল্পাশীর কপালে সুখ নেই। অপার আনন্দের অধিকারী শুধু সেই দুরাশী যে অপার ভূমার জন্য পারের নোঙর কাটে। এ উপলব্ধির আভাস মেলে তখনই যখন বহিরঙ্গ আনন্দের মধ্যে শিল্পী আর তেমন তৃপ্তি পান না। আর এই অতৃপ্তির পথ বেয়েই মেলে সেই বৈরাগ্যের প্রসাদ, যে বৈরাগ্য গুরুর মতই শিল্পীর অন্তরলোক উন্মুক্ত করে দেখিয়ে দেয় তার অভীপ্সা কোন পথে সার্থক হয়ে উঠতে পারে। কণিকা স্বধর্মে ভক্তিমতী। আর সেদিন অনুভবের দিব্যদৃষ্টির বরেই যেন তিনি পেঁছে গিয়েছিলেন তাঁরই চরণতলে যাঁর জন্য 'পথ চেয়ে যে কেটে গেলো' (সেদিনের শেষ গান)। সঞ্চারী অঙ্গে এরা সবাই কি-ই বলে গো-র কি-তে নিস্পৃহ বৈরাগ্যের সুর মীড়ের মোচড়ে মোচড়ে অন্তরার দিকে এগিয়ে যখন

সটান পঞ্চমে এসে দাঁড়াল মনে হয়েছিল পাওয়ার চরমে তিনি পেঁাছে গেলেন। আর শ্রোতাদের অন্তরকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন সেই নিস্তব্ধ লোকের দ্বারে, যেখানে গান হয়ে ওঠে প্রসাদ। সেদিন মনে হয়েছিল তাঁর গান যেন অন্তর-দেবতার পানে গহন-অভিসার। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, ফ্রম অ্যালোন টু দি অ্যালোন।

এই উপলব্ধির কথা তাঁকে বলেছিলাম—জন্মগত প্রতিভা, শিক্ষার সুযোগ, অনুকূল পরিবেশের অপূর্ব যোগাযোগ আপনার সঙ্গীত জীবনে ঘটেছে। কিন্তু আপনার গানে এ সবেরও উপরি-পাওনা হলো অনুভবের দিব্যদৃষ্টি। সেই দিনই কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কবুল করেছি রবীন্দ্রসঙ্গীতে কথার সৌন্দর্য এবং কিছু গানে সুরের মধুরতা ছাড়া বিশেষ কিছু নেইও এই রকম একটা ধারণা আমার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বহুধা-বৈচিত্র্যে অভ্যস্ত মনের অগোচরে হয়ত বা ছিল—আর এজন্য অনেকটা দায়ী দায়িত্বজ্ঞানহীন কিছু শিল্পী—একথাও নির্দ্বিধায় বলব। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় আপনার নানান গানে হৃদয়ের বিভিন্ন অনুভূতিগুলি মীড়, গুমক, মূর্ছনার আবেদনে যেভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছিল যে সকল বিরুদ্ধ ভাবের অহমিকা যেন মাথা নীচু করে বলেছিল, 'হার মেনেছি'। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব যে, প্রকৃত শিল্পীব্যক্তিত্ব ছাড়া এ অনুভবের রাজ্যে কেউ পেঁাছে দিতে পারে না। আপনার গুরুদেবের ভাষায় আমার করুণ হাসি আসে যখন কোনো তথাকথিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ গা জোয়ারী সুরে বলেন আমার মত ক্ল্যাসিকাল আসরের শ্রোতার পক্ষে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রস গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যেন গানের রস উপলব্ধির ক্ষেত্রেও পার্টিশন করা ছোট্ট ছোট্ট চেম্বার আছে আর প্রত্যেকটাতে লেখা আছে—এ অমুক রসগ্রহণের উপযোগী ও তমুক রসগ্রহণের অধিকারী। তা ছাড়া সত্যিকারের সঙ্গীতপূজারীর কোন প্রেজুডিস থাকতে পারে না।

এতগুলি কথা বলেই অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম বুঝতে পেরে শিল্পী খুব মিষ্টি করে হেসে বললেন, ভালো যে বেসেছে সেই জানে সন্ধ্যা, প্রীতি কেমন করে অজান্তেই আমাদের সকল প্রেজুডিসের বিষদাঁত হরণ করে। তুমি যথার্থ শিল্পপূজারী তাই সৌন্দর্যানুভূতির দুয়ার তোমার কাছে বন্ধ থাকতে পারে না —তাছাড়া ওস্তাদী গানের সঙ্গে গুরুদেবের অহিনকুল সম্পর্ক ছিল এর চেয়ে ভুল ধারণা কিছু নেই। তাঁর কল্পনার স্ফটিক ছায়ায় নানা রাগের রং ও বাহার আপন স্বরূপে ধরা দিয়ে কথা ও সুরের এমন মিলন ঘটাল কেমন করে যদি না মনের অতলে তাদের গভীর ছাপ থাকত? শান্তিনিকেতনে এত ওস্তাদকে উনি কেন আমন্ত্রণ জানাতেন যদি তাঁদের কাছ থেকে গ্রহণীয় কিছু নেই ভাবতেন? ওঁর যতখানি বিরাগ ছিল নিম্নশ্রেণীর গায়ক-গায়িকার অলঙ্কারপ্রপীড়িত সুরের ঝঙ্কারের প্রতি, ঠিক ততখানি মুগ্ধতা ছিল উচ্চ-শ্রেণীর শিল্পীর তানালাপের সংযমের প্রতি।

তারপর আত্মগতভাবেই যেন বলে চললেন—কোনো গভীর রাগ তাঁর মনকে যে কিভাবে দুলিয়েছে সে কথা অনুভব করতে হলেও আর একজন

রবীন্দ্রনাথের দরকার। সৌন্দর্যবোধের নানারঙা রূপের প্রত্যেকটিই তাঁর কাছে অতি-সত্য অতি-আপনার হয়ে উঠেছিল বলেই নিজের গানের ওপর তিনি অন্যের রং ফলানো বরদাস্ত করতে পারতেন না। এর জন্য অনেক আক্রমণ অনেক আঘাত ও বিতর্কের মুখোমুখিও হয়েছেন।

—ও হ্যাঁ—এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলি।

—সম্প্রতি এক বিশিষ্ট শিল্পী মন্তব্য করেছেন যে, শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরা সেখানকার প্রথা অনুসারে স্বরলিপি দেখে গান পরিবেশন করে থাকেন। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন: শান্তিনিকেতনের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রধানত গুরুমুখী। অর্থাৎ সঙ্গীতগুরু নিজে গান করে তারযন্ত্রের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেন। স্বরলিপির সাহায্য নেওয়া হয় কেবলমাত্র সুর মনে রাখবার এবং বিশুদ্ধতা বজায় রাখবার জন্য। অন্যান্য যে কোন সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বরলিপির যে ভূমিকা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তার সেই একই ভূমিকা। যদি কোন শিল্পী স্বরলিপি দেখে গান পরিবেশন করেন সেটা তাঁর ব্যক্তিগত সুবিধা বা অভ্যাসের জন্য। এই অভ্যাসের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের কোনো প্রথার কোনো সম্পর্ক নেই।

—শিল্পী হিসেবে আপনার মনে কোন বেদনা নেই? কোন অপ্রাপ্তির ক্ষোভ?

—সন্ধ্যা, গুরুদেবের আশীর্বাদ পেয়েছি সেই ত জীবনের চরম পাওয়া। তার বেশী কি চাইতে পারি? কি বা পেতে পারি? অন্তত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমি ত মানুষ। মানুষের মন বীণার তারের মতই। উঁচু সুরে বার বার বাঁধলেও মাঝে মাঝে সুর নেমে আসে বই কি।

—গুরুদেবের ভালোবাসা পেয়েছি। তারপরে কারো কাছে পাওয়া কোনো অবিচারের বা আঘাতের বেদনা মনে কি বাজে নি? বেজেছে। কিন্তু সে বেদনা স্থায়ী হয় নি। যখনই নিজেকে অসহায় মনে হয়েছে নিজের মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছি। ভেবেছি গান গাওয়ার আনন্দেই ত শিল্পীর আনন্দ। সে আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত নই। আর শ্রোতাদের ভালোবাসা? এ দিক দিয়ে আমি সত্যিই ভাগ্যবতী। সেজন্য ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। এ কৃতজ্ঞতাবোধ যেদিন থাকবে না সেদিন আমার গানও ফুরিয়ে যাবে।

—আর একটা কথা—গান গাইবার প্রেরণা আমি শান্তিনিকেতনে যতটা পেয়েছি তার থেকে অনেক বেশী পেয়েছি শান্তিনিকেতনের বাইরে থেকে। কোলকাতাকে এজন্য বড় নিজের মনে হয়। বাংলাদেশে যখন যাই নি কিংবা যাবার সম্ভাবনাও ছিল না তখনও ঢাকা থেকে (ঢাকা তখন বাংলাদেশ হয় নি) কত অচেনা ছেলেমেয়ে শান্তিনিকেতনে এসে আমার দেখা না পেয়ে সুন্দর সুন্দর ঢাকাই শাড়ী রেখে গেছেন।

—গত বছর আমেরিকার নানা শহরে যখন গান গেয়ে বেড়িয়েছি একটা

কথা বার বার মনে হয়েছে। রসিকচিত্তের কোনো জাত নেই। দেশ-কাল-ভাষার ব্যবধানের অতীত এক অদৃশ্য ধর্মের বন্ধন যেন তাদের এক করে রেখেছে। গানের সঙ্গে যখনই প্রাণকে মেশাতে পেরেছি—তার সাড়া সকল শ্রোতার কাছ থেকেই পেয়েছি। তাঁদের সাড়া দেবার প্রকাশভঙ্গীর তফাৎ থাকতে পারে। কিন্তু সাড়াটা সাড়াই। আর আমার পরম পাওয়া ত সেখানেই।

—মানুষের দেওয়া আঘাত মনকে বিচলিত করে নিশ্চয়ই। তবে আগে যতটা করত এখন তার চেয়ে অনেক কম করে। আর মনের এই ক্ষণিক দ্বন্দ্বের উত্তরণ ঘটতে দেরী হয় না—হয় না হয়ত গুরুদেবের জোরেই।

—মাঝে মাঝে আপনার গান শুনলে মনে হয় যেন কোন একাকীত্বের দ্বীপে আপনার বিরহিনী মনটা ঘুরছে অথচ এমনিতে আপনি খুব মিশুকে। হৈ-চৈ করা মেয়ে।

—আড্ডা হৈ-চৈ আমার নিশ্চয় ভালো লাগে কিন্তু তাঁর গান যখন গাই তখন সেই সুরের সঙ্গে কথার সুঙ্গে আর প্রকৃতির সঙ্গে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাই না। কথা, সুর, পরিবেশ আর আমি নিমেষে এক হয়ে যাই। এ ব্যাপারটা আপনা থেকেই ঘটে যায়। তাতে আমার কোনো চেষ্টা নেই। কৃত্রিম কোনো কৃতিত্বও নেই। যাঁর স্রোতধারা তাঁরই পূজা।

—গুরুদেব 'সঙ্গীত ও ভাব' প্রবন্ধে সুরের স্থান ও প্রয়োগ সম্বন্ধে বলেছেন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সঙ্গীতের স্থান সম্বন্ধেও সুচিন্তিত মত লিপিবদ্ধ করেছেন। কেবলমাত্র এখানকার শিক্ষা প্রকল্পেই নয়। সকল কাজকর্মে গানের স্থান এখানে বর্তমান। দিনের শুরু বেদমন্ত্র আবৃত্তি ও গান দিয়ে। শেষও তাই। প্রত্যেক ঋতুর পরিবর্তন ও প্রতিটি অনুষ্ঠানের উপযোগী গান রচনা করে মনকে প্রকৃতির সঙ্গে এক করবার চেষ্টা করেছেন। তাই অতি সহজেই আমরা গানের মধ্যে নিজেদের বিলিয়ে দেবার সুযোগ পেয়েছি।

—সে সুযোগ কেমনভাবে গ্রহণ করেছি বলতে পারব না। মনে হয় অচেতন-ভাবেই প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছি। এখানকার মন্দিরের বেদগান অনুষ্ঠানের মন্ত্র উচ্চারণে রোমাঞ্চিত হয়েছি। অর্থ সব বুঝিনি। কিন্তু সুর প্রতিধ্বনি তুলেছে মনে। গুরুদেবের বহু গানের অর্থ তখন বুঝিনি বা বোঝবার জন্য মাথাও ঘামাইনি। তবু সেই সুরের টানে এক অখণ্ড মণ্ডল সম্পূর্ণ জগতে যেন চলে গিয়েছি। আর বেদনাবোধ করেছি এখান থেকে আবার চলে আসতে হবে বলে। হয়ত সেইজন্যই আমায় তোমাদের দ্বীপান্তরের মানুষ বলে মনে হয়েছে।

—কোলকাতার মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম অধ্যায়টা জানতে ইচ্ছে করছে। আপনি কোলকাতাকে এত ভালোবাসেন বলেই জিজ্ঞেস করছি।

—সে এক উদ্দীপনার যুগ। শুভদা শান্তিনিকেতনের ধারায় কোল-কাতায় একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়বার পরিকল্পনা করলেন।

কোলকাতার ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবে। গুরুদেবের গান সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে ভাবতেই মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। শুভদার বয়স তখন বাইশ কি তেইশ বছর। ঐ বয়সের একটা ছেলের পক্ষে এত বড় কাজে নামা কতখানি দুঃসাহসের কাজ বুঝতে পারো?

—গীতবিতানের প্রতিষ্ঠা হলো। শুভদা (গুহঠাকুরতা) ওঁর বন্ধু সুরজিৎরঞ্জন রায়ের সহযোগিতায় কাজে নামলেন। শৈলজারঞ্জন মজুমদার, কনক বিশ্বাস, অনাদিদা, নীহারবিন্দু সেন, আমি, অরুন্ধতী আমাদের সবাইকে নিয়ে এলেন। এই গীত-বিতানের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যেই নিউ এম্পায়ারে শুভদা (শুভ গুহঠাকুরতা) 'মায়ার খেলা' করালেন আমাদের, মানে মেয়েদের দিয়ে। নীলিমা সেজেছিলো অমর, অরুন্ধতী শান্তা, আমি ছিলাম প্রমদার রোলে, বিবিদি, শৈলজাদার তত্ত্বাবধানে। হাউস ফুল। রোমাঞ্চকর সাফল্য।

—পরে মতান্তর হওয়ায় শুভদা গীতবিতান থেকে সরে এসে দক্ষিণী করলেন।

—আমি, সুচিত্রা, জর্জদা, হেমন্তবাবু গানের আসরে দেখা হলেই নরক গুলজার করতাম। সেই মধুর সম্পর্কে আজও ভাঁটা পড়েনি। কোলকাতায় আসার একটা বড় আকর্ষণ এটাও।

—গুরুদেবকে ভালোবেসেছি বলেই অন্য সুরকার ও রচয়িতাদের সৃষ্টির মধ্যে আমি তাঁদের উপলব্ধিকে অনুভব করবার চেষ্টা করি। সকল ক্ষুদ্রতা গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তাঁব অচলায়তন, তাসের দেশ। আমার প্রথম স্কলারশিপের টাকায় যে ক'টি রেকর্ড কিনেছিলাম—দিলীপ রায়ের 'বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম', ভীষ্মদেবের একটি ঠুংরীও তাতে ছিলো। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি ভালোবাসা এসব গানকে ভালো লাগার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি ত! আমি অতুলপ্রসাদ, নজরুলের গান, ভজনও রেকর্ড করেছি গাইতে ভালো লাগে বলেই। অন্যের গান গাইলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার আনুগত্য ক্ষুণ্ণ হবে এ চিন্তা আমার মনে কোনোদিনও স্থান পায় নি। নিজের মা-বাবাকে ভালোবেসেই ত মানুষ অন্যের মা-বাবার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হয়। সবচেয়ে বড় কথা গুণীকে শ্রদ্ধা জানাতে গুরুদেব চিরদিনই অকুণ্ঠিত ও অকৃপণ ছিলেন। তাই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাই বলেই অন্য সঙ্গীতের প্রতি নাক উঁচু ভাব দেখানোটা রবীন্দ্রধর্মের বিরুদ্ধাচরণ বলেই আমি মনে করি। যে কোনো ভালো কণ্ঠ, সুর ও রচনা আমার মনকে দোলা দেয়।

এই অবধি বলেই মোহরদি একটু আনমনা সুরে বললেন, সত্যি মানুষের সঙ্গে মানুষের এইরকম নির্মল সম্পর্ক কেন গড়ে ওঠে না? অকারণ দম্ভ ঈর্ষায় আমরা নিজেদেরই কত বড় আনন্দ থেকে বঞ্চিত করি।

মোহরদির যথার্থ দরদী মনটির আরও অনেক পরিচয় পেয়েছি তাঁরই অজান্তে এবং অসতর্ক মুহূর্তেই। কত গানের আসরে। নিজের নিজের অনুষ্ঠান শেষ হলে সব শিল্পীরাই চলে যান। কিন্তু গান শেষ হওয়ার পরও

মোহরদিকে দেখেছি উইংস-এর পাশে বসে খুব মন দিয়ে শুনছেন অল্পখ্যাত তরুণ শিল্পীদের গানও। গানের শেষে সবাইকে গিয়ে অগ্রজার স্নেহে উৎসাহ দিচ্ছেন। এটা যে মহত্বের পোজ নয়—তাঁর আগ্রহ ও মুখের উদগ্রীব অভিব্যক্তিই তার প্রমাণ। শুধু তাই নয়। উনি প্রায়ই বলেন—শান্তিনিকেতনে এবং কোলকাতাতেও ছোটদের মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর গলা এবং প্রতিভাও আছে। মাঝে মাঝে ভাবি সমালোচক ও সংগঠকদের মনোযোগের অভাবে এরা যদি মাঝপথে হারিয়ে যায়? কি হবে? রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ভবিষ্যতে রাখবে কারা?

—সন্ধ্যা, এরা এত অবহেলিত যে কি বলব। একমাত্র তুমি এদের জন্য অনলস পরিশ্রম করে যাও দেখছি। এজন্য আমি এদের হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।…জানো না সন্ধ্যা দায়িত্ব-জ্ঞানহীন, বে-দরদী, সমালোচনা মানুষের মনকে কিভাকে ভেঙে দেয়। দুটি অভিজ্ঞতার কথা বলছি।

বোলপুরে প্রথম টেলিফোন পত্তনের অনুষ্ঠানে গুরুদেব বড়দের সঙ্গে আমাকেও নিয়েছিলেন। তিনি নিজে খুব সম্ভব আবৃত্তি করেছিলেন। আমি গেয়েছিলাম 'ওগো পঞ্চদশী।' রেডিওতে ব্রডকাস্টিংও হয়েছিলো। সে আনন্দের স্মৃতি আজও রোমাঞ্চ জাগায়।

আর একটি ঘটনা। সুরেশ চক্রবর্তীর আমলে রেডিওতে। যতদিন বেঁচে থাকব এ ঘটনা তিক্ত স্মৃতি হয়ে থাকবে। আমি সারা মন প্রাণ দিয়েই গেয়েছিলাম, 'মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে'। তখনকার একটি পত্রিকায় সমালোচনা বেরিয়েছিলো বিশ্রী গলা। মনে আছে আমি পাগলের মত কেঁদেছিলাম। ভেবেছিলাম গান ছেড়েই দেব। বিশ্রী গলাই যদি হয় গাইবার দরকার কি?

—আর আজ?

—সে কথা ত তোমরা বলবে।

—মনে হয় যতদিন যাচ্ছে আপনার গানের জৌলুস যেন আরো বাড়ছে।

—যদি সত্যিই তা হয়ে থাকে তবে তার মূলে আছে সকলের চোখের আড়ালের একটি মানুষের নীরব অবদান! তোমাদের বীরেনদা যদি সকল বিরুদ্ধতার মধ্যেও তাঁর সকল সহযোগিতা দিয়ে আমায় আগলে না রাখতেন গান গাইবার এই মনটাই মরে যেতো!

এবার আমার শেষ প্রশ্ন মোহরদি। 'বলিগো সজনী যেওনা যেওনা' গানটি যতবার শুনি ভালো লাগে এই কথা ভেবে যে রবীন্দ্রনাথের অমন দেবতার মত রূপ, বিশ্বজয়ী প্রতিভা, তবু তাঁকেও ত বেদনার্ত চিত্তে বলতে হয়েছে।

'আমায় যখন ভাল সে না বাসে
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে
কাজ কি, কাজ কি, কাজ কি সজনী
মোর তরে তারে দিওনা বেদনা!'

এখানে আমাদের পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে তাঁর মনের সমধর্মিতা অনুভব

করে মনটা খুশী হয়ে ওঠে।

কিন্তু আমার এক বান্ধবী সেদিন একথা মানলো না। বললো, রবীন্দ্রনাথের অনুভব সর্বগামী ছিলো বলেই মানুষের সকল বেদনাকেই তিনি এমন হৃদয়-ছোঁওয়া রূপ দিতে পেরেছেন।

কিন্তু এই ইন্টারপ্রিটেশন মেনে নিতে আমার মন চায় না। আমার ভাবতে ইচ্ছে করে জীবনের কাছে যা চাইবার তা তিনি আমাদের মতো ব্যাকুলভাবেই চেয়েছেন, অপূর্ণতার ক্ষোভে কেঁদেছেন। ভাবতে ক্ষতি কি কোনো কাঁকন-পরা হাতের ঘা খেয়ে উদভ্রান্ত চিত্ত হয়েছেন (হোকনা সে ক্ষণিকের জন্য) খুবই হিউমেন। তাই তো তিনি আমাদের খুব আপনার জন।—অমন ইম্পার্সোন্যালভাবে তাঁকে ভাবতে ভালো লাগে না।—বলেই উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি উত্তরের জন্য।

এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত। নিজের বেদনা দিয়েই মানুষ অপরের বেদনা বোঝে। আর কবি বলেই তাঁর স্পর্শকাতরতা আরো বেশী। পার্সোন্যাল অনুভূতি পথ বেয়েই ত মানুষ ইম্পার্সোন্যাল স্টেজে পৌঁছয়। এই ত কদিন আগে রবীন্দ্রসদনে তুষারবাবুর সঙ্গে দেখা হলো। কি মুক্ত মনের মানুষ। গানের কথা উঠতেই একটি পুরোনো আমলের টপ্পার পদ গেয়ে দিলেন।

'আমারে আসতে বলে
এত অপমান করা?'

মনের কথার সহজ প্রকাশ ছিলো বলেই গানের কলিটি মনে আছে।

জানো সন্ধ্যা, মানুষের হৃদয়ের গহন গভীর অনুভূতি বড় লাজুক। যার তার কাছে ঘোমটা খোলে না। এইসব সুকুমার বৃত্তিগুলি অকরুণ কৌতূহলের হাটে ঘোমটা খুলতে লজ্জা পায়। রবীন্দ্রনাথের মত মানুষকেও গভীর সুরে গভীর কথা বলবার আগে কাঁচুমাচু হয়ে মাথা চুলকে বলতে হয়েছে মনে মনে হাসবি কি না বুঝবে কেমন করে।

হয়ত বা সেইজন্যই প্রথম প্রথম বাইরে গাইতে আমার বড় কুণ্ঠা আসতো। গাইবার সময় গুরুদেবের গানের একটি কথা উচ্চারণ করতে না করতেই মনটা সংকুচিত হয়ে উঠতো সভার মাঝে মনের কথা বলা? ছিঃ!

তারপর?

গাইতে গাইতে কখন যে শ্রোতাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছি বুঝতেই পারিনি। আজ গানের শেষে তোমাদের চোখে দেখি আমার হৃদয়াবেগের ছায়া। তোমাদের 'অ্যাপ্রিসিয়েশন' আমায় নতুন শক্তি নতুন প্রেরণা এনে দেয়। সব সময় মনে হয় আমায় আরো অনেক, অনেক ভালো গাইতে হবে। আরও দিতে হবে। এখনও কিছুই দেওয়া হয়নি।

কানন দেবী

রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার দায়িত্ব সম্বন্ধে এমন সচেতন হয়ে উঠতে পেরেছিলাম বোধহয় পঙ্কজবাবুর (পঙ্কজ মল্লিক) বারংবার উচ্চারিত সাবধান বাণীর দরুনই। নিখুঁত উচ্চারণ, সুরের প্রতিটি শ্রুতির স্পষ্টতা ছাড়াও গলায় স্বরের বিভঙ্গ, কোন পর্দার কি সেন্টিমেন্ট, এসব দিকেও ওঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টি থাকত।

'সুরের আগুন'-এর একটি স্ফুলিঙ্গ হবার আমন্ত্রণ জানাতে কানন দেবী সজোরে মাথাই শুধু নাড়েননি, স-সংকোচে আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের এমন সব সম্রাট, সম্রাজ্ঞীতুল্য শিল্পীদের পাশে আমি স্থান পাবার যোগ্য নই। আমায় এর মধ্যে জুড়ে দিয়ে এর মর্যাদা নষ্ট কোরো না। কি হিসেবে আমায় এর মধ্যে টানছ ? আমি সবসুদ্ধ বাইশ তেইশখানা মাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করেছি। এখনকার মত আসর, জলসার রেওয়াজ আমাদের সময়ে ছিলো না। কাজেই সাধারণ সভায় গাওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। আর আমার কোনো শিষ্য শিষ্যাও নেই কারণ সঙ্গীত বিষয়ে শিক্ষার্থী দশার ঊর্ধ্বে কোনোদিন উঠতে পেরেছি বলে আমি মনে করি না। তবে ? রবীন্দ্র-সঙ্গীতে আমার কনট্রিবিউশনটা কোথায়, যার জন্য 'সুরের আগুন'-এর মত এমন একটা ঐতিহাসিক নিবন্ধগুচ্ছে আমার স্থান হতে পারে ?

এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলব, ইতিহাস ত মধুর কণ্ঠের সম্মতির অপেক্ষা রাখে না ভদ্রে, যদিও আপনার বিনয় আপনার কণ্ঠখ্যাতির মতোই জনবন্দিত।

মোটেই বিনয় নয়। আমি সত্যি কথাই বলছি।

এ হেন সত্যকথন আপনার মত গুণীরই উপযুক্ত ভূষণ। সর্বজনশ্রদ্ধেয়া হলেও আপনার সম্বন্ধে কিছু দুর্বলতা থাকার সুনাম অথবা দুর্নাম এ অধমের আছে। এতএব নিজের কোনো মতামত প্রকাশ করবার আগে দেশের বিদগ্ধমণ্ডলীর স্বীকৃতির উদাহরণগুলিই স্মরণ করছি। রবীন্দ্রমেলা রবীন্দ্র-সদন, সম্প্রতি মার্বেল প্যালেসের রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে তুষারবাবু, সুবিনয় রায়ের সঙ্গে আপনার সংবর্ধনা এবং মনে না-পড়া আরো অনেক রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আসরে সংবর্ধনা ছাড়াও গান্ধর্বীতে পঙ্কজবাবু ও বিড়লা অ্যাকাডেমিতে আপনার প্রধান অতিথি হওয়ার ঘটনা ত বেশীদিনের নয়। কিন্তু এহ বাহ্য।

—এইতো সেদিন শান্তিদেববাবুও রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পীদের আলোচনা

প্রসঙ্গে ছায়াচিত্রে আপনার গুরু পঙ্কজবাবু ছাড়াও আপনার ও সায়গলের কথা বললেন। কিছুদিন আগে মোহরদি, অধুনাকালের রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতমা নায়িকা হয়েও রেডিওতে অতীত স্মৃতি আলোচনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের পর্যায় আসতে শ্রদ্ধেয় পঙ্কজবাবুর ও আপনার দুটি গান 'প্রলয় নাচন' ও 'আজ সবার রঙে' বাজিয়ে শোনালেন এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন 'পরো, পরো, পরো, তবে' উচ্চারণের কথা—যে উচ্চারণ অনুভবের আলোরেখার আণ্ডার লাইনের মতোই গানটির মর্ম সত্যকে যেন মূর্ত করে তুলেছে। শুনেছি শান্তিনিকেতনের সবাই তাঁর এ নির্বাচন খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করেছেন। তাছাড়া একবার ২৪শে বৈশাখ রবীন্দ্রসদনে কবির মর্মর মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে তদানীন্তন পূর্তমন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সেন মহাশয় স্টেজ থেকে অডিটোরি-য়মে নেমে এসে করজোড়ে আপনাকেই অনুরোধে জানালেন একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার জন্য। তাঁর অনুরোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো সেদিনের সভায় অংশগ্রহণকারী অধুনাকালের সেরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দোপাধ্যায়, মায়া সেন) আবেদন।

—এতগুলি যথার্থ গুণী ও সংস্কৃতি প্রেমিক মানুষের মতামত তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অতএব আপনার যুক্তির কোনোটিই মানা যাচ্ছে না। আর তারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি 'সুরের আগুন-এ' সঙ্গীত-গুঞ্জরিত ঐ মধুর নামটির সংযোজন।

অগত্যা আত্মসমর্পণ না করে উপায় কি? কানন দেবীর মুখে ফুটে ওঠে সেই ঝলমলে হাসি, আজ তা স্নিগ্ধ আশ্বাসের মতই। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক রসিকমণ্ডলীর কাছেই শুনেছি এ হাসি ছিলো সাহিত্য ও কাব্যের সেই সুপ্রসিদ্ধ হাসি যা দেখে 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল।'

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে কানন দেবীর প্রথম ও প্রধান এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যথার্থ গুরু পঙ্কজ মল্লিকের ভাষায় 'কানন ইজ দি ফার্স্ট সিংগিং স্টার ইন নিউ থিয়েটার্স।'

'ফার্স্ট সিংগিং স্টার'—এইজন্য যে অভিনয়ের মধ্যে গান হয়ত আগে গেয়েছেন অনেকে, কিন্তু সত্যিকারের গায়িকা বলতে যা বোঝায় সে পর্যায়ে তাঁদের মধ্যে কেউ পড়তেন না। ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকে নামী ও দামী শিল্পীর লোভনীয় তালিকা আজ ছায়ছবির অন্যতম আকর্ষণ। যে কোনো সঙ্গীত-প্রধান চরিত্রও সঙ্গীতহীনার পক্ষে রূপায়ন করাটা আজ আর মায়াসরসীর মত অবাস্তব নয়। কিন্তু কানন দেবী যে যুগের নায়িকা সে যুগে চলচ্চিত্র-শিল্পীকে একাধারে অভিনয়, সঙ্গীত, নৃত্য সবই আয়ত্ত করতে হতো। কারণ ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক তখনকার মানুষের কল্পনাতেও আসেনি। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অভিনীত চরিত্রের শিল্পী নির্বাচন সীমিত হয়ে পড়তো। কারণ কাজ চালানো দু-একখানি গান গাওয়া অন্যদের পক্ষে সম্ভব হলেও সঙ্গীত যে চরিত্রের অপরিহার্য অঙ্গ সেখানে নির্বাচিত শিল্পী সত্যিকারের সঙ্গীতশিল্পী না হলে রূপায়িত চরিত্র দুর্বল হয়ে পড়বে এবং চিত্ররচনার

উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হবে। আর এই ভূমিকাতেই অদ্বিতীয়া ছিলেন কানন দেবী।

ঐ একটি নাম একটি যুগকে প্রতিনিধিত্ব করছে সাধে? কানন দেবী সৌন্দর্যময়ী, অভিনয়শিল্পে অনন্যা, দীপ্তিময়ী ব্যক্তিত্ব—এ সবই সত্য। কিন্তু আমার কাছে এ-সবের চেয়ে অনেক বড় তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভা। সঙ্গীত-প্রতিভা বলতে যা বোঝায় সুরেলা আওয়াজ, সঙ্গীতের অনুভব, ধারণা, শিক্ষিত কণ্ঠ, সূক্ষ্ম কারুকাজ, প্রতি পর্দায় শ্রুতিমাধুর্য—এতগুলি সুদুর্লভ সমন্বয় ঘটেছিলো তাঁর কণ্ঠে। সঙ্গীতময়ী কানন দেবীর জুড়ি সে যুগে ত কেউ ছিলেনই না, এ যুগেও তাঁর কাছাকাছি পৌঁছবার মতো কোনো সঙ্গীত-শিল্পী চলচ্চিত্র জগতে সম্ভবত কেউ নেই। আজকের যুগে বাংলার চিত্র-জগতে কত যুগবিপ্লবী পরিবর্তন ঘটেছে, কত বিস্ময়কর গৌরব পেয়েছে বাংলা চলচ্চিত্র। কতো শক্তিমান প্রতিভার আবির্ভাবে বিশ্বের দরবারে বাংলার চিত্রশিল্প আজ অভিনন্দিত। কিন্তু এমন কোনো সুকণ্ঠীর আবির্ভাব ঘটলো না যিনি কানন দেবীর সঙ্গীতপ্রতিভার দীপ্তিকে এতটুকুও ম্লান করতে পারেন। তাই কানন দেবী কানন দেবীই। আপন মহিমায় ভাস্বর।

একদিন সঙ্গীতাচার্য পঙ্কজবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে করতে প্রশ্ন করেছিলাম—একটা জিনিস আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগে। একান্তভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতেই সমর্পিতা শিল্পী কানন দেবী নন; জনসাধারণের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েও তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাননি। গেয়েছেন অল্প কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত (সবসুদ্ধ বাইশ কি তেইশখানি) তাও ছবির প্রয়োজনে। তবু সেই ক'টি গানের স্মৃতিই রসিকচিত্তে কেমন করে এমন অনপনেয় ছাপ ফেলতে পারলো? কেন ঐ ক'টি গানের নামের সঙ্গে কানন দেবীর কণ্ঠ এমনভাবে মিশে রইলো যে অন্য কারো কণ্ঠে এসব গান শোনার কথা ভাবাই যায় না?' 'সবার রঙে রং মেশাতে হবে' ঐ একটি গানই বোধহয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা একশ বছর এগিয়ে দিয়েছে। এটা আমার ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসের কথা নয়। সকল শিল্পী, শিল্পরসিক এমন কি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গুরুরাও (যদিও যাঁর কাছে বলছি তিনিও একজন কিংবদন্তীতুল্য শিল্পী এবং গুরুও) এ বিষয়ে একমত। কেন?

সাধক শিল্পী শ্রদ্ধেয় পঙ্কজবাবু তার উত্তরে বলেছিলেন, তার কারণ এটাকে সে বীজমন্ত্রের মতো করে নিয়েছিলো। শাস্ত্রে আছে 'নমন্ত্রম্ অক্ষর নাস্তি'—এমন কোনো অক্ষর নেই যা দিয়ে মন্ত্র রচনা করা যায় না। অপেক্ষা কেবল যোগাযোগের। এই অনুকূল যোগাযোগের দুর্লভ লগ্ন কাননের শিল্পী-জীবনে এসেছিলো। 'প্রতিভা যাহা স্পর্শ করে তাহাই সোনা হইয়া ওঠে।' বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাটি কাননের ক্ষেত্রে আশ্চর্যভাবে সত্য হয়ে উঠেছে। সে ক'খানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছে কি উদ্দেশ্যে গেয়েছে সেটাই তার গান সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা নয়। যে ক'টি গান সে গেয়েছে তার ওজন, মর্মগ্রাহিতা, এক্সপ্রেশনের অনন্যতা সে গানে এমন একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা সৃষ্টি করেছে

যাকে না মেনে উপায় নেই। এ স্বাতন্ত্র্য তার অনন্যসাধারণ প্রতিভাজাত সম্পদ। হীরের দ্যুতিকে কেউ অস্বীকার করতে পারে কি? সে দ্যুতি ছোট্ট একখণ্ড হীরেরই হোক কিংবা মস্তবড় হীরে থেকেই বিচ্ছুরিত হোক না কেন।

—কানন দেবীর রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম দীক্ষা আপনারই কাছে তো—তাই এ বিষয়ে আপনার ধারণা ও মতামত চাই।

—মুক্তি কথাচিত্রের সময় কাননকে গান শেখানোর সুযোগ আসে আমার। তার আগে অবশ্য একটা রেকর্ড ও আমার সুরে করেছিলো। রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা তার সেই সময় থেকেই। সেই সময় তার শিল্পীজীবন সার্থকতার দিকে মোড় নিচ্ছে। তার মানসপদ্মের পাপড়িগুলি যেন একটি একটি করে দল মেলছে। ও গ্রহণ করতে পেরেছিলো। মেয়েদের মধ্যে সী ইজ দি ফার্স্ট সিংগিং স্টার ইন নিউ থিয়েটার্স—এই হিসেবে ওর অনুভব ছিলো, গানের শিক্ষা ছিলো, অতুলনীয় কণ্ঠ ছিলো…সবার ওপর ছিলো শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি। কবির কাছে 'দিনের শেষে' গানটি নিজের সুরে গাইবার অনুমতি ভিক্ষা করতে যখন যাই উপরি-পাওনা হিসেবে তিনিই 'আজ সবার রঙে' ও 'তার বিদায় বেলার মালাখানি' গান দুটি ঐ ছবিতে ব্যবহার করার উপদেশ দিলেন। এবং উনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ ছবির নামকরণ করলেন 'মুক্তি'।

এ দুটি সংবাদ পঙ্কজবাবুর নিবন্ধে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। পুনরুল্লেখ করলাম এই কারণে যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিধাতাই হয়তো চেয়েছিলেন কানন দেবীর কণ্ঠে এ সঙ্গীত ধ্বনিত হোক। তা না হলে এ হেন যোগাযোগ ঘটলো কেমন করে?

শ্রদ্ধেয় পঙ্কজবাবু আরও বলেছিলেন, এ দু'টি গান প্রয়োগের অনুমতি পেতেই আমার কাননের কথাই মনে এলো—পঙ্কজবাবু বলে চললেন, আমি যখন ওকে বোঝাতাম 'আজ সবার রং-এ রং মেশাতে হবে' হোলির গান নয়, পূজার গান। মনে কর প্রশান্ত তোমার স্বামী ('মুক্তি' চিত্রে) সে একজন শিল্পী। তার তুলি থেকে সাতটি রঙের যে রং ফুটবে সেই রঙের উত্তরীয়খানি দেখবার জন্য তুমি ব্যাকুল। তুমি যে তার সহধর্মিণী। তাই তার শিল্পীসত্তার নানা রঙের বিকাশেই তোমার আনন্দ। 'সেই রাতের স্বপন ভাঙা—আমার হৃদয় হোকনা রাঙা'। কেন রাঙা হবে? না, 'তোমার রঙেরই গৌরবে'।

কানন খুব মন দিয়ে শুনতো। ওর বিরাট দুটি চোখ যেন স্বপ্নে ভরে উঠতো, সেই মন নিয়ে গাইতো। তাই আজও সেইসব গান তোমাদের মন ভরাতে পারে।

শিল্পীমন বলে একটা কথা আছে। কানন সেই মনের অধিকারী। কোনো গান শেখবার আগে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানান প্রশ্ন করে সে গানের মর্মের ভাষা বুঝতে চাইতো। এমন জিজ্ঞাসু মন আমি দেখিনি। আর কেমন করে শিখতে হয় সেটা আমি কাননের কাছে শিখেছি। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বিহারের ভূমিকম্পের সময় একবার এক চ্যারিটি শো'তে ওকে আমি স্টেজে গাইতে বললাম। ও ছোটো মেয়ের মতো কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, 'এখানে

আমি কি গাইব?' আমি বললাম, 'তোমার ঐ সুন্দর প্রশ্নটির মধ্যে তোমার সদ্যজাগ্রত শিল্পীমন কথা বলেছে।' ও তো ইচ্ছে করলে কোনো ফিল্মের গান গেয়ে অনায়াসলব্ধ হাততালি নিয়ে চলে আসতে পারতো? কিন্তু ঐ যে ওর মনে হলো এই পরিবেশে, এই পটভূমিকায় আমি কি গাইব? এখানে তো ফিল্মের গান চলবে না। এইখানেই ও প্রকৃত শিল্পী।

এইতো গেলো ওর প্রকৃতির খবর। তাছাড়া প্রথমের দিকে ভালো ওস্তাদের কাছে শিক্ষার দরুণ ওর গলার বেস ছিলো দারুণ। উচ্চারণও ছিলো স্পষ্ট এবং সুন্দর।

কানন দেবীর গানের প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষও বলেছিলেন, ওঁর শিক্ষা হয়েছে ভালো লোকের কাছে। সেই শিক্ষার গুণটা ওঁর গানে পাওয়া যায়।

তারপর কতদিন, কি নিভৃত মুহূর্তে কি কোলাহলের মধ্যে কানন দেবীর রেকর্ড শুনেছি আর ভেবেছি কি যাদু আছে ওঁর গানে? ওঁর পূর্ণকণ্ঠের (ফুলথ্রোটেড ভয়েস্)? শিক্ষারগুণে? না দরদ? যখনই যে গান গেয়েছেন রসোত্তীর্ণ হয়েছেই এবং সে রস যেন গহনসঞ্চারী প্রাণরসের মতো মর্মের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে এক অনাস্বাদিত মাধুর্যে মন ভরে দিয়েছে। 'আমি বনফুল গো'র মতো ছড়াজাতীয় গানও যেন ওঁর কণ্ঠের সোহাগস্পর্শে প্রাণ পেয়েছে।

একদিন ওঁর রেকর্ডের স্তূপ নিয়ে শুনতে বসেছিলাম। আধুনিক, চিত্র-গীতি, ঠুংরী, দাদরা থেকে শুরু করে রবীন্দ্রসঙ্গীত সব গানই আপন আপন বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবমাধুরী কানন দেবীর তুলনাবিহীন কণ্ঠে যে উতলা আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলো তারই রেশ আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে শ্রোতাদের মনে। 'আজ সবার রং'-এ কি সবার মনে এমন রং ছড়াতে পারতো যদি না ঐ কণ্ঠে অনুরণিত হতো? 'বিদায় বেলার মালাখানি', 'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে', 'তোমার সুরের ধারা', 'আমার বেলা যে যায়', 'সেদিন দুজনে' এমনি কত গান ভাবে সুরে, অনুভবের গভীরতায় মনকে যেন কোথায় নিয়ে যায়? তার 'বিদায় বিলার মালাখানি'র কথাই ধরি। গান শুরু হলো যেন জমাট বাঁধা স্তব্ধতার মধ্যে। সযত্নরুদ্ধ নিভৃত বেদনাকে ব্যক্ত করার সসংকোচ মাধুর্যে। তারপর আত্মহারা চিত্ত অজান্তে কখন কোন মীড়ের সূক্ষ্ম শ্রুতিতে, অস্ফুট গুঞ্জনের ভাষায়, (বুকের কাছে পলে পলে) কোথায় কোন পর্দার ওপর আলতো ছোঁয়া লাগিয়ে কোথাও জোর দিয়ে ব্যঞ্জনার বিস্তারে (গন্ধ তাহার ক্ষণে ক্ষণের পরই জা-আ-গেতে) উদ্গত অশ্রুরোধের ক্ষণবিরতি। পরমুহূর্তেই যখন তার সপ্তকে (ফাগুন সমীরণে) পৌঁছয়, মনে হয় যেন কতো রঙবাহারের ঝিকিমিকি আলো, রং, ছায়া মিলে লক্ষ ঝাড়ের নানারঙা আলো, ছড়িয়ে দিয়েই মিলিয়ে গেলো। কানন দেবীর গান যতবারই শুনি 'ক্যালিডোসস্কোপিক বিউটি' কথাটা মনে আসে। সে কি তাঁর ডাইনামিক এক্সপ্রেশনের কারণে?

ক্ল্যাসিক্যাল গানের কোনো এক শীর্ষস্থানীয় শিল্পী কানন দেবী ও লতা

মঙ্গেশকরের গলার তুলনা করে বলেছিলেন, দু'জনের একজাতের গলা। কিন্তু লতার গলায় যে লিমিটেশন আছে কানন দেবীর কণ্ঠে তা অতিক্রম করে অলঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। দু'জনের গলাই উঁচু সুরে বাঁধা। কিন্তু কানন দেবীর কণ্ঠে সুর যেন মহামূল্য বেনারসী শাড়ীর মতো জমকালো। লতার গলা একটু পাতলা। কিন্তু কানন দেবীর ভরাট এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ। লতা মঙ্গেশকরের গলা সময়ে সময়ে একটু শ্রিল্ শোনায়, যদিও সেটা শুনতে ভালোই লাগে। কিন্তু এই শ্রিলনেস কানন দেবীর গলায় স্মুথ হয়ে যেন পালিশের মতো ঝকমক করছে! আর কি অরনামেনটেশন।

এই 'অরনামেনটেশন' কথাটি আমার মনকে খুব স্পর্শ করেছিলো। যখন গান বুঝতাম না তখনও একটা নাম-না-জানা ভালো লাগার দরজায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনতাম ওঁর গান। শুনে মনে হতো প্রতি চরণের প্রতিটি শব্দের সঙ্গে অলক্ষ্যে যেন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মতো নানা যন্ত্রের অর্কেস্ট্রা বেজে উঠেছে। সে কি ঐ অরনামেনটেশনের ফলশ্রুতি ?

কানন দেবীর কণ্ঠে আবেগের তীব্রতা ফুটে ওঠে পঙ্কজবাবুর ভাষায়। হীরকদ্যুতির মতো, তবু মাধুর্যের অভাব ছিলো নাতো। খোলা গলা, কিন্তু কাঠিন্য নেই এতটুকু। 'এতদিন যে বসেছিলেম' গানটির অন্তরায়—

'গন্ধে উতল হাওয়ার মতো
উড়ে তোমার উত্তরী
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী'—

কানন দেবীর দীপ্ত অগ্নিশিখার মতো কণ্ঠস্বর কি রসিক শ্রোতা কোনোদিন ভুলতে পারবে? না ভুলতে পারবে 'মঞ্জরী কথাটির উচ্চারণের সৌন্দর্য? মন+জরী—এখানে ব্যাকরণের ভাষায় বিপ্রকর্ষ হয়ে গেছে। তাতেই যেন 'মঞ্জরী'র দোদুল্যমান রূপটি ফুটে উঠেছে।

এই রকম ছোট্ট কাজ, সূক্ষ্ম শ্রুতিতে যেমন গীতিকাব্যের মধুরতা— আবার ওপরের পর্দায় পৌঁছলে সেতারের সাতটি তার বেজে ওঠার ধ্বনি-মাদকতার সমন্বয় ঐ একটি কণ্ঠেই মেলে। রেঞ্জ এবং ভল্যুম দুটি সম্পদেই তিনি ঐশ্বর্যময়ী।

ওস্তাদ আলা রাক্কা, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, রাইচাঁদ বড়াল, দিলীপকুমার রায়, অনাদি দস্তিদার, পঙ্কজ মল্লিক প্রমুখ গুণীদের শিক্ষায় পরিমার্জিত তাঁর বিধিদত্ত কণ্ঠ সুরের আবেগ, উচ্চারণ, সর্বোপরি শিল্পীর আপনহারা অনুভবে ডুবে প্রত্যেকটি গানই যেন রং ও রসের সমুদ্রে স্নান করে উঠেছে।

'সবার রঙে' ও 'বিদায় বেলার মালাখানি' দুটি বিপরীতধর্মী ভাবের গান তাঁর কণ্ঠে যেমন গভীর মাধুর্যে লীলায়িত, তেমনি 'আমার বেলা যে যায়' ও 'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে'র একটিতে আত্মসমর্পণের আবেগ ফুটে ওঠে। অন্যটিতে দার্শনিক ভাবের ধ্যানস্তব্ধতার অতল মৌনতা গোধূলির রাঙা আলোয় রহস্যমধুর হয়।

'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়'-এর মতো হাল্কা মেজাজের গানে প্রেমিকার অন্তরে ও বাইরে বিপরীত ভাবের রূপবর্ণনায় কৌতুকের সূক্ষ্ম সুরটি অনুভব করা যায়। 'মর্মে যে ক্রন্দনধ্বনি'-তে মন্দ্রসপ্তকের প্রান্তে অস্ফুট স্বরে আত্মগোপনের বিরতির পরই পূর্ণ আবেগে 'মাল্য যে দংশিছে হায়'-এর উচ্চগ্রামে পৌঁছেই (যে পর্দায় যাওয়া রীতিমত আয়াসসাধ্য) আবার 'শয্যা যে কণ্টকশয্যা'-তে যখন নেমে এলো মনে হলো সুরের লীলাবিহারিণী যেন খেলার ছলেই এক লাফে আকাশ ছুঁয়ে এলা। গলার ওপর কতটা দখল থাকলে এ-বস্তু সম্ভব—সঙ্গীতরসিক মাত্রেরই তা জানা।

—রবীন্দ্রসঙ্গীতকে এমন একান্তভাবে ভালোবাসতে পারলেন কেমন করে? —এইটেই ছিলো কানন দেবীর কাছে আমার প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন।

—একান্তভাবে কথাটা আমার ক্ষেত্রে খাটে না। অন্তত যখন রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছিলাম, তখন একথা বলা চলত না। বরং এখন এই মুহূর্তে বলতে পারি—ক্ল্যাসিক্যাল গান বাদ দিলে রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া শোনবার যোগ্য গান নেই। অবশ্যই নজরুল, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের মতো কয়েকজন মরমী স্রষ্টার গান ছাড়া।

—এখন গানের জগৎ থেকে ছুটি নেবার পর যে কথা বলতে পারেন—দোর্দণ্ড-প্রতাপে রাজত্ব করবার সময় সে কথা বলতে পারতেন না কেন?

—সে প্রশ্নের জবাব পরে দিচ্ছি। তার আগে একটা কথা জানিয়ে রাখি। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আমি একেশ্বরবাদীত্বে বিশ্বাসী নই। এখানে আমি বহুবল্লভা। সঙ্গীত যদি একটা সমুদ্র হয়, তবে প্রতিটি ঢেউ-এর দুরন্ত উচ্ছ্বাসের দোলায় দুলতে আমার যতখানি ভালো লাগে, ঠিক ততখানিই ভালো লাগে নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের শান্তরূপের অতলে তলিয়ে যেতে। জ্যোৎস্না রাতে যখন সমুদ্র থেকে বেলাভূমি অবধি আলোয় ভেসে যায়, তখন সমুদ্রতীরে বসে থাকতে ভালো লাগে না কার? কিন্তু জ্যোৎস্নাহীন রাতে আঁধার-কালো প্রকাণ্ড ঢেউগুলো যখন আলোর মুকুট পরে নাচতে নাচতে এসে তীরের বুকে ভেঙে পড়ে—আমার যে কি দারুণ থ্রিলিং লাগে বলতে পারি না। আর ঢেউ-এর এই ওঠাপড়া; অন্ধকারের জোয়ার আলোর নূপুর বাজানো জ্যোৎস্না রাত—এই সব মিলিয়েই মহাসমুদ্র।

—সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাই। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে আমার ভালো লাগতো নিশ্চয়ই। কিন্তু সে সময় অন্য যেসব গান গাইতাম সে-সব গানের ওপরও আমার কিছু কম আকর্ষণ ছিলো না। মুক্তির কথাই ধর না! এ-ছবিতে পপুলার হয়েছিলো 'আজ সবার রং-এ' কিন্তু আমার গাইতে অনেক বেশী ভালো লাগতো 'ওগো সুন্দর' (সজনীকান্তবাবুর লেখা)। ও-গানটা যেন আমায় হন্ট করতো······

কাননদেবীর কথার সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃশ্রুতিতে যেন বেজে উঠলো—

'আঁধারে আলোকে যুগ যুগ ধরি প্রিয়
বিরহমিলনে চিরদিন জানাজানি'

এখানে বিরহের র-তে জোর দিয়ে 'মিলন'কে আলতোভাবে ছুঁয়ে জানাজানির শেষে ছোট মীড়ের উদ্দাম টানে উদাসী ব্যাকুলতার যে চকিত আভাস ঝলকে ওঠে তার তুলনা কই ?

—কিন্তু এখানে আমারও কিছু বক্তব্য আছে। 'ওগো সুন্দর' গানটির বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের কি কোনো তফাৎ আছে ? ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসার বার্তা নিয়েই ত রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্র-সাহিত্য। অন্য গান বলতে যদি আধুনিক বা ভাবসঙ্গীতকে বোঝান—তবে তার নাম দেওয়া যাক সমসাময়িক কালের গান। রবীন্দ্রনাথ ত তার বাইরে নন।

—আমিও ত সেই কথাটাই বলতে চাই। এঁরা সবাই মিলে একটি পরিবার—রবীন্দ্রনাথ তাদের গুরু। তোমরাই রাবীন্দ্রিক অমুক তমুক বলে গানের জগতে পার্টিশন করা ছোট ছোট ঘর তুলে—সিভিল-ওয়ার বাঁধিয়ে তুলতে চাও। আমি সামান্য মানুষ। রবীন্দ্রনাথকে বোঝবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি কোনোটাই নেই। শুধু এইটুকুই বুঝি আলগোছে সবার ছোঁয়া বাঁচিয়ে চারদিকে স্বতন্ত্র দেয়াল তুলে—নিজের ধ্বজা উড়িয়ে তিনি চলতে চাননি। 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে' সেই ঘরই সারাজীবন ধরে খুঁজেছেন। নানা রাগ, নানান ছাঁদের গানের অচিনলোকে ছিলো যেন তাঁর অবাধ আনাগোনা। তারই পুলক রোমাঞ্চ আবেশ ও আনন্দ ছড়ানো কবির গানে।

—এই ত বেশ বলছেন। তাহলে এতক্ষণ ধরে এ অধমের সঙ্গে ছলনা করছিলেন কেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি আপনার বিশেষ কোনো আকর্ষণ ছিলো না ?

—ছলনা ঠিক নয়—মানুষ অনেক সময় অনেক গোপন বেদনার তাগিদে অনেক কথা বলে ফেলে—যার সবটা সত্যি নয়। কারণ—এ অনুভূতি সম্বন্ধে সে নিজেও সবসময় সচেতন নয়। কিন্তু সে প্রসঙ্গ থাক—

—থাকবে কেন—কবির গানকে ভালোবেসেছেন—সে কথা স্বীকার করতে এত কুণ্ঠা কিসের ?

—কুণ্ঠা হয় কি সাধে ? মনে আছে ভুলাদা (প্রশান্ত মহলানবিশ) একবার আমারই আব্দারে কবির একখানি ছবি তাঁর অটোগ্রাফ করে এনে দিয়েছিলেন। তাই নিয়ে উঁচু মহলে তুমুল প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিলো—কেন একজন চিত্রাভিনেত্রীর কাছে কবির নিজের হাতে স্বাক্ষরিত ছবি থাকবে ? কোলকাতা থেকে অনেকে ট্রাংকল করেও তাঁকে উত্যক্ত করেছেন। সেই প্রথম নিজের ওপর ধিক্কার এসেছিলো—আমি অতবড় মানুষটার অশান্তির কারণ হলাম। হোক না তা সাময়িক। হলাম ত ? ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিলো—রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর গান আমার মতো সামান্য মানুষের জন্য নয়। ও সম্পদ মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের জন্য। যা আমার নয় তার জন্য লোভ করবার কি দরকার ? তারচেয়ে গরীবের ভাগ্যে যেটুকু ক্ষুদ কুঁড়ো জোটে তাই নিয়ে খুশী থাকাই ভালো।

—তারপর ?

—তারপর—এক একটি ছবির জন্য যখন মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হতো তখন নিজের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলতো। একটা—অনামী অভিমানে সারা হৃদয় ছেয়ে আসত। এ অভিমান কেন? কার ওপর? তাও ঠিক বুঝতাম না। অথচ এ গান গাইব না—এমন কথা ত বলা যেতো না। কারণ সেটা স্পর্ধার মতোই শোনাবে।—অতএব গাইতে হতো। সে এক মজার অনুভূতি। যেই না গাইতে শুরু করতাম—এমনই বিদ্রোহী মনের রুক্ষ-ভাব উদ্ধত অভিমান কোন মন্ত্রবলে যেন গলে যেত অশ্রু আবেগে। কোন এক আশ্চর্য দেশে যেন ক্ষণিকের জন্য প্রবেশাধিকার পেতাম। মনে হতো আমার মনের কথাটিরই কি আশ্চর্য সুন্দর প্রকাশ। আমার কথাটির মধ্যে কেউ যেন আবার ইগোইজমের ফ্যালাসি করে না বসেন। আমি বলতে চেয়েছি—আমাদের সকলের মনের কথা। গান গাইবার সময় নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে 'এই লভিনু সঙ্গ তব' গানটি। 'এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর'—গাইবার সময় গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠতো। জীবনে আচম্বিতেই এক একটা বৈপ্লবিক চেতনা আসে। উপলব্ধির সেই পুণ্য মালগ্নে মনে হয় যেন অন্তর্বিহীন বেদনা-পাথার পেরিয়ে এক জ্যোতির্ময়ের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এত পথ এক জনমে পার হওয়া যায় না—তবু যে হলাম এতো তাঁরই করুণা। শিখর ও গহ্বর যেন হাত ধরাধরি করে চলে এই করুণারই প্রসাদে।···আবার গান শেষ হবার পর সংবিত ফিরে এলেই চমকে উঠতাম—এ কার গান গাইলাম? এ গান তো আমার গাইবার অধিকার নেই। তাহলে এতো অভিভূত হলাম কেন?—নিজের সঙ্গে যেন লুকোচুরি খেলা চলতো।

এবার অন্যমনস্ক হবার পালা আমার। এমন ভক্তিনত চিত্ত বলেই কি 'তিমির দুয়ার খোলো', 'আমাদের যাত্রা হলো শুরু', 'তোমার সুরের ধারায়', গানগুলি তাঁর কণ্ঠে এমন অনুপম মাধুরীতে বিকশিত? যে কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীত যখনই তাঁর কণ্ঠে মনে হয়েছে এ যেন একান্তভাবে কানন দেবীরই গান। তবু তিনি বলছেন—রবীন্দ্রসঙ্গীত তাঁর কাছে একমেবাদ্বিতীয়ম নয়?

—আপনার নিজের প্রোডাকশনেও তো আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহার করেছেন। তবু এ গানের ওপর এত অভিমান?

—প্রোডাকশন করবার অনেক আগেই আমার অভিমানের বদলে তাঁর আশীর্বাদের মালা পাওয়া হয়ে গেছে।

—কেমন করে?

—সে এক স্মরণীয় ঘটনা। হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানিতে রবীন্দ্রনাথ রেকর্ড করতে আসছেন শুনে অগণিত মানুষের ভীড় জমেছিলো। দর্শনার্থীদের মধ্যে আমিও একজন। ভুলাদার ভাই বুলাদা আমায় সঙ্গে করে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। প্রণাম করতেই চিবুক ধরে আদর করে বললেন, কি মিষ্টি মুখখানিগো তোমার? তুমি গান গাইতে পারো? ওখানেই

অনেকে বলে উঠলেন গুরুদেব, ছবিতে আপনার একটি দুটি গান গেয়ে ও চারদিক মাতিয়ে তুলেছে ? উনি হেসে বললেন, 'তাই নাকি ? আমাকে একদিন তোমার গান শোনাও।' তারপর ভুলাদার ভাইকে ও অনিলদাকে (চন্দ) বললেন, 'একে একবার শান্তিনিকেতনে নিয়ে এস। খুব ভাব করে নেব।' সেই মহাপুরুষের স্নেহ-ঝরা দৃষ্টি ও স্পর্শের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিলো যেন—আলোর সমুদ্রে স্নান করছি—

—এরপর মনের মধ্যে আর কোনো অভিযোগ অভিমান কিছুই ছিলো না। মনে হলো তিনি আকাশ আর সে আকাশ এতই উঁচুতে যে কোনোরকম মালিন্যের মেঘ সেখানে পেঁছিতেই পারে না। অন্তর্যামী হলেই বুঝি আমার মতো দিনাতিদীনেরও কাছে এসেছিলেন সকল দুঃখকে শুভ করে দিতে। এ ঘটনার পর তাঁর গান গাইতে গেলেই মনে হতো…

—থামলেন কেন ?

—নাঃ থাক। বড্ড সাজানো কথা বলে মনে হবে।

—আপনি সাজানো বাঁচানো পোজের ধার ধারেন না—আপনার ভক্তমাত্রেরই এ খবর জানা। তবু যদি কেউ ভাবেন সে দায়িত্ব আপনার নয়।

—মনে হতো যেন তাঁকেই শোনাচ্ছি। অবশ্য এরকম ধারণার মূলে পঙ্কজবাবুর অবদানও বড় কম ছিলো না। রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রথম দীক্ষা ত ওঁরই কাছে। আর ওঁরই কাছে আমার প্রথম শেখা গান 'আজ সবার রং-এ' শেখাবার সময় কি সুন্দর করে যে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গানের দর্শন বুঝিয়ে দিতেন। এছাড়া উনি সব সময় আমায় স্মরণ করিয়ে দিতেন—মনে রেখো মুক্তি কথাচিত্রেই তুমি প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাবে অগণিত মানুষকে আর শোনাবে সেই গান যে গান স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে কবি উপহার দিয়েছেন এ ছবিতে গাইবার জন্য। এতবড় অধিকারের অমর্যাদা যেন না ঘটে। মনে রেখো তোমার জন্যই কবি এই গান দুটি দিয়েছেন।

—আমার জন্য কেন বলছেন ?

—নইলে তোমায় দিয়ে গাওয়ার কথাই বা আমার মনে এলো কেন !

—পঙ্কজবাবু শুধু বড় শিল্পীই নন। শিল্পী ছাড়াও শিল্প সম্বন্ধে যে বাস্তববোধ থাকলে—একাধারে গান গাওয়া ও শিক্ষা দানের নিশ্চিত সার্থক-পৌঁছানো যায় সেই বাস্তববোধ ছিলো বলেই পঙ্কজবাবুর গাওয়া এবং শেখানো প্রতিটি গান যুগের সীমা অতিক্রম করতে পেরেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার দায়িত্ব সম্বন্ধে এমন সচেতন হয়ে উঠতে পেরেছিলাম বোধহয় পঙ্কজ-বাবুর বারংবার উচ্চারিত সাবধানবাণীর দরুনই। নিখুঁত উচ্চারণ, সুরের প্রতিটি শ্রুতির স্পষ্টতা ছাড়াও গলার স্বরের বিভাগে কোন পর্দার কি সেন্টিমেন্ট, এসব দিকেও ওঁর সদাসজাগ দৃষ্টি থাকত।

—এখনই যে বাস্তববোধের কথা বললেন, সেটা কি রকম ? আর গান গাইতে গেলেই কবি শুনছেন মনে হবার লিংকটা আর একটু স্পষ্ট করুন না ?

—শ্রদ্ধেয় পঙ্কজবাবু বলতেন, কোনো গান গাইতে হলে সে গানের

রচয়িতা কি বলতে চাইছেন বুঝে নিতে হবে। মনে কর কবি এ গান দুটি দিয়ে যে কথা বলতে চান—তা তোমারই জন্য। দুজনের এই আণ্ডার-স্ট্যাণ্ডিংটা নিবিড় না হলে গানে রং ফোটে না। গানের বক্তব্য যে বলছে সে বোঝে আর যাকে বলবে সে। উনি ভারী সুন্দর একটা গল্প বলতেন। একটি গ্রামের মেয়ে বেশ কিছুটা লেখাপড়া শিখে শ্বশুরবাড়ী গেছে। সে যে লেখাপড়া জানে একথা তার স্বামী ছাড়া কেউ জানেন না। একবার স্বামী গেছেন বিদেশে। যাবার সময় স্ত্রীকে বলে গেছেন পক্ষকাল বাদে ফিরবেন। পক্ষকাল গেলো। কিন্তু তিনি ফিরলেন না। মেয়েটি তখন দুই পংক্তির একটি কবিতা লিখে শ্বশুরকে দিয়ে বলল—বাবা দেখুন ত এটা ওঁর খুব দরকারী কাগজ অথচ নিয়ে যেতে ভুলে গেছেন। আসতে যখন দেরী হচ্ছে পাঠিয়ে দিন। কাগজে লেখা ছিলো—

'মন পাব বলে মন সঁপেছিনু তোমা ধনে
বেদ পক্ষহীন তুমি নাহি জানি স্বপনে।'

শ্বশুর পড়ে কিছু বুঝলেন না। কোনো দরকারী কাগজপত্র ভেবে ছেলের কর্মস্থলে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি পড়েই স্ত্রীর মনের কথাটি বুঝে নিলেন। তারপর মৃদু হেসে উত্তর উঠালেন—

'ভুবনে ভুবন দিয়া বানে-চন্দ্র মিশাইয়া
রস তাহে নিঙাড়িয়া ভালবাসি বরাননে।'

বেদপক্ষহীনের অভিযোগের উত্তরে ছিলো।

বানে চন্দ্র মিশাইয়া—কিন্তু এই উত্তর প্রত্যুত্তরে ভাষা যে বলছে সে বোঝে আর যাকে বলছে সে।

—পংকজবাবুর এই গল্পটি আমার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলো। তারপর থেকে গাইবার সময় অনুভব করবার চেষ্টা করতাম—কি বলেছেন এ গানের স্রষ্টা? এ গানের মধ্যে এমন কি কথা আছে যা আমার উদ্দেশ্যে লেখা?

—কি বুঝতেন?

—গান দিয়ে যদি সে কথা বোঝাতে না পেরে থাকি বক্তৃতা দিয়ে বোঝাবার বিড়ম্বনার মধ্যে না ঢোকাই ভালো।—কাননদেবীর কণ্ঠে অভিমানের সুর।

—বক্তৃতার প্রশ্ন নয়। আপনার উপলব্ধিতে আমাদের ভাবকল্পনাকে ও একটু শানিয়ে নেবার ক্ষীণ আশায় বলছি।

আমার কথা বোধহয় কানেই গেলো না—অন্যমনস্কভাবে তাঁর অপরূপ আলোছায়াভরা কণ্ঠে বলে গেলেন অধিকাংশ সময় কিছুই বুঝতাম না। সেই অক্ষমতার বেদনাকে গোপন রাখবার জন্যই হয়ত বড় বেশী তীব্র হয়ে পড়তো এক-একটা একসপ্রেশন।

—আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু তার উল্টো। অন্তরবাসী দেবতা চোখের সামনে আবির্ভূত না হলে এ আবেগ কণ্ঠে আসতে পারে না।

—যদি এসে থাকেন তাঁর করুণাতেই এসেছেন—আমি তাঁর যোগ্য নই।

—যখনই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতাম মনে হতো রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস রচয়িতার আলোকসম্ভব এস্থেটিক সেন্স, এমন একটা অপার্থিব সৌন্দর্যচেতনা, যার তুলনা নেই। এই কথাটা যখন ঠিকমত ভাবতে পারি তখনই বুঝি আমাদের কত সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্মেছি। নৈলে এমন আকাশ ছোঁয়া কল্পনাকে ভাষার আঙিনায় কি এমন করে প্রত্যক্ষ করা যেতো?

—রবীন্দ্রনাথের গান নানাদিক থেকে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়। যতদিন না এ দৃষ্টি খোলে আমাদের মর্মগহনে বেজে ওঠে না উপলব্ধির সেই অনন্ত ঝংকার যার বরে অন্তরঙ্গ চেতনার সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটে।

ক্ল্যাসিক্যাল গানের প্রতি আমার প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও রবীন্দ্রসঙ্গীত বা ভাবসঙ্গীত গাইতে গাইতে আমার অনেক সময় এমন কথাও মনে হয়েছে যে ওস্তাদের সুরবিলাস আমাদের অন্তরে আবেশ জাগালেও সে আবেশ স্থায়ী হতে পারে না। এইজন্য যে সে কিছুতেই ভুলতে পারে না যে সমঝদার শ্রোতার সাড়া তার চাই-ই। কিন্তু এ সঙ্গীতে গুণী যেন ভাগবতে রূপান্তরিত হন। বাইরের শ্রোতা যদি নাও থাকে নিজের মনের সঙ্গে কথা বলারও একটা আনন্দ আছেই।

—আমি এখানে আপনার সঙ্গে একমত নই। কেন ভীষ্মদেবের 'তব লাগি ব্যথা' বা 'যদি মনে পড়ে'—শুনলে কি মনে হয় যে শিল্পী কারো বাহবা-র জন্য ব্যাকুল? এ-ও তো আত্মগত বেদনার পাথারে অবগাহন?

—ভীষ্মদেব বা আব্দুল করিমের কথা ছাড়ো। ভীষ্মদেববাবু যখন গাইতেন কবির ভাষায় মনে হতো, 'যেন কেহ নাই, কিছু নাই তার সমুখে।' কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব—তুমি যে গান দুটির উল্লেখ করলে রাগপ্রধান হলেও তারা ভাবসঙ্গীতের মধ্যেই পড়ে (এ সম্বন্ধে কানন দেবীর কাছে আর যা কিছু শুনেছি আধুনিক বা কাব্যগীতির পর্যায়ে তার সুবিস্তৃত আলোচনা করব)। আমি বলতে চেয়েছি ওস্তাদি গানে বিস্ময়ের হাজারো কারুকলা ফুটে উঠলেও বুকের মধ্যে অশ্রুসায়র তেমন করে দুলে ওঠে না যেমন উঠতো বা এখনও ওঠে 'গুঞ্জরিত কুঞ্জতলে' গাইলে বা শুনলে।

—জীবনের মন সঙ্গীতের ধর্ম ও গতানুগতিকতার খাদেই গড়িয়ে চলে না। সময়ে সময়ে অনন্যসাধারণ প্রতিভার হাতে পড়ে নূতনভাবে গড়ে ওঠে। ভাবসঙ্গীতে এমনই এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ।

—কথায়? না সুরে?

—দুয়েতেই। যদিও অনেক সময় আমার মনে হয়েছে তাঁর কথার কাছে সুরও যেন হেরে গেছে।

—যথা?

—যেমন 'যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার'—এখানে হৃদয়ের স্বতোৎসারিত অর্ঘ্য কথার মধ্যেই কি সুন্দরভাবে নিবেদিত!—এই প্রথম আমার কাছে সুরকে নিরর্থক মনে হয়েছে। কেন জানি না, বিদগ্ধ মহলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে

নির্ভেজাল মনের কথাটি বলার তাগিদেই বলছি, কথা এখানে সুরকে ছাপিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অন্যভাবে বলা যায়, শুধু কথাই যা বলেছে সুর তার চেয়ে বেশী কিছু বলতে পারে নি। আবার সেদিন রবীন্দ্রসদনে 'বড়ো বিস্ময় লাগে' গানটি কণিকার কণ্ঠে শুনে মনে হয়েছে সুর ও কথা যেন হরিহর আত্মা হয়ে উঠেছে। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে ভাবা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও না বলে পারছি না কণিকা তাঁর অনুপম কণ্ঠস্বর, ভঙ্গী, মীড় মূর্ছনা দিয়ে গানের আবেদনটিকে যেন পৌঁছে দিয়েছিলেন।

—রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতম আবেদনটি আপনার মতে কোথায় ?

—হৃদয়ের পরিবর্তনশীল অতি পেলব অনুভূতিগুলিকে গানের মুকুরে প্রতিবিম্বিত করায়—যা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ পারতেন না—

—আর একটু স্পষ্ট করে।

—আমাদের হৃদয়রাজ্যের অন্তঃপুরই সবচেয়ে গোপন। যেন ঘেরাটোপে ঢাকা। সে পর্দানশীনতা কতটুকুই বা ঘুচেছে? কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার স্পর্শমণি যেন এই গভীর রহস্যের পর্দা আচমকা সরিয়ে দিয়ে পরিচয় করিয়ে দেয় এমন এক আশ্চর্য অনুভূতির সঙ্গে যা আমাদেরই অন্তরেই আছে কিন্তু আমরা তার খবর রাখি না। সেটা হয়েছে এত সুকুমার সুললিত ভঙ্গীতে যে ঘোমটা খোলাটা মোটা হাতের নির্দয় কৌতূহলের স্পর্শ না হয়ে যেন দরদী হাতের আদর হয়ে উঠেছে।

—কোন গানটির কথা ভেবে এই মুহূর্তে এমন সুন্দর কথাগুলি বলছেন ?

—অনেক গান। যেমন ধর 'কিশোর ওগো তোমারই দ্বারে'। সুরের মধ্যে যেন নাট্যসঙ্গীতের স্থাপত্য পরিকল্পনা। প্রথমটায় সুর হলো বিলম্বিত লয়ে—তারপর 'লাগিল দোলে'র তালফেরতায় যত মাতনই লাগুক সেই মাতনের তালে তালে যখন 'অনেক দিন বুকের কাছে রসের স্রোত থমকি আছে'তে পৌঁছয় মনে হয় ঐ ক'টি কথার মধ্যেই যেন ডুবে থাকি।

যেমন প্রকৃত শিল্পী অতি-জানিত পর্দা-পরম্পরার মধ্যেই এমন স্বরবিন্যাস বেছে নিয়ে থাকেন যে বিন্যাস অতি সহজ হলেও শিল্পী হৃদয়ের কাছেই ধরা দেয়। অনেকটা যেন ইন্দ্রজাল বিদ্যার মতই। ব্যাপারটা কি দেখিয়ে দিলে জলের মতই সোজা হয়ে যায়—না দেখিয়ে দিলে সচকিত না হয়ে পারে না। এইখানেই রবীন্দ্রসঙ্গীতে মহাকবির সঙ্গে মহাশিল্পীর মিলন ঘটেছে।

—রবীন্দ্রসঙ্গীত বা শিল্পে যে বস্তুটি আমায় অবাক করে দেয় সেটা হলো এর মধ্যে সরলতা, সহজ সৌন্দর্য। মানুষ যুগ যুগের সাধনায় শিল্পকলায় সরলতার সৌন্দর্যকে অনুভব করতে শিখেছে সেই সরলতা যেন কবির কাছে আপনাকে ধরা দিয়ে বসে আছে। 'বুঝেছিলেম অনুমানে এ কণ্ঠহার দিলে কারে'—এত সহজ কথায় এত গভীরতাকে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ কি পারতেন এভাবে প্রকাশ করতে? এবং ঠিক এই কারণেই 'সুনীল সাগরে শ্যামল কিনারে' মনে হয় বড্ড বেশী সুবিন্যস্ত সৌন্দর্যে 'তুলনাহীনা'কে মেলে ধরেছেন। সৌন্দর্যের তিলোত্তমাকে মূর্ত করবার জন্য এখানে যেন খানিকটা সচেতন মনের প্রয়াস আছে। খুবই ভাল লাগে। কিন্তু তার

চেয়ে অনেক বেশী মন টানে কিছু বলব বলে এসেছিলেম। কিছু বলতে এসে হঠাৎ ছোট্ট একটা দৃশ্যের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে দাঁড়ানো। মুগ্ধতার আবেশ এখানে যেন ছবি হয়ে উঠেছে।

—আপনি খানিকক্ষণ আগে বলেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত যখন গাইতেন তখন একান্তভাবে এ গানকে ভালোবাসেননি। বেসেছেন এখন। এ কথাটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয় নি।

—খুবই সোজা ব্যাপার। হৃদয়ঙ্গম না হবার কি আছে? এক নম্বর তখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের এত শিল্পী ছিলেন না এবং সেই কারণেই এত ভ্যারাইটির গান শোনা যেতোনা। সেইজন্যই কিছুটা একঘেয়ে লাগতো একই ধরনের গান বারবার শোনার দরুন। দু নম্বর, সব সময় শুনতে শুনতে একটা সংস্কার গড়ে ওঠার ব্যাপারও আছে। সবচেয়ে বড় কারণ—তখন অন্য যে সব গীতিকার এবং সুরকার ছিলেন তাঁরা খুবই উচ্চমানের (তুলনামূলকভাবে বলছি না কিন্তু)। আর সেই কারণেই মনকে স্পর্শ করার ক্ষমতা তাঁদের গানের ছিলো। একটা পছন্দমত আশ্রয় সহজে পেয়ে গেলে মানুষ চট্ করে অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবে না। সুরসাগর পঙ্কজবাবু, রাইবাবু, অজয় ভট্টাচার্য, অনিল ভট্টাচার্য, বাণী কুমার, শৈলেন রায়, সজনীকান্ত, প্রণব রায়, কমল দাশগুপ্ত এবং তারও পরের গ্রুপে অনেক গীতিকার ও সুরকার অনুপম ঘটক, রবীন চ্যাটার্জি, নির্মল ভট্টাচার্য (হঠাৎ নাম মনে করতে পারছিনা সকলের)—সত্যিকারের আর্টিস্ট ছিলেন, তাই কল্পনার পরিধি এত বড়ই হোক আর এতটুকুই হোক তাঁদের গান, সুর মন কেড়ে নিতো।

—কিন্তু এখন? কি গীতিকার কি সুরকার (কিছু ব্যতিক্রম অবশ্য সুরকারদের ক্ষেত্রে আছে) দুই-এর জগতেই প্রতিভার দুর্ভিক্ষ এবং সেই কারণেই কল্পনার দৈন্য দেখা দিয়েছে। তাই মার্জিত শিক্ষিত মন এসব গান শুনে অস্থির হয়ে উঠছেন এবং যতবেশী তিক্তবিরক্ত হচ্ছেন ততই প্রবলবেগে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। সেই কারণেই বোধহয় আধুনিক গানের চেয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরেরই এখন বেশী আকর্ষণ। আমি শিল্পী-দের ছোটো করছিনা। এই বাংলাদেশের মত এত বেশী সংখ্যক শিক্ষিত সুকণ্ঠ পৃথিবীর আর কোনো দেশে আছে কিনা জানিনা। কিন্তু ভাল গানের অভাবে এমন সব কণ্ঠের গানও ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এ অথচ তথাকথিত পপ্ সং (সত্যিকারের পপ্ সং জানেন ক'জন?) ঢং-এর সুর রচনারও বিরাম নেই আর তারই সঙ্গে মানিয়ে অতি সস্তাদরের কথা বসাবার উৎসাহেরও অভাব নেই। যেখানে মানুষ পারসপেকটিভ হারিয়ে বসে থাকে আর্ট কি বস্তু বোঝাবার চেষ্টাই বিড়ম্বনা। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া গতি কোথায়?

—রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

—কোনো সুরকার যখন অজস্র সুর রচনা করে যান বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তার মধ্যে তাঁর সঙ্গীত চিন্তার একটা ছাপ থাকেই। এইটেই তাঁর গায়কী আর আমি মনে করি রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরের মত কথারও একটা গায়কী আছে এই দুটিকে মিলিয়েই রবীন্দ্রসঙ্গীত। এই দুটিকে যিনি যতবেশী ঘনিষ্ঠ করে

তুলে রবীন্দ্র উপলব্ধির দ্বারে শ্রোতাদের মনকে পৌঁছে দিতে পারবেন তিনিই ততখানি সুস্পষ্ট রূপে গায়কী সৃষ্টির গৌরব অর্জন করবেন। রবীন্দ্র গায়কীর এই বৈশিষ্ট্য ঠিক কি সেটা বুঝিয়ে বলা কঠিন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। মুক্তির পর রবীন্দ্রসঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে অনাদিবাবুর কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতে শুরু করি।

—পঙ্কজবাবুর কাছে নয় কেন? তিনিই ত এ ক্ষেত্রে আপনার পথদ্রষ্টা?

—পঙ্কজবাবু তখন ছবির কাজ, রেডিও রেকর্ড-এর পরিচালনা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত। আলাদা করে শেখাবার মত অবকাশ তাঁর ছিলো না। যাই-হোক অনাদিবাবু আমায় খুবই স্নেহ করতেন আর শেখাতেনও ভারী যত্ন করে।—মনে পড়ে উনি কোনো গান শেখালে সে গান গাইতে গিয়ে যদি ভাবাবেগে অত্যধিক মীড় বা অলঙ্কার লাগিয়ে ফেলতাম উনি হেসে বলতেন, এটা করেছ সুন্দর কিন্তু এখানে এ জিনিস চলবে না।

—কেন চলবে না বুঝিয়ে দেবেন? অল্প বয়সের অহমিকার ফেরেই তর্ক তুলতাম।

—সব গানেরই একটা নিজস্ব জাত আছে তাকে বাঁচিয়ে গাওয়া কর্তব্য।

—এ কথা উনি বলেছিলেন আবার অনেক পরে যখন আরও অনেক বেশী অলঙ্করণ করে গেয়েছি উনি তারিফই করেছেন। আমি প্রশ্ন করেছি, আমি এত কাজ দিয়ে গাইলাম আপনি আপত্তি করলেন না?

উনি বললেন, এসব কাজ গানের ভাবের সঙ্গে এত সঙ্গতি রেখেছে যে আপত্তি করবার কোনো উপায় নেই। তোমার গানে এখন অসম্ভব ম্যাচুরিটি এসেছে। আর যা বলেছিলেন না বলাই ভালো। কারণ তিনি এখন নেই। এসব কথা বানানো বলে মনে হতে পারে। যাক, যা বলছিলাম, আমি আগেও যতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে গাইতাম এখনও তাই। কিন্তু এই ম্যাচুরিটি কখন কিভাবে গানে এসে আগের গানের সঙ্গে তখনকার গানকে আলাদা করে দিলো সে রহস্য সেদিনও যেমন বুঝিনি, আজও বুঝি না। তাই গায়কী, রাবীন্দ্রিক —এসব নিয়ে আমায় কোনো প্রশ্ন না করাই ভালো। আমার কাছে ও সবের কোনো অর্থ নেই।

—সকলে এত শ্রদ্ধা ও আগ্রহে আপনার গান শুনতে চান আপনি তাঁদের নিরাশ করছেন কেন?

—ঐ শ্রদ্ধা ও আগ্রহকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই।

—তার মানে?

—সব শিল্পীরই উচিত নিঃশেষ হবার আগেই কর্মক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়ে অনাগত যুগের শিল্পীদের তৈরী হবার জায়গা করে দেওয়া। তাদের সৃষ্টিতে যৌবনের স্বপ্নের রং জ্বলজ্বলে থাকতে থাকতে চলে এলেই সে ছবি অনাহত গৌরবে সকলের মনে আঁকা থাকবে। অতীত গৌরবের প্রতিধ্বনি হয়ে বেঁচে থাকায় আমার কোনো লাভ নেই। শিল্পের ক্ষেত্রে আমি অনন্ত যৌবনের ছবিতেই বিশ্বাসী।

এই প্রসঙ্গেই বলি, এখন যদি গাইতাম সে গানে আগেকার রং, আবেগ,

মাদকতা কখনই ফুটে উঠতে পারত না। কিন্তু বিদগ্ধ শ্রোতারা আমার বয়সের প্রতি সম্ভ্রম দেখিয়ে বলতেন 'বাঃ! কানন দেবী এখনও কি সুন্দর গান।' তোমরাও ভদ্রতা করে কাগজে সুখ্যাতি করে দু-পাঁচ কথা লিখতে। আর সেইটেই হতো আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। শিল্পীকে শ্রোতাদের সৌজন্যবোধের উপর নির্ভর করে গাইতে হয়—এমন স্টেজে পৌঁছবার আগেই তাঁদের আসর থেকে সরে আসা উচিত। ক্ষমতার শেষপ্রান্তে এসেও মঞ্চ আঁকড়ে পড়ে থাকার সখ পৌঢ়ের লালসার মতই ভয়াবহ ও ঘৃণ্য।

শুনেছি আজকাল অনেক শিল্পী কাগজের কর্তৃপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন, কেন তাঁর চেয়ে অন্যকে বেশী কমপ্লিমেন্ট দেওয়া হলো অথবা তাকে কেন যথেষ্ট পাবলিসিটি দেওয়া হলো না? শুনে এত লজ্জা করে। এঁরা তো আমারই আত্মীয় তুল্য? কেন এঁরা ভুলে যান গান শুনে গুণগ্রাহীরা গুণের প্রতি সম্মান দেখিয়ে জয়মাল্য পরিয়ে দেওয়ায় যতখানি গৌরব ঠিক ততখানি অগৌরব কলহ দিয়ে জোর করে প্রশংসা আদায় করে নেওয়ায়? 'অপরাজিত' গল্পের কবি রাজসভার অবিচার নীরবে মেনে নিয়ে চলে এসেছিলেন বলেই তাঁর মরণমুহূর্তে অভিষিক্ত হয়ে উঠেছিলো স্বয়ং রাজকুমারীর হাতের বরণ-মালায়।—এসব কথার উত্তর কবি কতদিন আগেই রেখে গেছেন তাঁর অজস্র সৃষ্টিতে। একটু থেমে আত্মগতভাবে শিল্পী বলে চলেন, তাই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথকে বহুমুখী প্রতিভা না বলে সর্বতোমুখী প্রতিভা বলাই ভালো। তাঁর সীমাহীন দাক্ষিণ্যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের রাজপথগুলিকেই নয়, অলিগলিকেও আলোকিত করে গেছেন। সমৃদ্ধ করে গেছেন রসালো ফুলে ফলে পাতায়।

—আপনি যে যুক্তিই দিন আপনি শোনবার মতো গান এখনও গাইতে পারেন না—একথা আমরা বিশ্বাস করি না।

—এখনকার গান আপনমনে গাইবার। বড়জোর গোপালকে (ওঁর নাতি) শোনানো যায়। সভার গান নয়। তারপর একটু হেসে বললেন, এখন এতো শক্তিশালী শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছে যে এ কণ্ঠের গান ধ্বনিত না হলেও রসের হানি ঘটবে না। কণিকা, সুচিত্রা, নীলিমা, মায়া, সুবিনয়বাবু, জর্জ বিশ্বাস, হেমন্তবাবু এবং আমার অন্যসব ভাইবোনেরা—তাঁদের অপূর্ব কণ্ঠের আবেগ দিয়ে আজ সারা দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত করেছেন। এঁদের স্বপ্নে, কল্পনায় আমিও মিশে আছি। আর 'অমৃত'-এর কর্তৃপক্ষকে সব শিল্পীদের হয়ে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, তাঁদের সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে আপন আপন বক্তব্যকে নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করবার স্বাধীনতা দেবার জন্য। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যান্য অনেক অবদানের মতো এ অবদানও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভবিষ্যৎ?

শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই। মানুষ প্রকৃতিতে বহুমুখী। একই বিষয়ে চিরদিন অটলপ্রতিষ্ঠ থাকতে পারে না। নানামুখী রুচির তৃষ্ণা মেটাবার তাগিদেই হয়তো বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে কিছুদিন সরে যেতে

পারে। ক্ষণবিরতির পরই আবার নতুন প্রাণশক্তি নিয়ে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসগ্রহণে আগ্রহী হবে। 'তোমায় নতুন করে পাবো বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ'।

এই বিষয়ে আর একটি বক্তব্য, প্রথম সারির শিল্পীদের বাদ দিলে পরবর্তী যুগের শিল্পীরা সত্যিই বড় অসহায়। এ সম্বন্ধে কণিকা ও মায়ার সঙ্গে আমিও একমত।

পরবর্তী যুগের শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে তোলার কাজে সরকারী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসুন। অর্থ সামর্থ সবরকম আনুকূল্য দিয়ে এদের উদ্যমকে সার্থক করে তুলুন। নিজেদের চেষ্টায় অনেক বাধা ঠেলে তারা এতদূর এগিয়ে এসেছেন। বাকীটুকু আপনারা করলেনই বা।

গত সপ্তাহে কলামন্দির ও রবীন্দ্রসদনের দুটি আসরে ঋতু ও সুমিত্রার (সেন) গান শুনলাম! দু'জনেই অপূর্ব। একজনের উঁচুপর্দার খোলা গলা, যাকে বলে সর্বালঙ্কারভূষিতা। দাপটে, বৈভবে একেবারে ঝলমল করছে। সুমিত্রা তার বিপরীত। শুনে তুলনা দিতে ইচ্ছে করছিলো কবিরই একটি কবিতার চরণ দিয়ে 'এসো সুন্দর নিরলংকার।' অনলংকৃত সুর, কিন্তু কি মধুর আর ভাবসিক্ত। এমনই আরও কতো রত্ন নিশ্চয়ই আছে। বনানী, স্বপ্না, বাণী, গীতা ঘটক। সেদিন শর্মিলা রায়ের গানও ভারী ভালো লাগলো। সবাইয়ের গান তো সবসময় শোনা হয় না। অঘ্য'র গান খুব প্রাণবন্ত। সুশীলের গান একবারই শুনেছি। আরো শুনতে ইচ্ছে করছিলো। ঈশ্বর এঁদের সকলের স্বপ্নকে সার্থক করুন। কোনো অবাঞ্ছিত বাধায় এঁদের তারুণ্য যেন বিড়ম্বিত না হয়। এঁদের মধ্যেই তো আমরা বেঁচে থাকবো।

দেবব্রত বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জমিদারী সম্পত্তি নন। তিনি সকলের।

এর আগে আর একবার দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে ইন্টারভ্যু করেছি। কিন্তু তাকে ইন্টারভ্যু বলাতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিলো। কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাঁর ধ্যানধারণা সম্বন্ধে এতে তিনি প্রায় কিছুই কবুল করেননি। তাঁর হৃদয়ের গোপন-গহন কোণে তিনি গানের প্রিয়তমকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। ভীমগীতায় (পরশুরামের) পড়েছিলাম—ভীমের মতে অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উদ্দীপ্ত করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অত লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দেবার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কেশাকর্ষণের কথা মনে করিয়ে বা যে কোনো উপায়ে তাঁকে রাগিয়ে দিলেই গাণ্ডীব নিয়ে এক লাফে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এক্ষেত্রে অনেকটা তাই হয়েছে।

বহুদিন ধরে বহু চেষ্টায় জর্জদার কাছ থেকে যে কথা আদায় হয়নি, সেই বন্ধ দরজার দুয়ারটা হঠাৎ যেন দড়াম করে খুলে গেলো তাঁর বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক কিছু সমালোচনার ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিক্রিয়ায়। নিজের সঙ্গীত-ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য, মর্যাদাবোধ, আবেগ, আনন্দ, বিদ্রোহে যিনি অনন্যসাধারণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন জনপ্রিয়তার শিখরে তিনি এই অভিযোগ মেনে নিলেন বলেই কি স্তব্ধ? একদিন ঠাট্টা করেই জিজ্ঞেস করলাম, কি জর্জদা, আপনার বলিষ্ঠ মনের সাহস কি শুধুই অ্যাপিয়ারেন্স? এর মধ্যে রিয়েলিটি কিছু নেই? জর্জদা তাঁর স্বাভাবিক তাচ্ছিল্যের ঢংয়েই বললেন, দ্যাহেন তাসের দেশের সম্পাদকীয় কলমের আস্ফালন কৌতুককরই। ওর প্রতিবাদ করাটা সময়ের অপচয় বলেই আমি মনে করি। তবে আপনি যদি কিছু জানতে চান আহেন একদিন।

গেলাম। —বলুন কি জানতে চান? —আপনার যে বিপুল বিরাট গীতার ভাষায় আপূর্যমান জনপ্রিয়তা, এ তো শুধু অশিক্ষিত শ্রোতার গদগদ ভাবালুতার ওপরেই দাঁড়িয়ে নেই? বিদগ্ধ রসিক রবীন্দ্রসঙ্গীত ও সাহিত্যে ওয়াকিবহাল পণ্ডিতব্যক্তিরও আপনার গান শুনে চোখ ছলছলিয়ে উঠতে দেখেছি। আমার যেদিন ভেসে গেছে চোখের জলে—শুনে রবীন্দ্রসদনের আসরে সেই থমকে যাওয়া পরিবেশ তো এরই মধ্যে ভুলে যাবার নয়।

একরাশ পান মুখে ফেলে জর্জ বিশ্বাস চশমা চোখে দিয়ে একটি ফাইল বের করে অনেক নামী লোককে লেখা তাঁর কয়েকখানি চিঠি বের করে শোনালেন। এর মধ্যে শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে (বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ডের সম্পাদক) লেখা চিঠিও ছিলো। এগুলির মধ্যে একাধারে আমার তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের কথার জবাব এবং জর্জদার নিজের বক্তব্যও পাওয়া গেলো। তাঁর

গানেরই মতো নির্ভীক ও বেপরোয়া ভঙ্গীতে। তারই কিছু কিছু তুলে দিচ্ছি। প্রথমে কয়েকটি চিঠি থেকে—

ইতিহাসকে সাক্ষীরূপে দাঁড় করিয়ে কোনো কিছু বক্তব্য পেশ করার রীতির প্রচলন আছে দেখেছি। যাঁরা এইসব সাক্ষীর সাহায্য নেন আমার মনে হয় তাঁদের মনে নিজেদের ইন্টেলেকচুয়ালিজমকে বিদগ্ধ সমাজের চোখের সামনে প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টাই প্রচ্ছন্ন থাকে, সমস্যার সমাধান হোক বা না হোক। হাইকোর্টের বিচারকের আসনের মতো কোনো ব্যবস্থা তো এইসব ব্যাপারে থাকে না। সুতরাং বাগ্মিতাই আসল।

তবে এই ব্যাপারে একটি দৈববাণীর সন্ধান আমি পেয়েছিলাম। এই দৈব-বাণীর সঙ্গে দেবতাদের কোনো সম্পর্ক নেই; অথবা এটা কোনো ঐশ্বরিক ব্যাপারও নয়। তবে এটি আমার বহু পরীক্ষিত সত্য। যদিও কি করে পেয়েছিলাম সেকথা প্রকাশ করবার অধিকার আমার নেই। —যে বাণীটির সন্ধান আমি পেয়েছি তা হলো এই যে, এই দুনিয়াতে যা কিছু ঘটে তা ঘটছে অদৃশ্যলোকে অবস্থিত একটু ভৌতিক শক্তির কলকাঠির নাড়াচাড়ার ফলে। এই কলকাঠি নড়ে আপন খেয়ালখুশীতে। কোনো ধরনের প্রার্থনা অথবা উৎকোচ এই শক্তিকে প্রভাবান্বিত করতে পারে না। এই ভৌতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণে একটি নীতি আদিকালে চালু হয়েছিলো। সেই নীতি চলছে এবং চলবে। তা—হলো বলং বলং বাহুবলং। অর্থাৎ জোর যার মুলুক তার। প্রথমে ছিলো ব্যক্তিগত জোর। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দলগত জোরের উৎপত্তি ঘটেছে। এই নীতি অনুসারে যারা দুর্বল তারা বলীয়ান দ্বারা নিগৃহীত হয়। অতীতে হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হয়তো হবে। অন্য দেশের কথা জানি না। তবে ভারতের মাটিতে বহু গুণীজ্ঞানী ব্যক্তি যেমন গৌতম বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্যদেব এবং রবীন্দ্রনাথ ও আরো অনেকে চেষ্টা করেছেন এই নীতিটিকে বানচাল করতে। কিন্তু তাঁরা কিছুই করতে পারেননি।

এই ভৌতিক শক্তির কলকাঠির জুরিসডিকসন এতদিন ছিলো ধর্মনীতি, রাজনীতি এবং অর্থনীতি। হালে দেখছি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে রাবীন্দ্রিক নীতিটিও এই কলকাঠির আওতায় এসে পড়েছে। ফলাফল কি হবে বোঝা যাচ্ছে না।

সম্প্রতি এক বন্ধু অসঙ্কোচেই মন্তব্য করেছেন ১। আপনি দারুণ জনপ্রিয়, ২। আপনার কণ্ঠের ভক্তসংখ্যা অগণ্য, ৩। আপনার কিছু উচ্চারণে কারো আপত্তি আছে, ৪। কোনো কোনো গানে আপনার কোনো কোনো ভক্ত কোনো কোনো বাজনার আধিক্য অপছন্দ করছেন, ৫। অনেকেই কোনো সময়ে এই বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার পছন্দ করেননি। ৬ নম্বরে লেখিকার বক্তব্য ছিলো—আপনার গানে রাবীন্দ্রিকতাকে ছাপিয়ে দেবব্রতী ঢং-ই অনেক সময় প্রকট হয়ে ওঠে বলে অনেকের অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দুটি মন্তব্যের উল্লেখ করছি। ১। সুরকারের সুর বজায় রেখেও এক্সপ্রেশনে কমবেশী স্বাধীনতা চাইবার এক্তিয়ার গায়কের আছে। ২। খুব

মুষ্টিমেয় সংখ্যক শিল্পী-গায়কের ওপরে থাকবে এর দায়িত্ব।

ভাষাতত্ত্ব এবং শব্দতত্ত্ব নিয়ে রবি ঠাকুর দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর মাথা ঘামিয়েছেন। সুতরাং শব্দপ্রয়োগে তাঁর নৈপুণ্য সন্দেহ করবার কোনো অবকাশ নেই। কোথায় কি ধরনের শব্দ প্রয়োগ করলে বাক্যের অর্থটি সকলের কাছে বিশদভাবে ফুটে উঠবে এই কায়দাটি উনি খুব ভালোভাবেই রপ্ত করেছিলেন। স্বাধীনতা চাইবার এক্তিয়ার গায়কের আছে বলার কালে শুধু-মাত্র 'গায়ক' শব্দটি ব্যবহার করলেন। 'শিল্পী' শব্দটি নিশ্চয়ই তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিলো। কিন্তু তবু তিনি ঐ শব্দটি বাদ দিলেন। অথচ দায়িত্ব দেবার বেলায় উনি দায়িত্ব দিতে চাইলেন খুব মুষ্টিমেয় সংখ্যক শিল্পী-গায়ককে অর্থাৎ যিনি শুধুমাত্র গায়কই নন, শিল্পীও। রবিবাবু ইচ্ছে করলে 'সু-গায়ক' বা ঐ জাতীয় অনেক কিছু শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে শিল্পী-গায়ক কথাটি ব্যবহার করলেন। 'শিল্পী' কথাটিকে বিশেষণরূপে ব্যবহার করে হয়তো একটু মজা পেয়েছিলেন।

আমি শুনেছি মানুষের দেহের ভিতরে নানাধরনের জটিল যন্ত্রপাতি আছে। কিন্তু দেখেছি তার ওপরেও আরো ঘোরতর জটিল ব্যাপার আছে তা হলো : ১। ইন্টেলেক্ট, ২। ইমোশন। উদাহরণ দিয়ে দিয়ে নিশ্চয়ই বোঝাতে হবে না যে এই ইন্টেলেক্ট এবং ইমোশন সবার এক নয়। এবং এইগুলির বণ্টন ব্যাপারে মানুষের কোনো হাত নেই। ইন্টেলেক্ট এবং আবেগ গ্রহণ করার শক্তি বা ভঙ্গি নানাধরনের মানুষের ক্ষেত্রে নানাধরনের। আর আবেগ নিজের তাগিদেই প্রকাশিত হয় নানা ভঙ্গিতে। কেউ কাঁদে, কেউ আহা বলে স্তব্ধ হয়ে যায়। আমার যৌবনকাল কেটেছে নানান পরীক্ষানিরীক্ষায়। যাঁরাই ঘরে আসতেন তাঁদের নানা ধরনের গান শুনিয়ে মতামত সংগ্রহ করতাম। নানা ভঙ্গিতে গেয়ে নানান ব্যাখ্যার আলোয় এক্সপ্রেস করে কিভাবে গান গাইলে শ্রোতাদের বুদ্ধি অথবা আবেগকে ধাক্কা দেওয়া যায় সেই কথাটাই অনুভব করবার চেষ্টা করেছি। অনেক সময় সফল হয়েছি। অনেক সময় হইনি। বিভিন্ন মানুষের ইন্টেলেক্ট এবং ইমোশন বিভিন্ন ধরনের বলেই ফল একরকমের হয় নি। তাছাড়া যদি আমি কখনও গান গেয়ে শ্রোতার মনকে নাড়া দিতে না পারি তার জন্য নিজের অক্ষমতাকেই দায়ী করি। অন্য কাউকে দোষী করি না।

যে কথাটি অকপটে স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই সেটি হলো এই যে মঞ্চে গাইবার ব্যাপারটিকে আমি একটা সিরিয়াস ক্রিকেট ম্যাচের মত গ্রহণ করেছি। আমি গান শোনাতে বসি রীতিমত খেলোয়াড়ের মনোবৃত্তি নিয়ে। আমার গলার আওয়াজ আমার ball. শ্রোতাদের ইন্টেলেক্ট, ইমোশন আমার সামনে স্টাম্পের মত দাঁড়িয়ে। ফাস্ট, স্লো, স্পিন, ব্রেক ইত্যাদি নানা ধরনের গলার আওয়াজ ছুঁড়ে ছুঁড়ে শ্রোতাদের ইন্টেলেক্ট ও ইমোশনকে ধাক্কা মারবার চেষ্টা করি। ভাগ্য ভালো হলে উইকেট পাই, না হলে পাই না। মাঝে মাঝে গ্রিপ পাই না বলে বল ওয়াইড চলে যায়। শুনে হয়ত হাসবেন এখনও মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও নারভাস হয়ে পড়ি। তখন আমি গ্রিপ

পাই না। তার জন্য দুঃখ হলেও লজ্জা নেই। কারণ মানুষের সব এক্সপেরিমেন্ট সবসময় সাকসেসফুল হয় না। তার জন্য নিজেকে পরাজিত মনে করবার যেমন কারণ নেই তেমনই অধিকার নেই শ্রোতাদের অজ্ঞ বলে গালিগালাজ করবার।

এই প্রসঙ্গে জর্জ বিশ্বাস নিঃসংকোচে নিবেদন করছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনার দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি অন্য কারো চেয়ে কম সচেতন নই।

বিশ্বভারতী বোর্ডের শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের কাছে লেখা জর্জদার একটি চিঠির বক্তব্য এ বিষয়ে অনেক আলোকপাত করবে বলে তার থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি।

'ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম হয়েছিলো বলে বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতচর্চার ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসে মনটা আমার রসিয়ে উঠেছিলো। ১৯২৭ সালে কলেজের পড়ুয়া হয়ে কোলকাতায় এসে যখন স্থায়ীভাবে কোলকাতার বাসিন্দা হয়ে উঠেছিলাম সেই সময় থেকেই ব্রাহ্ম সমাজের পাল্লায় পড়ে বহু ব্রাহ্ম এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত আমায় শিখতে এবং গাইতে হয়েছে। যাদের কাছে শিখতাম তাদের কেউই এখন জীবিত নেই। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নানা উৎসবে গানের মহড়ায়ও আমার যাতায়াত ছিলো। হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্সে চাকুরী করবার সময় স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। সেই সূত্রে পাম্ অ্যাভিনুর বাড়িতে স্বর্গীয় ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর স্নেহ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। তাঁর কাছে বহু গান শুনেছি এবং শিখেছি। আমার মনে আছে পিয়ানো বাজিয়ে রবীন্দ্রনাথের অনেক গান নিয়ে তিনি নানারকামের এক্সপেরিমেন্ট করতেন। ছাপানো স্বরলিপির সামান্য অদলবদল করে সে সব গান আমাদের শেখাতেন ও সে সম্বন্ধে আমাদের মতামতও জিজ্ঞেস করতেন। কতকগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীতের হার্মোনাইজড করা সুরে তিনি আমাদের দিয়ে নানা অনুষ্ঠানে গাইয়েছিলেন। 'আমি চিনিগো চিনি' গানটির হার্মোনাইজড স্বরলিপি তৈরি করে আনন্দসঙ্গীত পত্রিকাতে প্রকাশ করেছিলেন। এই গানটি হার্মোনাইজডভাবে বহু অনুষ্ঠানে আমাদের গাইতেও হয়েছে। তাছাড়া রথীদা ও চারুবাবু যে আমার গান অত্যধিক পছন্দ করতেন তাতো আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন। অনাদিদার দৌলতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে গান শুনিয়ে খুশী করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। এতো কথা বলার উদ্দেশ্যে এই যে বাল্যকাল থেকে শুরু করে নানা ধরনের রবীন্দ্রসঙ্গীত নানা ভাবে গাইতে গাইতে এবং রেকর্ড করে আমার জীবনের ৬৩ বছর কেটে গেলো। কাজে কাজেই যতই বিনয় করি না কেন এটুকু না বলে থাকতে পারছি না যে, সুষ্ঠুভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করার ব্যাপারে আমার বেশ কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমার রেকর্ড করা গানগুলি যেভাবে রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রসঙ্গীতরসিক ব্যক্তিদের দ্বারা সমাদৃত হয়েছে তাতে আমার মনে একটুকু বিশ্বাস জন্মেছে যে, নিছক সস্তা রুচিতে সঙ্গীত পরিবেশন করে সেটা সম্ভব হয়নি। ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণদের এবং নবীনদের

অকুণ্ঠ ভালোবাসা আমি সারাজীবন পেয়েছি।

কিন্তু এটুকুও না বলে পারছি না যে, আমার দৃঢ়বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী এবং সুরের সমন্বয়ের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতালব্ধ গায়নশৈলীর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের গানের মর্ম গভীরভাবে উদ্ঘাটিত করে ব্রাহ্মসমাজের বাইরে যে অসংখ্য রবীন্দ্রসঙ্গ তানুরাগী রয়েছেন তাঁদের ইন্টেলেক্ট ও ইমোশনকে গভীরভাবে নাড়া দিতে আমি সক্ষম হয়েছি। এই প্রসঙ্গে বেশ কয়েক বছর আগেকার একটি ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করছি। কোলকাতার বেশ নামজাদা কয়েকজন উচ্চাঙ্গসঙ্গীতশিল্পীদের একটি আসরে একজন বিদেশী (য়ুরোপীয়) কম্পোজারকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিলো। সেই আসরে আমিও উপস্থিত ছিলাম। বিদেশী কম্পোজার তাঁরই একটি যন্ত্র-সঙ্গীতের অর্কেস্ট্রার টেপ-করা রেকর্ড শোনালেন। বাজানো শেষ হয়ে গেলে অনেকেই নানা ধরনের প্রশংসার বাণী বর্ষণ করলেন। একজন নাম-করা বাঙালী যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পী এক কোণায় বসে কি যেন ভাবছিলেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে তিনি মুখ খুললেন। তিনি যা বলেছিলেন তার ভাবার্থ হলো এই যে, বাজনা শুনে তাঁর মনে হচ্ছিলো তাঁরা যেন দল বেঁধে কোনো এক মরুভূমির ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তুমুল ঝড় উঠলো। ঝড়ের বেগে বালুকণা উড়তে লাগলো। চোখ প্রায় অন্ধ। কিছুক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে ঝড় থেমে গেলো। আবার তাঁরা চলতে লাগলেন। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রি। অপূর্ব শান্ত পরিবেশ। তাঁর কথা শেষ হতেই বিদেশী কম্পোজার হঠাৎ প্রায় লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন,—আমার এই কম্পোজিশনটির নাম ক্যারাভান।' আমি অবাক। এই যন্ত্রশিল্পীটি হলেন শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র। তিনি নিজে যন্ত্রী। তাই বাদ্যযন্ত্রের ভাষা তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয়েছিলো।

রাধিকাবাবুকে কোনোদিন পাশ্চাত্য সঙ্গীত নিয়ে চর্চা করতে দেখিনি। শুনিওনি। অথচ য়ুরোপীয় বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনির ভাষা তাঁর হৃদয়ে যে আবেগ সৃষ্টি করেছিলো তা দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি। রাধিকাবাবুর হয়ত এই ঘটনাটির কথা মনে নেই। কিন্তু সেদিন ঘটনাটি আমার মনে যে দাগ কেটে-ছিলো তা কোনোদিনও মলিন হবে না। সেদিন আমার মনে হয়েছিলো বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন আওয়াজ এবং বিভিন্ন সুর আমার মনেও বিভিন্ন আবেগ সৃষ্টি করে। যেমন সানাই বাঁশী অথবা অন্য কোনো তারযন্ত্র। কিভাবে এবং কেন এই আবেগ সৃষ্টি হয় তা বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর থেকে আমি অনেক ভেবেছি। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা এ বিষয়ে আমায় প্রেরণা জোগালো। তিনি বলেছিলেন: য়ুরোপীয় সঙ্গীতে যে হার্মনি অর্থাৎ স্বরসঙ্গতি আছে আমাদের সঙ্গীতে তাহা চলিবে কিনা, প্রথম ধাক্কাতেই মনে হয়— না ওটা আমাদের গানে চলিবে না। ওটা য়ুরোপীয়। সঙ্গীতে ব্যবহার হয় বলিয়াই যদি তাকে একান্তভাবে য়ুরোপীয় বলিতে হয় তবে একথাও বলিতে হয় যে, যে দেহতত্ত্ব অনুসারে য়ুরোপে অস্ত্রচিকিৎসা চলে সেটা য়ুরোপীয়, অতএব বাঙালীর দেহে ওটা চালাইতে গেলে ভুল হইবে।

ইহার অভাবে আমাদের সঙ্গীত যে অসম্পূর্ণ সেটা যদি অস্বীকার করি তবে তাহাতে কেবলমাত্র কণ্ঠের জোর বা দম্ভের জোর প্রকাশ পাইবে। তবে কিনা ইহাও নিশ্চিত যে আমাদের গানে হার্মনি ব্যবহার করিতে হইলে তার ছাঁদ স্বতন্ত্র হইবে।

যাই হোক, আমাদের সঙ্গীতের একটা বড় মহল ফাঁকা আছে। এটা যদি দখল করিতে পারি তবে এইদিকে অনেক পরীক্ষা ও উদ্ভাবনার জায়গা পাইব। যৌবনের স্বভাবসিদ্ধ সাহস যাঁদের আছে এবং লক্ষ্মীছাড়ার খ্যাপা হাওয়া যাদের গায়ে লাগিল এই একটি আবিষ্কারের ক্ষেত্র তাদের কাছে পড়িয়া রহিল। আজ হোক কাল হোক এক্ষেত্রে নিশ্চয় লোক নামিবে।

—লক্ষ্মীছাড়ার খ্যাপা হাওয়া আমার গায়ে লাগেনি। কিন্তু ইন্দিরা দেবী-চৌধুরানীকে এই ব্যাপারে নানা ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করতে আমি দেখেছি। রাধিকাবাবুর কথাগুলি আমার একটা ভাবনার যোগান দিয়ে দিলো। পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞানই নেই। কিন্তু ভেবে দেখেছি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন ধ্বনি এবং সুর মানুষের হৃদয়ে যে আবেগ সৃষ্টি করে তা তো কোনো দেশকালের নিয়ম মানে না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিজস্ব একটি আবেগ-সৃষ্টিকারী ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতাটিকে ধার দিয়ে আরো বেশী জোরালো করে শ্রোতাদের ইন্টেলেক্ট এবং ইমোশনগুলিকে আরো গভীরভাবে নাড়া দেবার উদ্দেশ্যে আমার রেকর্ড করার সময় দেশী-বিদেশী নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রগুলির ধ্বনির সাহায্য নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমি করেছি। ঐ বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি .আমার নিজের মনে যে আবেগ সৃষ্টি করে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের মনের মত ছাঁদে সুরের জাল বুনে গানগুলির সুরা-রোপের কাঠামো জখম না করে ঐ সব বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য আমি নিয়েছি। এবং অকপটে স্বীকার করছি যে, গানগুলি গাইবার সময় এক্সপ্রেসনের স্বাধীনতা আমি নিয়েছি। কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই ব্যাপারে পথ দেখিয়েছেন। বাদ্যযন্ত্রের সুর সাজিয়ে গানের রূপ ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে আমি কতখানি সফল হয়েছি সে বিচারের ভার শ্রোতাদের ওপর। তাঁদের বিচার আমি মাথা পেতে গ্রহণ করি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি আগেই বলেছি আমি সম্পূর্ণ সফল হইনি। তাতে আমি দুঃখও পেয়েছি। অবশ্য সব এক্সপেরিমেন্টই যে সফল হবে তা জোর করে বলা যায় না। তবে এতে আমার অভিজ্ঞতা বাড়লো কথা ত অস্বীকার করতে পারি না।

প্রশ্ন করতে পারেন রবীন্দ্রনাথের গান ত স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাহলে ঐ সব বিদেশী যন্ত্রের সাহায্য নেবার কি প্রয়োজন? তাহলে এ প্রশ্ন ওঠে মিউজিক বোর্ড রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্য যে বাদ্যযন্ত্রের তালিকা দিয়েছেন সেই যন্ত্রগুলিরই বা প্রয়োজন কি? যাই হোক, কবির স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দেবার চেষ্টায় আমি কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছিলাম। হঠাৎ বাধা পেলাম ১৯৬৯ সনে। আমার দুটো গানের রেকর্ড বোর্ডের অনুমোদন পেলো না। কারণ দেখানো হলো :
১। 'পুষ্প দিয়ে মারো যারে'—একসেসিভ মিউজিক অ্যাকমপ্যানিমেন্ট
Music accompaniment hampers the sentiment of the song.

২। 'তোমার শেষের গানের'—The tempo of the song is too quick: the music accompaniment is too much and the song itself is not sung according to notation.

লক্ষ্য করে দেখুন—নোটেশনের ব্যাপারে কি ভুল হয়েছে তার কিন্তু কোনো উল্লেখ নেই। হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি আমার মতামতের জন্য অনেকদিন পীড়াপীড়ি করেছিলেন এই ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত কোম্পানিকে জানাতে হয়েছিলো যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার এবং রেকর্ড করবার ব্যাপারে আমার কর্তব্যজ্ঞান এবং দায়িত্ববোধ অন্য কারো চাইতে কম বলে আমি বিশ্বাস করি না।—তাছাড়া মিউজিক বোর্ডের পরীক্ষকের মতামত নিতান্তই subjective. অতএব এ ব্যাপারে আমার বলার কিছুই নেই। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রেকর্ড করা বন্ধ করতে হলো। ১৯৭০ সালের শেষের দিকে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির মালিক চণ্ডীচরণ সাহা মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে ঐ সময়ে আরো কয়েকটি গান রেকর্ড করিয়েছিলাম। সেই গানগুলির মধ্যে কয়টি অনুমোদন লাভ করেছে সে খবর জানা নেই। কিছুকাল পরে রেকর্ড কোম্পানি আমায় জানালেন যে রেকর্ড করার ব্যাপারে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। এবং প্রবর্তিত নিয়মগুলির কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম। কার অথবা কাদের ভাবনাপ্রসূত এইসব নিয়ম তা আমার জানার কথা নয়। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের ভাবনা দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জাত বাঁচানো যাবে এমন কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভাবতে পারতেন না। কারণ, আমি জানি তিনি দিলীপবাবুকে বলেছিলেন, গানের গতি অনেকখানি তরল, কাজেই তাতে গায়ককে অনেকখানি স্বাধীনতা তো দিতেই হবে। না দিয়ে গতি কি? ঠেকাবো কি করে? তাই আদর্শের দিক দিয়েও আমি বলিনে যে আমি যা ভেবে অমুক সুর দিয়েছি তোমাকে গাইবার সময় সেইভাবেই ভাবিত হতে হবে। তা যে হতেই পারে না। সুতরাং কার কথা মেনে চলবো? রবীন্দ্রনাথের? না, যাঁরা নতুন নিয়মগুলি করেছেন তাঁদের?

এবার আমাদের রেকর্ড কোম্পানিকে লেখা মিউজিক বোর্ডের ২২।১২।৭২ তারিখের চিঠি থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি:—

There is a growing tendency among the artists to make use of interlude music at the time of recording Rabindra Sangeet by taking help of various types or musical instruments and also foreign tunes during recitals of songs which sound discordent to the ear and also militates against the true spirit of the songs.

ব্যাপারটাই এখানে "Discordent to the Ear" subjective. সব ক্ষেত্রে সত্য হয় না। এ বিষয়ে জর্জ বিশ্বাসের মন্তব্য হলো এই: সবচেয়ে বড় সত্য হলো কানে কানে ভেদাভেদ থাকবেই। সব কান একরকম নয়। কোনটা 'ট্রু স্পিরিট অফ দি সং' তা জানতে চাইলে দেখা যাবে ট্রু স্পিরিট,

ব্যক্তিবিশেষে আলাদা হয়। তাছাড়া যেসব শ্রোতা বিস্তর পয়সা খরচ করে রেকর্ড কিনে আনন্দ পান তাঁদের সবারই যে একেবারেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের রস আস্বাদন করবার মতো বুদ্ধি ও ক্ষমতা নেই এমন কথা বলতে পারি না। শ্রোতাদের গ্রহণ ও বর্জন দিয়েই প্রমাণিত হয় কোনটা ভালো কোনটা মন্দ।

পরের প্যারাগ্রাফে লেখা আছে—

'ইট হ্যাজ অলরেডি বিন ইম্প্রেসড আপন ইউ দি ইম্পরটেন্স অফ মেকিং ইউজ অফ সাবডিউড মিউজিক ইন অর্ডার টু মেনটেন দি স্টাইল অ্যান্ড মোড অফ রবীন্দ্রসঙ্গীত বাট ইন দি অ্যাবসেন্স অফ এনি মেথড ফর এলিমিনেটিং দি ইনফ্লুয়েন্স অফ দি ওয়েস্টার্ন স্টাইল অফ মিউজিক ইন দি রেকর্ডেড সংস বাই ডিটারমাইনিং দি বেসিক রিকোয়ারমেন্টস অফ মিউজিক্যাল-একম্প্যানিমেন্টস নো স্যুটেবল অ্যারেঞ্জমেন্টস কুড বি মেড সো ফার ইন দি ম্যাটার।' 'অ্যাজ ইনডিকেটেড ইন দি অ্যাটাচড শিট, আর টু বি ইউজড ষ্ট্রিক্টলি অ্যাডহেয়ারড টু অ্যাট দি টাইম অফ রেকর্ডিং অফ রবীন্দ্রসঙ্গীত ইন ফিউচার।'

এর উত্তরে জর্জদা বলছেন :

'স্টাইল অ্যান্ড মোড অফ রবীন্দ্রসঙ্গীত।' কথাগুলি নিতান্তই অর্থহীন। কারণ শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওস্তাদদের মধ্যেই এই ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ ছিল এবং এখনও বোধহয় আছে। কলকাতায় যতগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিষ্ঠান আছে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের ওস্তাদরা বলেন, বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত কাকে বলে তাঁরাই শুধু জানেন। অথচ দেখা যায় প্রত্যেকেরই গাইবার এবং শেখাবার পদ্ধতি আলাদা। সুতরাং আসল নকল বোঝা মুশকিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠির ব্যবস্থা করে যাননি। কিন্তু উপরোক্ত ইংরেজী ভাষায় লেখা নির্দেশের শেষের অংশটুকু পড়লে মনে হয় মিউজিক বোর্ডের সব রাগ যেন বাদ্যযন্ত্রের ওপর। বোর্ড বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব থেকে রক্ষা করতে চাইছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় কি কি বাদ্যযন্ত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপযোগী এবং সেগুলি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তার নির্দেশ দিয়েছেন।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বরসঙ্গতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামতের কথা একটু আগেই বলেছি। এ ব্যাপারে নানাভাবে, নানা জায়গায় ব্যক্ত আরো সুস্পষ্ট মতামতের কিছু কিছু উল্লেখ করছি।

১। আমাদের দেশে অনেক জিনিসকেই ইউরোপ হইতে পাইবার জন্য আমরা হাত পাতিয়া বসিয়া আছি। আমাদের সঙ্গীতকেও একবার সমুদ্র পার করিয়া তাহার পরে তাহাকে যখন পাইব আরো ভালো করিয়া পাইব।…আমার বিশ্বাস সঙ্গীতেও আমাদের সেই বাহিরের সংসারের প্রয়োজন আছে। তাহাকে প্রাচীন দস্তুরের সিন্দুক হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বের হাটে ভাঙ্গাইতে হইবে।

২। বঙ্কিম আনিলেন সাত সমুদ্র পারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে। তিনি যেমনি ঠেকালেন সোনার কাঠি অমনই বিজয়বসন্ত লায়লা মজনুর হাতির দাঁত বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্যা

নড়ে উঠলেন। চলতিকালের সঙ্গে তাঁর মালা বদল হয়ে গেলো। তারপর থেকে তাঁকে আজ আর ঠেকিয়ে রাখে কে?

৩। যারা মনুষ্যত্বের চেয়ে কৌলিন্যকে বড় করে মানে তারা বলবে ঐ রাজপুত্রটি বিদেশী। তারা এখনো বলে এ সমস্তই ভুয়ো। বস্তুতন্ত্র যদি কিছু থাকে তো ঐ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কারণ এ আমাদের খাঁটি মাল। তাদের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে একথা বলতেই হবে নিছক খাঁটি বস্তুতন্ত্রকে মানুষ তাকেই চায় যা বস্তু হয়ে বাস্তু গেড়ে বসে না। যা তার প্রাণের সঙ্গে চলে। যা তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়।…কোনো সভ্যতাই একা আপনাকে সৃষ্টি করে নাই।

৪। আমাদের সাহিত্যে চিত্রে সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে পৌঁছেছে। কিন্তু সঙ্গীতে পৌঁছয় নি। সেই জন্যই আজও সঙ্গীত জগতে দেরী করছে। অথচ আমাদের জীবন জেগে উঠেছে।

৫। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজী সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাঁকে হিন্দু সঙ্গীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু সঙ্গীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন।

সুতরাং ইনফ্লুয়েন্স অফ ওয়েস্টার্ন মিউজিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কি ধারণা তা আমাদের জানা। একথাও আজ সবাই জানেন, জ্যোতিদাদার পাশ্চাত্য কায়দায় পিয়ানো বাজানোর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের জন্ম হয়েছিলো। তাছাড়া অনেকেই জানেন যে অনেক বিদেশী সুরে রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর গান বেঁধেছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করার প্রথম যুগের গানের রেকর্ডগুলি শুনলে দেখা যায় যে তখন শুধু হার্মোনিয়াম বা অর্গান বাজিয়ে গান রেকর্ড করানো হতো। তখনকার দিনে রেকর্ড বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করার ব্যাপারে শিল্পীদের এবং উদ্যোক্তাদের মনে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না বলেই তখনকার দিনে অন্যান্য গান রেকর্ড করার বেলাতে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারে কোনো বিশেষ একটি রূপ ধরে নি। সবই মামুলী ধরনের হতো। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন যুগের সোনার কাঠির ছোঁওয়া লেগে আর্টের সবগুলি ক্ষেত্রে নূতন নূতন উপলব্ধির তাগিদে নূতন নূতন উদ্ভাবনের পথে মানুষ চলতে শুরু করলো। রেকর্ডে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে মানুষ এগিয়ে চলেছে। বিশ্ব-যাত্রার তালে তাল মিলিয়ে ৫০ বছর আগে যে রূপে ও ভঙ্গিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া এবং রেকর্ড করা হতো—বর্তমান কালের রবীন্দ্রসঙ্গীতের চেহারার এবং ভঙ্গির সঙ্গে তার কোনো মিলই নেই। কালের গতিতে সেই চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। ভবিষ্যতেও যে হবে না তা কি কেউ জোর করে বলতে পারে? একদা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তাঁর গানই নাকি টিকে থাকবে। কিন্তু আমাদের মাতামহীর আমলের জীর্ণ কাঁথা দিয়ে ঘিরে রাখলে এবং পলতেয় করে ফোঁটা ফোঁটা নিয়মের বিধান খাইয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে টিকিয়ে রাখা যাবে এমন কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভাবতে এবং বলতে পারেন নি।

তিনি বলেছিলেন, 'সুরকারের সুর বজায় রেখেও এক্সপ্রেশনের কমবেশী স্বাধীনতা চাইবার এক্তিয়ার গায়কের আছে।' তিনি বিশ্বাস করতেন বাংলার গান যে উৎকর্ষ লাভ করবে সে তার আপন রাস্তাতেই করবে। আর কারও পাথর জমানো বাঁধা রাস্তায় করবে না। বলা বাহুল্য বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ গায়ককে এবং শ্রোতাকে ও এক্সপ্রেশনের ব্যাপারে যে সাহায্য করে তা শুধু অনুভূতির ব্যাপার। বিশ্লেষণ করে বোঝানো যায় না। পাশ্চাত্য সঙ্গীত বা য়ুরোপীয় সঙ্গীত সম্পূর্ণ বিদেশী। তাকে আয়ত্ত করতে গেলে অথবা বুঝতে হলে অনেক বছরের সাধনার প্রয়োজন। মিউজিক বোর্ডের তালিকাভুক্ত বাদ্য-যন্ত্রগুলি ব্যতীত অন্য কোনো বাদ্যযন্ত্র রেকর্ড করার সময় ব্যবহার করলেই ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্সের উৎপাত এসে জুটবে এমন একটি অদ্ভুত ধারণার পিছনে কোনো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে কিনা জানি না। যাঁরা ওয়েস্টার্ন মিউজিক-এর পণ্ডিত ব্যাপারটি তাঁদেরও বোধগম্য হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

যাইহোক, যে রবীন্দ্রনাথকে আমার পিতামাতা গুরুর মত শ্রদ্ধা করতেন, যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচিন্তা আমার চিন্তাধারার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলো সেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে কোনো মূল্য না দিয়ে এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মাঝারি কর্তাদের নির্দেশ এবং বিধিনিষেধ মেনে আর রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করবার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। প্রবৃত্তিও নেই। এই ব্যাপারে যুক্তিহীন কতকগুলি নিয়ম যতদিন বলবৎ থাকবে ততদিন নিজেকে দূরে সরিয়েই রাখব।

আমি দেখছি হালে কয়েকজন তরুণ রবীন্দ্রসঙ্গীত নায়ক-গায়িকা অতি সুন্দর গাইছেন। মনে হয় তাঁদের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। লক্ষ্য করেছি তাঁরাও এ ব্যাপারে বেশ ভাবনা চিন্তা করেন। কিন্তু আমার মনে হয় এই নিয়মের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার মত সাহস ও ক্ষমতা তাঁদের নেই। আমার একটাও মনে হয় যে রেকর্ড-এর ব্যাপারে টেকনিক্যাল খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার মত অবকাশ ও সময় আপনার নেই। তাই আপনার কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আপনি অনুগ্রহ করে যথার্থ সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীত রসিকদের আহ্বান করে তাঁদের আলাপ আলো-চনার আলোকে এমন একটি ব্যবস্থা করুন যাতে আমাদের অতিপ্রিয় সবুজ ও সজীব রবীন্দ্রসঙ্গীত শুকনো কাঠ না হয়ে যায়।

আপনার উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়েছিলাম 'তুমি রবে নীরবে' গানটি রেকর্ডের অনুমোদনের ব্যাপারে। তাই আপনার কাছে মনের সব কথা জানাতে সাহস পেলাম। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বাণীর উল্লেখ না করে থাকতে পারলাম না। তিনি লিখেছিলেন, "কিন্তু সরস্বতীকে শিকল পরাইলে চলিবে না। সে শিকল তাঁর নিজের বীণার তারে তৈরী হইলেও নয়। কেননা মনের বেগই সংসারে সবচেয়ে বড় বেগ। তাকে ইন্টার্ন করিয়া যদি সলিটারী সেলের দেয়ালে বেড়িয়া রাখা যায় তবে তাহাতে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা হইবে। সংসারে কেবলমাত্র মাঝারির রাজত্বেই এমন সকল নিদারুণতা

সম্ভবপর হয়। যারা বড়, যারা ভূমাকে মানে তারা সৃষ্টি করতেই চায়। দমন করতে চায় না। এই সৃষ্টির ঝঞ্ঝাট বিস্তর। তার বিপদও কম নয়। বড় যাঁরা তাঁরা সেই দায় স্বীকার করিয়াও মানুষকে মুক্তি দিতে চায়। তাঁরা জানে মানুষের পক্ষে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মাঝারির শাসন। এই শাসনে যা কিছু সবুজ তা হলদে হইয়া যায়। যা কিছু সজীব তাহা কাঠ হইয়া ওঠে।" নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকেই লেখা আর একটি চিঠিতে জর্জ বিশ্বাস বলছেন, ১৯৬৪ সনে আমার একটি রেকর্ড-করা গান 'এসেছিলে তবু আস নাই'—বোর্ডের অনুমোদন পেলো না। ভুল গাওয়া হয়েছে বলা হলো। পরে শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়কে যখন গানটি শেখানো হলো তখন তিনি লিখলেন, র্মজ্ঞা—র্ঋ চ ন এইভাবে সুর অবশ্যই হতে পারে। এতে কোনো দোষ নেই। আমার মনে হয় ছাপায় কোনো গোলমাল ঘটছে।' স্বাক্ষর শান্তিদেব ঘোষ ১৯।১।৬৫।

শান্তিদেববাবুর স্বাক্ষর করা লেখা এখনও আমার কাছে রয়েছে। আমার মনে হয় বোর্ডের কাছেও আছে। শান্তিদেববাবুর যা মনে হয়েছে তাই তিনি ব্যক্ত করেছেন। দেখা যাচ্ছে এই 'মনে-হওয়া' ব্যাপারটি বেশ গোলমেলে। যিনি আমার এ গানটি অনুমোদন করতে চাননি তাঁর নিশ্চয়ই কিছু মনে হয়েছিলো। আবার শান্তিদেববাবুর অন্য রকম মনে হলো। কার মনে কি মনে হয় তা বলা খুব শক্ত। সুতরাং রেকর্ডের অনুমোদনের ক্ষেত্রে কোনো ইউনিফরমিটির আশা করা বৃথা। অবিশ্যি একথা স্বীকার করতেই হয় যে একটা কিছু নিয়ম মানা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কিছু নিয়মের কথা বলে যান নি। সুতরাং ছাপানো স্বরলিপির বইকেই এই ব্যাপারে প্রাধান্য দিতে হয়। যদিও তাতে অনেক সময় ভুল থাকে তবুও তা দেখে সুরের স্ট্রাকচারকে একটা ধারণা করা যায়। স্বরলিপিতে যে সুর অথবা স্বর লেখা থাকে সেগুলি যথাযথভাবে মেনে চললেও গান বিভিন্ন ঢং-এর হতে পারে। রবীন্দ্রনাথও তাই বলেছেন। তবে বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে শ্রুতির খাতিরে স্বরলিপিতে যে মাত্রাভাগ থাকে তার সামান্য অদলবদল করতেই হয়। তা না করলে গান শুকনো কাঠ হয়ে যেতে বাধ্য।

আমি এ ধরনের অদলবদল দীনেন্দ্রনাথকে করতে দেখেছি। ইন্দিরা দেবীকেও দেখেছি। স্বরলিপি প্রস্তুত করার সময় শুধুমাত্র সুরের ব্রড আউটলাইনটাই দেওয়া সম্ভব। শ্রুতি এবং গায়নভঙ্গি স্বরলিপি করে বোঝানো কিছুতেই সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও গায়কের নিজস্ব ঢং-এর ব্যাপারে গায়ককে স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না।

আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। দিল্লীতে একবার সাপ্রু হাউসে আমার গান ছিলো। 'কোথা যে উধাও' ও 'পাগলা হাওয়ার'—গান শুনে এক বিদেশী সাংবাদিক আমায় নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি বললাম 'আমি ও-সব কিছু জানি টানি না।' তারপর একটি বাচ্চা ছেলেকে দেখিয়ে দিয়ে বললাম 'ওর সঙ্গে কথা বলুন ওই আপনাকে সব বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দেবে।'…খানিক বাদে খুব উৎফুল্ল মুখে সেই বিদেশী সাংবাদিকটি আমার

কাছে এসে বললেন 'আপনি ঠিক লোককেই দেখিয়েছেন। এই দেখুন উনি নোটেশন করে করে আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন কোথায় মল্লারের কোমল গান্ধারের ছোঁয়া লেগে কথার কোমল আবেশটি অনুরণিত হয়েছে। 'দিকে দিগন্তে এতখানি শ্রুতির বিস্তার হলো দিগন্তের বিশালতা বোঝাতে।' আবার ঐ এক বর্ষারই গানে 'পাগলা হাওয়া'-র টেম্পো ফাস্ট হয়ে গেলো। হঠাৎ বর্ষার নুপুর বেজে উঠতে মনটাও কেমন উল্লাসে নেচে ওঠে সেই ছবিটি ফোটাতে।

এই বাচ্চা ছেলেটিই হলেন আজকের ভুবনবিজয়ী শিল্পী পণ্ডিত রবিশঙ্কর। বসন্তের কচি কিশলয়? নদীর অসংখ্য ঢেউ-এর কলতান, তাদেরও একটা ভাষা আছে। সুর আছে। এই ভাষাটি কান পেতে শোনবার সাধনা করেছিলেন একটি ভদ্রলোক। তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ। আর আমি সারা জীবন ধরে ঐ রবীন্দ্রনাথের ভাষার সুরটি শোনবার চেষ্টা করছি।'

এই হলো বিতর্কিত বিদ্রোহী এবং জনপ্রিয়তার রাজসিংহাসনে সগৌরবে অধিষ্ঠিত জর্জ বিশ্বাসের রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধ্যান ধারণা, দর্শন ও সাধনার কাহিনী।

*

জর্জ বিশ্বাস, আপনার রূঢ় কাঠিন্যের আড়ালে অতি সুকুমার অতি পেলব স্পর্শালু শিল্পীসত্তাকে আমি বার বার অনুভব করেছি। আত্মপ্রকাশ-বিমুখ সূক্ষ্ম রুচিবোধে মুগ্ধ হয়েছি। 'আমি কাগজনিভ র শিল্পী নই'—একথাও আপনার মুখে সাজে। কারণ আপনার গানের সম্বন্ধে সমালোচকরা যদি প্রশংসার উচ্ছ্বাসে মুখর না হয় আপনি তার জন্য কাগজের কর্তৃপক্ষের কাছে প্যান-প্যান করে নাকে-কান্না কেঁদে তাঁদের বিব্রত করে তোলেন না। কারণ আপনাব ভাষায় গান-গাওয়া ব্যাপারটা আপনার কাছে সিরিয়াস ক্রিকেট ম্যাচের মত। মাঝে মাঝে গ্রিপ্ না পেলে আপনি দুঃখ পেলেও লজ্জিত হন না। কারণ আপনি জানেন মানুষের সব এক্সপেরিমেন্ট সব সময় সাক্সেসফুল হয় না। আপনার এই স্পোর্টিং মনোভাব, শিল্পীসুলভ নির্লিপ্ততা, আত্মমর্যাদা বোধ ও পৌরুষকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তবু না বলে পারছি না—'আরে বাবা কাগজের লোক? সরেন সরেন?' বলে কাগজের লোকদের প্রতি প্রচ্ছন্ন অভিমান প্রকাশ করাটা আমার কাছে অনেক সময় আত্মা ভমান বলে মনে হয়েছে। যা চকচক করে তাই যেমন সোনা নয়, তেমনই কাগজের লোক মানেই শুকনো খটখটে হৃদয় নয়। আমরাও শ্রোতা—। শিল্পীদের সম্মান দিতে আমরাও জানি। জর্জ বিশ্বাস, যখন আপনার ভাষায় হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবর নির্মমতা আপনাকে শ্রীহীন আক্রমণ করে আপনার আলোর আকাশ কালো করে তুলেছে তখন অমৃতবাজার-অমৃত-যুগান্তর কি আপনার পাশে এসে দাঁড়ায় নি? আপনি হয়ত দুরন্ত অভিমানে বলবেন না-ই দাঁড়ান। দরকার কি? কবির ভাষাতেই এর উত্তর দিয়ে এ-প্রসঙ্গের যবনিকা টানি:

তোমায় কিছু দেব বলে
চায় যে আমার মন।
নাইবা তোমার থাকলো প্রয়োজন।

সুচিত্রা মিত্র

কথার অবদানই ত রবীন্দ্রসঙ্গীতের সম্পদ। ভাষার ভেতর দিয়ে ভাষাতীতকে কেমন করে প্রকাশ করা যায় তারই উত্তর রবীন্দ্রসঙ্গীত।

উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের মতো রবীন্দ্রসঙ্গীতেরও এক বিশিষ্ট মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে শ্রীযুক্তা সুচিত্রা মিত্রের মাধ্যমে। তাঁর পদ্মশ্রী প্রাপ্তি রবীন্দ্রসঙ্গীতের গৌরবের সিংহাসনে অধিষ্ঠান—এই কথাটিই কয়েকবছর আগে (১৯৭৪) রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগীদের মুখে মুখে ফিরেছে। কথাটির সত্যতাও অনস্বীকার্য। কিন্তু তবু বলবো পদ্মশ্রী সুচিত্রা মিত্র'র চেয়ে অনেক বড় শিল্পী সুচিত্রা মিত্র। শুধু বড়ই নন; আকর্ষণীয়াও। পদ্মশ্রী সুচিত্রা মিত্র যেন জ্বলজ্বলে নিয়ন লাইটের নীচে দাঁড়ানো এক ভি.আই.পি—যাঁর কাছে এগোতে হয় সঙ্কুচিত হয়ে। আর 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' গাওয়া সুচিত্রা মিত্র যেন মেঘলা আকাশের স্পর্শমাখা এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার মতই শ্রোতাদের অন্তরকে হঠাৎই ছুঁয়ে ফেলেন। সুচিত্রার জড়তাহীন কণ্ঠের মতো তাঁর গায়কীও স্বচ্ছ, স্পষ্ট; প্রখর দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। তাঁর গানের বক্তব্য যেন তীরের মতো সোজাসুজি মর্মকে বিদ্ধ করে। নির্দ্বিধায় তিনি গহন রাতের আর্তি প্রকাশ করেন 'আজি নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে'-তে—স্তব্ধ-গম্ভীর সুরে প্রশ্ন করেন 'কার মিলন চাও বিরহী?' অনায়াসদক্ষতায় তিনি ব্যঞ্জনাময় করেন, ফাগুন মাসের উতলা নিঃশ্বাস, 'ভেবেছিলেম আসবে ফিরে তাই সাহস করে দিলাম বিদায়'। মুক্ত, দীপ্ত, ঋজু ভঙ্গিতে যেন তিনিই আবার সঙ্গীতলক্ষ্মীর কাছে স্বীকার করেন 'তোমার আমার এই যে মিলন নিতান্তই এ-সোজাসুজি।'

ঝড়ের বেগে আবির্ভূতা ও নিষ্ক্রান্তা গতিচঞ্চল সুচিত্রা মিত্রের বিরামহীন কর্ম জীবন। শুধু গায়িকাই নন; নৃত্যনাট্যের একাধারে স্রষ্টা, প্রযোজিকা, পরিচালিকা, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিকা; প্রায়শই সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হয়ে দেশ-দেশান্তরে ভ্রাম্যমানা। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তেই উদ্ভাসিতা। হাজারো ব্যস্ততা ও কাজের ভীড়ে মুহূর্তের জন্য ওঁর সঙ্গে দেখা হলে অন্তরের উপচে-পড়া আনন্দের জোয়ার স্বল্পপরিচিতের অন্তরেও যেন ধাক্কা দেয়।

—এতো আনন্দ কোথা থেকে পেলেন? জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর আসে আনন্দময়ের গানের প্রবাহ থেকে আর কিছু সংগ্রহ করতে পেরেছি কিনা জানি না কিন্তু ঐ একটি জিনিস কেমন করে আমার সকল দুঃখকে আলো করে দিয়েছে জানতেই পারিনি।

জানতে চেয়েছিলাম সব গান সমান দক্ষতায় পরিবেশন করার যোগ্যতা

থাকা সত্ত্বেও বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতকেই জীবনসঙ্গীরূপে বরণ করে নেবার কারণ কি ?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই কলোচ্ছলা যেন আবেগে ছলছলিয়ে ওঠেন—বাবা, মা উভয়েরই আমার গান সম্বন্ধে আগ্রহের অন্ত ছিলো না। কিন্তু ঠিক কোন্ গান আমার সঙ্গীতের প্রকাশবাহন হবে সে সম্বন্ধে কোনো মতামতই তাঁরা প্রকাশ করেননি। শ্রদ্ধেয় পঙ্কজ মল্লিকের আগ্রহাতিশয্যেই শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থী হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম। ১৯৪১ সালের ২৭ আগস্ট ২০ টাকার এক স্কলারশিপ পেয়ে শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতভবনে যোগ দিলাম। তার মাত্র ২০ দিন আগে গুরুদেবের অন্তর্ধান ঘটেছে। মনে পড়ে জোড়াসাঁকোতে কতদিন কতো উৎসবে বাবার সঙ্গে কবির কাছে গেছি। গানও শুনেছি। অবাক হয়ে দেখেছি সেই ঋষিতুল্য রূপ। সাগরের মতো গভীর দু'টি চোখ। খুব কাছ থেকেও কতো দূরের মানুষ। আর দূরের বলেই হয়তো আরও আকর্ষণীয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতাম। অন্যসব গানের মতোই এ গানও ভালো লাগতো। বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাবার মতো মন তখনও তৈরি হয়নি। তারপর শান্তিনিকেতনে যখন সঙ্গীতশিক্ষা শুরু হলো তখনই বুঝলাম 'মধুর তোমার শেষ নাহি যে'। উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শেখাতেন ভি ভি. ওয়াজেলওয়ার, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতাম শান্তিদেব ঘোষ, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর কাছে। এঁদের সবার কাছেই আমার ঋণ অপরিসীম। তবু বলবো রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তরপ্রবাহী রসধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটালেন শান্তিদা। ওঁর গায়কী এবং শিক্ষাপদ্ধতিতে একটা পরিবেশ যেন আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়ে যায়। তখন কবি সবে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু অস্তমিত রবির আলো যেন শান্তিনিকেতনের আকাশে বাতাসে, বাসিন্দাদের মনে ছড়ানো। সে আভা আমার মনে প্রতিফলিত হলো বই কি।

রাগসঙ্গীত শিক্ষার পর রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতে গিয়ে দেখি এ গানেও রাগ আছে সুরের আকাশচারী ভাবের বিস্তার আছে, আর আছে কথা। কথাকে বাদ দিয়ে বাংলা গানের চিরকুমারব্রত গ্রহণ করার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কথা এখানে সুরের পায়ে শৃঙ্খল হয়ে ওঠেনি। হয়েছে অপরিহার্য বাহন—যার মধ্যে সুরের আকুতি পথ খুঁজে পেয়েছে। প্রথম যখন কবির গান গাইতাম কেমন একটা না-বোঝা ব্যাকুলতায় মনটা দুলে উঠতো। তারপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও যখন পরিণত হয়ে উঠলো তখনই যেন আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠলো কবির গানের অনন্য দর্শন। এর মধ্যে রাগ আছে। তবে সেটা পাণ্ডিত্যের ঔদ্ধত্যে নয়। ভাবের মর্মতলের রসধারার মতো তার অনুসারী রাগ যেন আপনা থেকেই ধরা দিয়েছে ভাষার প্রাঙ্গণে।

—একটা কথা—শিল্পীকে বাধা দিয়ে অসঙ্কোচে প্রশ্ন করি—কথা যদি বাদ দেওয়া যায় তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এমন কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কি যা সর্বদেশের, সর্বকালের সকল মানুষের মনকে নাড়া দিতে পারে ? যেমন ধরুন জৌনপুরী রাগের ওপর সুনন্দা পট্টনায়কের বিখ্যাত রেকর্ডটি 'শ্যামসুন্দর অব হো নেহি আয়ে'। এ গানের কথা বাদ দিয়ে শুধু সুরটিই যদি যন্ত্রে

বাজানো যায় তাহলেও একটা অনির্ণেয় ব্যথায় মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায়। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে কোনো পদ, যেমন ধরুন, 'অনেকদিনের অনেক কথা, ব্যাকুলতা, বাঁধা বেদন দোলে'—এখানে কথা বাদ দিলে কেবল যদি সুরটি বাজে তবে শুধু গাগারাসা গাগারেসা' স্বর-ধ্বনিতে কোনো ভাব মনে জাগে কি?

—কথার অনবদ্য অবদানই তো রবীন্দ্রসঙ্গীতের সম্পদ। ভাষার ভেতর দিয়ে ভাষাতীতকে কেমন করে প্রকাশ করা যায় তারই উত্তর রবীন্দ্রসঙ্গীত। যেমন ধরো 'শ্রাবণ ঘন-গহন-মোহে' গানটি গাইবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারের মায়ায় মনটা হারিয়ে যায় না কি? এবং এ শুধু কথারই যাদুতে। অথচ এ গানে সুর নেই এ কথা বলা যায় না। সবই আছে। কিন্তু কিছুই আরোপিত নয়। এসেছে বাণী-বিস্তারের স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদে। কথা এখানে বন্ধন নয়। সুরের মুক্তি ঐ কথাতেই। আর একটা গানের কথা ধরো। 'তুমি রবে নীরবে' এর অন্তরায়।

'মম জীবন-যৌবন মম অখিল ভুবন'—দ্যাখ 'জীবন-যৌবন'তে সুরটা ক্রমশ তারসপ্তকের দিকে এগোচ্ছে কিন্তু 'অখিল ভুবনে'-তে গলাটা কতটা ওপরে উঠে ভরাট হয়ে যেন ব্যাপ্ত হয়ে গেলো। কেন? 'ভুবন' কথাটা কতবড় সেইটেই যেন বোঝাবার জন্য। সুর ও কথা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে যেন বিরাটের ছবিখানি রচনা করেছে। কথাকে কথা বলাতে সবাই তো পারে না। তিনি পেরেছেন। তাই তাঁর গান বাণীসম্পদে এমন অনন্য হয়ে উঠেছে।

—এইজন্যই কি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে একান্তভাবেই আপনারা নিজের গান বলে বরণ করেছেন?

—শুধু এইজন্যই নয়। আমাদের পরিবেশ, ঋতুবদল এবং সকাল থেকে শুরু করে রাত অবধি প্রতি প্রহরের একটা নিজস্ব মেজাজ ও রং আছে। আমরা আমাদের পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সৃষ্টিছাড়া জীব নই। এই পটভূমিকার ভাষাকে উপলব্ধি করে তারই ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে না চললে সবই হয়ে ওঠে অবাস্তব। কাব্য ও গান রবীন্দ্রনাথের জীবনে বাস্তব হয়ে উঠেছিলো আর এই বাস্তববোধ সঙ্গীতেও বর্তেছিলো। প্রকৃতি ও তার রূপবদলের মাধুর্যমন্ত্রে আমাদের দীক্ষা দিয়েছেন তিনিই। 'মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো', 'আমার কি বেদনা'—এসব গানে যেমন বর্ষার নিজস্ব ভাব মুখর হয়ে উঠেছে—তেমনই আবার ফাগুনের রং লেগেছে 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে', 'কিশোর ওগো', 'এতদিন যে বসেছিলেম' এমনই আরো কতো গানে। সব ঋতুর সৌন্দর্যের মর্মমূলে আর কোনো কবি এমন করে প্রবেশ করেননি, আর তার রসরূপটিও এমন অপরূপ মায়ায় মেলে ধরেন নি। দেখো, আমি ভাই বড্ড সেন্টিমেন্টাল—বিশেষ করে গুরুদেবের প্রসঙ্গে। তাঁর কথা উঠলে কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারি না। তাই সহজে এসব আলোচনার মধ্যে যাই না। খুব আপনার বলে মনে না হলে কারো কাছে মুখ খুলি না।

—এই মনের পরশটুকুই আমার উপরি পাওনা হয়ে থাকবে।

—আর কি জানতে চাও বল—বর্ষণসিক্ত আকাশে সাতটি রঙের ইন্দ্রধনুর

মতই যেন চোখের জল-মাখা রঙিন হাসি ঝরিয়ে প্রশ্ন করলেন।

—রবীন্দ্রসঙ্গীত বলতে অনেকেই বোঝেন চাপা গলার কৃত্রিম সুর। কিন্তু আপনার গানে ত খোলা গলার মুক্ত আবেগের জোয়ার। এই গায়কীর প্রেরণা পেলেন কোথায়?

—শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রসঙ্গে চাপা গলার আইডিয়া লোকের মনে কেমন করে আসে বুঝতে পারি না। শান্তিনিকেতনের মুক্ত আকাশ দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর, অকৃপণ হাওয়া সবই ত প্রাণ খুলে গাইবার দুর্নিবার ইচ্ছেয় মনকে পা ল করে তোলে। ওখানের চারপাশের পরিবেশ দেখে ভাবতাম অমনই উদার ছন্দে কবে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারব? তোমার কথার ঠিক জবাব দিতে পারলাম কিনা বুঝতে পারছি না।

—এর চেয়ে প্রাঞ্জল জবাব হয় না। এখনকার শ্রোতা ও শিল্পীদের সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

—রবীন্দ্রনাথের গানে কথা ও সুরের মিলন ছাড়াও আর যে বস্তুটি এ গানকে অনন্য রূপ দিয়েছে সে হলো তাল এবং তারই হাত ধরে এসেছে লয়। বিশেষ করে তাঁর নাট্যগীতিগুলিতে সুরের সঙ্গে সঙ্গে তালেরও অনুপম প্রয়োগে ভাবরূপের আশ্চর্য বিকাশ ঘটেছে। ধরো না 'আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে' গানটির কথা? গানটি দুটি বিভিন্ন তালে রচিত—যদিও রাগিণী একটিই। চতুর্মাত্রিক ছন্দে গঠিত গানটিকে বৃষ্টির 'ঝরঝর' শব্দকেই শুধু ধরা হয়নি, 'উদ্‌ভ্রান্তি মেঘে'র ডাকে, এই দ্রুতলয়ের গানের সঙ্গে আমাদের মনও বলাকার পথখানি চিনে নিতে ছুটে যায়। সমস্ত গানটির ছন্দে ধরা পড়েছে উদ্দাম বর্ষার রূপটি। আবার ষষ্টীতালে এই গানটিই গাইবার সময় 'উদাসী মেঘে'র রূপের সঙ্গে নিরালায় মিলতেই ভালো লাগে। অন্তরলোকে চিরদিনের যে বিরহী বাসা বেঁধে আছে সেও যেন এই গানের উদাসীন অসীম শূন্যে আপনাকে মেলে দিতে চায়। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে প্রেম পর্যায়ের একটি বিখ্যাত গান 'হে নিরুপমা'। এ গানের রূপকার চপলতার জন্য প্রতিটি স্তবকের শুরুতেই ক্ষমা প্রার্থনা করছেন 'নিরুপমা'র কাছে। বর্ষার সঙ্গে সে চপলতার মিলন ঘটেছে প্রতি পর্যায়ে। প্রতিটি ভাবের ছন্দ-বৈচিত্র্যের গতিতে কখনও কাহারবা, দাদ্‌রা ও তেওড়া। কিন্তু শেষ স্তবকে? নিবিড় মিনতি যেন আপন তাগিদেই তালকে ছাপিয়ে তালবিহীন নীরবতায় গতি-হীন। কারণ চপলতার মুখর উচ্ছ্বাস এখানে স্তব্ধ। তালের অফুরান বৈচিত্র্য আবার তাকে অতিক্রম করার শান্ত সমাহিতি—রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এ বস্তু আর কেইবা সৃষ্টি করতে পারতেন? আগে শিল্পীরা গাইতেন আত্ম-প্রকাশের প্রেরণায়। শ্রোতারাও শুনতেন নির্বিচার শ্রদ্ধায়। এখনকার শ্রোতারা বড় বিচারপ্রবণ, শিল্পীরাও তাই সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং আমার আপত্তি সেইখানেই।

কেন সব সময় অত বিচার করে, হিসেব করে, শিল্পীকে চলতে হবে?

জনপ্রিয় হবার তাগিদে শিল্পী কেন শ্রোতাদের পছন্দ-অপছন্দের দিকে

চেয়ে গান গাইবেন? সকল বাধানিষেধের সীমা অতিক্রম করে শিল্পী কি একবারও শিল্পী হয়ে উঠতে পারেন না? টেকনিকের মূল্য অনস্বীকার্য। কিন্তু টেকনিক সর্বস্ব হয়ে উঠলে গানের মধ্যে রসের ধারা শুকিয়ে যায় না কি?

—আজকের জীবন বড্ড ফাস্ট। একদিন হেমন্ত ঠাট্টা করে বলেছিলো, এরপর সাড়ে তিন মিনিটে নয়, ১৫ মিনিটে ১৫ খানা গান গাইতে হবে। কথাটা ঠাট্টা হলেও একেবারে মিথ্যে নয়।

—শিল্পীজীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে আপনাকে সংগ্রাম করতে হয়নি?

—বিধাতার ইচ্ছেয় বাধা বলতে যা বোঝায় তার সম্মুখীন আমায় কোনোদিন হতে হয়নি। গান গাওয়া শুরু করতে না করতেই প্রেস থেকে শুরু করে বিদগ্ধমহল অবধি যেভাবে আমায় প্রেরণা যুগিয়েছেন খুব কম শিল্পীর ভাগ্যেই তা জোটে। এখন শুনছি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রাজনীতি ও ঈর্ষার প্রশ্ন। আমার গান শুরু হবার প্রথম পর্ব থেকে এখন অবধি আমি, জর্জ, হেমন্ত. মোহর সবাই একই যুগের শিল্পী হিসেবেই গাইছি। কই আমাদের মধ্যে প্রীতির বাঁধন ত কোনোদিন শিথিল হয়নি?

—এখন সঙ্গীতে শিক্ষার সুযোগ বহুধাবিস্তৃত। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়াও অনেক সহজ। তবু সত্যিকারের ভালো শিল্পীর সংখ্যা এত কম কেন?

—বাধা না থাকলে কোনো কাজে নিষ্ঠা আসে না। তাছাড়া কার সার্থকতা কোন পথে সেটাও নিজেকে খুঁজে নিতে হবে। অন্যকে নকল করে বড় হওয়া যায় না। ধরো কোনো শক্তিমান শিল্পী তাঁর মৌলিক সঙ্গীতভাবনা ও ব্যক্তিত্ব-সমৃদ্ধ মনের জোরে সকল বিরুদ্ধ সমালোচনাকে জয় করে আপন সঙ্গীত ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হলেন, কিন্তু প্রতিভার অধিকারী না হয়ে অন্ধভাবে তাঁকে অনুসরণ করতে গেলে কি কেউ ও-জায়গায় পৌঁছতে পারবেন? কানন দেবী, সায়গল মাত্র দুচারখানি গান গেয়ে আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের একসপ্রেশনের অনন্যতার কারণে।

—আপনার প্রথম হিট সং কি?

—'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান'। 'কৃষ্ণকলি' অনেক পরে গেয়েছি। শুনলে আশ্চর্য হবে, শান্তিনিকেতনে যাবার আগেই আমি রেকর্ড করার অফার পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি রাজী হইনি। কিছু শিখিনি, কিছু জানি না! রেকর্ড করব কোন মূলধনে? কিন্তু এখনকার শিক্ষার্থীরা ভালো করে শেখবার আগেই পাবলিসিটির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তার ফলে পরিণতবোধের অভাবে তাঁদের গান আবেদনহীন হয়ে পড়ে। কত প্রতিভার এইভাবে অঙ্কুরেই বিনাশ ঘটে।

—অনেকের অভিযোগ আছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একঘেয়েমির বিরুদ্ধে। বলেন, এ গান প্যানপেনে—এ জবাবে কি বলবেন?

—এর জবাবে এই কথাই বলব রবীন্দ্রনাথ এমনই এক ব্যক্তিত্ব যাঁর কাছে সুখদুঃখ বিরহ-মিলন কোনোটাই ব্যক্তিগত হয়ে ওঠেনি। ব্যক্তিক হয়েও

তা নৈর্ব্যক্তিক। সীমার মধ্যে অসীম, বন্ধনের মধ্যেও মুক্ত। [illegible] ধারাকে ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, মিলনের-বিরহের গ্রন্থিতে বাঁধতে গিয়ে তাকে আমরা একঘেয়ে করে ফেলি। এ দৈন্য রবীন্দ্রনাথের নয়। আমাদের মনের।

আর একটা কথা। রবীন্দ্রসঙ্গীত অথবা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত কোনোটাকেই ভালোমন্দর সীমায় চিহ্নিত করা যায় না। আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাই, তবু আলি আকবরের সরোদ শুনে চোখে জল আসে। একবার সুনন্দা পট্টনায়কের তারানা শুনেছিলাম। মনে হয়েছিলো সেতারের ঝঙ্কার যেন কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হচ্ছে। এত স্পষ্ট এমন সুরেলা। সবকিছুই নির্ভর করে শিল্পীর পরিবেশনার ওপর। তাই ত বলি মনটা আগে তৈরি হওয়া চাই। আধার বড় না হলে সেই বিরাটকে ধরাব কোথায় ?